সেবা রোমান্টিক

# স্বপ্নপুরুষ

রোকসানা নাজনীন

সেবা প্রকাশনী

সেবা রোমান্টিক

# স্বপ্নপুরুষ

## রোকসানা নাজনীন

ছুটি কাটাতে কেইমেন দ্বীপপুঞ্জে এসেছে স্বাতী চৌধুরী। ওখানেই পরিচয় হলো সম্প্রতি দেশ থেকে নিখোঁজ স্বনামধন্য রোবট-বিজ্ঞানী কাজ-পাগলা ড. আসিফ মাহমুদের সঙ্গে। বার কয়েক ঠোকাঠুকির পরই পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেল ওরা।

কিন্তু বেশ কিছু রহস্যজনক ঘটনা হতচকিত করে দিল স্বাতীকে। ও ভাবতে শুরু করল: কিছু একটা গোলমাল আছে আসিফের মধ্যে। জানে না, বিদেশী চরেরা পিছু নিয়েছে আসিফের, মস্ত বিপদের মধ্যে আছে বেচারা।

তারপর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

ISBN 984 16 0133 8

প্রকাশক ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম ঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHAPNOPURUSH
By Roksana Nazneen

ছাব্বিশ টাকা

# স্বপ্নপুরুষ

রোকসানা নাজনীন

## 'সেবা রোমান্টিক'-এর ক'টি বই

**খন্দকার মজহারুল করিম**

সেই চোখ, তোমার জন্যে, জানিনা কখন, আমরা দুজনে, চন্দনের বনে, শুধু ছবি, সোনালী গরল, অনুরূপা, তুমি আছ আমি আছি, এক প্রহরের খেলা, দূর আকাশের তারা, অরণ্যের গান ১ ও ২, অতল জলের আহ্বান, একটি মাধবী, হাতে রাখো হাত, একটুখানি চাওয়া, ছায়া ঘনায়, বর্ষারাতের শেষে, ময়ূরী রাত, নীল ধ্রুবতারা, ফাগুনের ফুল, হংস পাখায় লেখা, আমার এ ভালবাসা।

**রোকসানা নাজনীন**

বন্দী অপ্সরা, ফিরিয়ে দাও ১, ২, অন্ধকারে একা ১, ২।

**বাবুল আলম**

স্বপ্ন নিয়ে, লাল রিবন, সংশয়।

**মোস্তাফিজুর রহমান**

ছলনাময়ী।

**বিশু চৌধুরী**

অচেনা পরবাসী।

**খসরু চৌধুরী**

তবু অচেনা।

**শেখ আবদুল হাকিম**

নগ্ন প্রাচীর ১, ২, সে আমার, একা আমি, অন্তরা, হায় চিল, রজনী চঞ্চলা।

**শাহরিয়ার শামস**

স্বপ্নের অপরাহ্ণ।

# এক

হাঁটতে হাঁটতেই সামনের ভদ্রলোককে লক্ষ্য করছিল স্বাতী। পেছন থেকে বেশ সুদর্শন দেখাচ্ছে, কম করেও ছ'ফুট লম্বা, অ্যাথলেটিক গড়ন। পরনে সাদা টি-শার্ট আর জিন্স, বাঁ হাতে ঝুলছে নীল-সাদা স্পোর্টস জ্যাকেট, ডান হাতে কালো মেটালিক ব্রিফকেস। দেখতে দেখতেই লোকটা ধাক্কা খেল উল্টোদিক থেকে ছুটতে ছুটতে আসা এক বুড়োর সঙ্গে। হাতের ব্রিফকেসটা কংক্রিটের মেঝেতে পড়ে হাঁ হয়ে খুলে গেল। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়তে হলো স্বাতীকে। ব্রিফকেসের ভেতর থেকে একগাদা কাগজপত্র ছড়িয়ে পড়েছে স্বাতীর পায়ের ওপর।

স্বভাববশেই কাগজগুলো তোলার জন্যে নিচু হলো স্বাতী, ইংরেজিতে বলল, 'চিন্তা করবেন না, আমি তুলে দিচ্ছি।'

'না,' প্রায় ধমকে উঠল পুরুষালী ভারি কণ্ঠ।

মাথা না তুলেই পায়ের কাছ থেকে কাগজগুলো জড়ো করে তুলতে শুরু করল স্বাতী। কাগজের মালিকও ততক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে ছড়িয়ে পড়া কাগজগুলো জড়ো করতে শুরু করেছে। স্বাতীর হাতের কাগজগুলো একরকম কেড়েই নিল। বিরক্ত হলো স্বাতী, আচ্ছা অভদ্র লোক তো!

ঢাকা থেকে লণ্ডনের ফ্লাইটে এই যুবককে দেখেনি স্বাতী। তারমানে ঢাকা থেকে নয়, লণ্ডনের হিথরো থেকে এই ফ্লাইট নিয়েছে সে।

মেঝেতে বসে কাগজপত্রগুলো সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে যুবক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে স্বাতী। পেছন থেকে বোঝা যায়নি ভদ্রলোক ভারতীয় বা উপমহাদেশীয়। উজ্জ্বল শ্যামলা ত্বকে রোদে পোড়া বাদামী আভা, একমাথা আগোছালো ঢেউ খেলানো কালো চুল। স্বাতী স্বীকার করতে বাধ্য হলো, অভদ্র হলেও লোকটা দেখতে দারুণ।

উঠে দাঁড়িয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে স্বাতীর দিকে চাইল যুবক। স্বাতী ডান হাতে ধরা টাইপ করা একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরল, কৌতুক উপচে পড়ছে দু'চোখে, 'আপনি এটা নিতে ভুলে গেছেন।'

প্রায় থাবা দিয়ে কাগজটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিল লোকটা, অস্ফুটে বলল, 'ধন্যবাদ।' বলার ভঙ্গিতে দায়সারা ভাব। ব্রিফকেস খুলে কাগজটা ভেতরে ঢুকাতেই বেশি ব্যস্ত।

নাহ্! যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে। বিরক্ত স্বাতী আবার হাঁটা শুরু করল সদর দরজার দিকে।

'খারাপ ব্যবহার করার জন্যে সত্যিই খুব দুঃখিত,' পেছন থেকে ভেসে এল ভরাট কণ্ঠস্বর, একটু যেন কৌতুকের ছোঁয়া রয়েছে তাতে, 'আসলে ব্যাপার কি জানেন, সুন্দরী মহিলারা তো কখনও এভাবে আমার জিনিসপত্র তুলে দেয় না, তাই একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম আর কি!'

দাঁড়িয়ে পড়ল স্বাতী। কাঁধে ঝুলানো ক্যানভাস-ব্যাগটার স্ট্র্যাপের সঙ্গে ওর একগোছা চুল আটকে গেছে। সাবধানে চুলগুলো স্ট্র্যাপ থেকে বিছিন্ন করল। তারপর চোখ তুলতেই একজোড়া মুগ্ধ চোখের মুখোমুখি হলো।

'শুনে সুখী হলাম,' কড়া গলায় বলল স্বাতী। 'আমিও সাধারণত রাস্তাঘাটে লোকজনের জিনিসপত্র কুড়িয়ে বেড়াই না।' যুবককে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল সে। ডানদিকের দেয়ালে একসারি টেলিফোন, গন্তব্য সেদিকেই। গ্র্যাণ্ড কেইমেন ছোট্ট একটা দ্বীপ—মনে মনে হাসল স্বাতী—যুবকের সঙ্গে আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে।

বিভিন্ন দেশের কারেন্সীর কয়েন ভর্তি ছোট্ট পুঁতির ব্যাগটা বের করে দরকারী কয়েনগুলো বেছে নিল। স্লটে কয়েন ঢুকিয়ে ঢাকায় বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করল। প্রায় মিনিট দশেক চেষ্টার পর লাইন পাওয়া গেল। মা ওর ফোনের অপেক্ষায় ছিলেন। প্রায়ই বিদেশে যেতে হয় স্বাতীকে, অথচ মায়ের উদ্বেগ কিছুতেই কমে না। যেখানেই যাক না কেন, প্লেন থেকে নেমেই মাকে একবার ফোন করতে হবে।

ফোন ছেড়ে হলঘরের এক কোণে একটা গিফ্‌ট্ শপে ঢুকল স্বাতী। মনোলোভা রকমারি পণ্য থরে থরে সাজানো। সেসব কিছু দেখল না সে। র‍্যাক থেকে সুন্দর ক'টা পোস্টকার্ড বেছে নিল। মা আর বাবনের জন্যে, কালই মেইল করে দিতে হবে। বাবনটা আবার পোস্টকার্ড জমায়। দাম মিটিয়ে দোকান

থেকে বেরিয়ে এল স্বাতী। কাঁধে ঝুলানো ব্যাগটার সাইড পকেটে কার্ডগুলো ঢুকিয়ে রাখতে যেতেই খবরের কাগজটা খসখস করে উঠল হাতের স্পর্শে। স্বাতীর মনে পড়ে গেল ঢাকা থেকে রওনা হবার সময় প্লেনে সময় কাটাবার জন্যে এয়ারপোর্ট থেকে এক কপি অবজার্ভার কিনে নিয়েছিল ও। অথচ প্লেনে সারাপথ সেটার কথা একবারও মনে পড়েনি। খবরের কাগজটা বের করে নিয়ে ট্র্যাশ-ক্যানের খোঁজে এদিক-ওদিকে তাকাল স্বাতী। কিন্তু একটাও চোখে পড়ল না। হঠাৎ ও লক্ষ করল ঠিক উল্টোদিকেই কার-রেন্টাল এজেন্সি। নিয়ন সাইনে লেখা নামটা পড়ে নিশ্চিত হয়ে সেদিকে এগোল স্বাতী।

কাউন্টারে ইউনিফর্ম পরা সোনালী-চুলো সুশ্রী এক তরুণী। স্বাতীকে দেখে হাসিমুখে সামনে ঝুঁকল, 'কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, মিস্?' সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাল স্বাতীর পরনের হলুদ জর্জেটের শাড়িতে।

'স্বাতী চৌধুরী। আমার নামে একটা ক্রাইসলার ডাইনাস্টি রিজার্ভ করা হয়েছে দিন চারেক আগে,' বলল স্বাতী।

'এক মিনিট,' কড়া বৃটিশ উচ্চারণ কানে বাজে। মেয়েটার দু'হাতের আঙুলগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়ল কম্পিউটারের কী-বোর্ডে। 'এই তো, পেয়েছি। কি রঙ পছন্দ আপনার? সাদা, লাল, বাদামী? ক্রিমসন দিতে পারব না, শেষ হয়ে গেছে।'

'লাল।' ঢাকায় স্বাতীর নিজের অস্টিন হিলিটাও লাল রঙেরই। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করে চাবি নিল স্বাতী। চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে যেতেই একটা কথা মনে পড়ে গেল। মনে মনে নিজেকে শাসাল স্বাতী, আজকাল কি যে ভুলোমন হয়েছে! তরুণীর উদ্দেশ্যে হাসল, 'আমার ট্র্যাভেল এজেন্ট বলে দিয়েছিল—যে কটেজে আমার থাকার কথা ওখানকার চাবিও আপনাদের কাছেই নাকি আছে। এখান থেকেই আমাকে চাবি দেবার কথা। সানিসাইড রিয়ালটির কটেজ।'

নীল চোখ দুটোতে উদ্বেগ ফুটে উঠল, 'ওই চাবি তো একটু আগেই আর একজনকে দিয়ে দিলাম...'

'না না, ডায়ান,' পেছনের অফিস থেকে কৃষ্ণাঙ্গ এক যুবক বেরিয়ে এল। 'তুমি যখন দুপুরে খেতে গিয়েছিলে তখন রিচার্ড আর একটা খাম রেখে গেছে। ওপরের ড্রয়ারে দ্যাখো।' যুবক এবার স্বাতীর দিকে ফিরে হাসল, 'আর বলবেন না, বছরের এসময়টায় কাজের চাপে আমাদের পাগল হবার দশা হয়। আপনার

ভাগ্য ভাল আগে থেকে রিজার্ভেশন করে রেখেছেন।'

সমবেদনার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসিটুকু ফিরিয়ে দিল স্বাতী, 'কটেজে যাবার রাস্তাটা দয়া করে যদি বুঝিয়ে দিতেন…'

স্বর্ণকেশী তরুণী, যার নাম ডায়ান, একটা হলুদ রঙের খাম বাড়িয়ে ধরল, 'এর ভেতরে একটা ম্যাপ থাকার কথা। ম্যাপ দেখে খুঁজে নিতে কোন অসুবিধে হবে না।'

খামের মুখ ছিঁড়ে একজোড়া চাবি আর ফটোকপি করা একটা ম্যাপ বের করল স্বাতী। ম্যাপটা জরিপ করে সন্তুষ্টির হাসি হাসল, 'একদম সোজা রাস্তা। যাক, আর কোন ঝামেলা রইল না।' ওদের দু'জনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল স্বাতী।

সামনেই সারবাঁধা রঙবেরঙের গাড়ি। রিসিটে লেখা লাইসেন্স নাম্বার মিলিয়ে লাল রঙের চকচকে ক্রাইসলার ডাইনাস্টিটা খুঁজে পেতে কোন্ অসুবিধা হলো না। ডানদিকে ড্রাইভার্স-সীট দেখে স্বাতীর মনে পড়ে গেল কেইমেন দ্বীপপুঞ্জ এখনও বৃটিশ শাসনাধীন। ভালই হলো, গাড়ি চালাবার সময় আর উল্টো-উল্টো লাগবে না। আমেরিকায় স্বাতী পারতপক্ষে গাড়ি চালায় না লেফ্‌ট-হ্যাণ্ড-ড্রাইভ বলে। কেইমেনের ট্র্যাফিক-নিয়ম অনেকটা ঢাকার মতই, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্বাতী।

এয়ারপোর্ট-চত্বর ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠে এসে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল। ভেজা বাতাসে নেশা ধরানো লোনা গন্ধ। স্বাতীর কোমর ছাপানো কালো চুলের রাশি এলোমেলো হয়ে গেল বাতাসের ঝাপটায়। ঘাড়ে-গলায় বাতাসের হিম স্পর্শ গত ক'ঘণ্টার ক্লান্তি নিমেষে দূর করে দিল অনেকখানি। চমৎকার অ্যাসফল্টের রাস্তা, গাড়ির চেয়ে সাইকেলের সংখ্যাই বেশি। বাঁ হাতে রেডিও অন করল স্বাতী। ভারি গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল ইথারে, 'পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে আজ সকালে একজন ইটালিয়ান ব্যবসায়ীর লাশ…' থাবড়া মেরে রেডিওটা বন্ধ করে দিল।

ছুটি। স্বাতী কেইমেন দ্বীপপুঞ্জে এসেছে ছুটি কাটাতে। অবশ্য ঠিক নিজের ইচ্ছেয় নয়। হেলাল উদ্দীন খান, স্বাতীর ওপরওয়ালা, বলতে গেলে জোর করেই শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ওকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। পুরোপুরি এক মাসের। তাঁর মতে, অতিরিক্ত কাজের চাপে আজকাল প্রায়ই স্বাতী কাজে ভুল করছে। কিছুদিন ছুটিতে থাকলেই ওর জন্যে ভাল হবে। প্রতিবাদ করে কোন

লাভ হয়নি। তাই কাউকে কিছু না বলে ঢাকা ছেড়ে স্বাতী চলে এসেছে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে এই ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। বাবন আর মা ছাড়া কেউ জানে না ও কোথায় আছে। খবরের কাগজে সাংবাদিকের চাকরিটা ছাড়াও বাবা মারা যাবার পর থেকে স্বাতীকে পারিবারিক ব্যবসার দেখাশোনা করতে হয়। ছুটির দিনেও দম ফেলার ফুরসত পায় না বেচারা। কেইমেনে আর কিছু না হোক ক'দিন বিশ্রাম পাবে মেয়েটা, একথা ভেবে মা-ও এখানে ওর আসার ব্যাপারে বিশেষ আপত্তি তোলেননি।

জোর করে মাথা থেকে ঢাকার চিন্তা ঝেড়ে ফেলল স্বাতী। দু'পাশের অপূর্ব সব দৃশ্যের দিকে মনোযোগ দিল। রাস্তার দু'ধারে ওলিআনডারের ঝোপ, ছোট ছোট গোলাপী ফুলে ছেয়ে আছে। মাঝে মাঝে ম্যাজেন্টা হিবিসকাস। বাড়িগুলোর দেয়াল ঢেকে গজিয়েছে কমলা আর লাল রঙা বাগানবিলাসের ঝাড়। চারদিকে টাটকা সবুজের মেলা। একসঙ্গে এত রঙের সমাহার শুধু প্রকৃতিতেই মানায়। এয়ারপোর্ট থেকে বেরুতে না বেরুতেই স্বাতী কেইমেন দ্বীপের প্রেমে পড়ে গেল।

একটা বাঁক নিতেই ভোজবাজীর মত ঝিলিক দিয়ে উঠল দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে সবজে-নীল জল, তরল রূপোর তৈরি বিশাল একটা ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ল সাদা ফেনার জাল বিছিয়ে দিয়ে। বেলাভূমির বালি এতই শুভ্র যে সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। স্বাতীর মনে পড়ে গেল সানগ্লাসটা ভুলে ফেলে এসেছে ও ঢাকায়। দু'একদিনের মধ্যেই নতুন একটা কিনে নিতে হবে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে রাস্তার পাশে কিছুক্ষণের জন্যে গাড়ি থামাল স্বাতী। দু'চোখ ভরে দেখল অতলান্তিক মহাসাগরের অপরূপ সৌন্দর্য, বুক ভরে টেনে নিল সৌরভ মাখা ভেজা লোনা বাতাস। আহ্! কি শান্তি! কোথাও জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই, অথচ কি আশ্চর্য, নিজেকে একটুও একা মনে হচ্ছে না।

ম্যাপটা আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে ড্রাইভিঙ সীটে উঠে বসল স্বাতী। মাইল দু'য়েক পরে ডান দিকে মোড় নিয়ে হাইওয়ে থেকে লোকাল রোডে উঠে এল। হাইওয়েতে কিছু কিছু গাড়ি চোখে পড়লেও লোকাল রোডে শুধু সাইকেলের রাজত্ব। মেয়েরা তো বটেই, ছেলেরাও রঙচঙে ছাপাওয়ালা শার্ট আর শর্ট্স্ পরে সাইকেল চালাচ্ছে। স্থানীয়দের গায়ের রং বাদামী, কুঞ্চিত

কালো চুল, বড়বড় মায়াভরা চোখ। তবে রাস্তায় ট্যুরিস্টদের সংখ্যাই বেশি। সবাই হাসিখুশি, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর।

প্রচণ্ডগতিতে একটা গাড়ি ওকে পাশ কাটিয়ে গেল। চোখের কোণে এক ঝলক লাল রঙ ছাড়া আর কিছুই স্বাতী দেখতে পেল না, তার আগেই গাড়িটা বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। শুধু এটুকু বোঝা গেল, গাড়িটা ঠিক একই মডেলের ক্রাইসলার ডাইনাস্টি। এমনকি রঙটাও এক। ম্যাপ দেখে স্বাতী যখন সরু একটা রাস্তা ধরে সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছে, গাড়িটা তখনও ওর সামনেই আছে। বেলাভূমি ঘেঁষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছবির মত সুন্দর দশ/পনেরোটা কটেজ। সানিসাইড রিয়ালটি, চিনতে কোন অসুবিধা হলো না। ঢাকায় ট্র্যাভেল এজেন্টের অফিসে বসে স্বাতী এই কটেজগুলোর ছবিই দেখেছে ছাপানো ব্রোশিওরে।

কটেজগুলো প্রত্যেকটাই ভিন্ন ডিজাইনের, ভিন্ন রঙের। কোনটা হালকা গোলাপী, জানালায় আর ছাদে পান্না-সবুজ। আবার কোনটা হালকা নীল আর সাদার সমন্বয়। প্রতিটা কটেজ ঘিরে রঙবেরঙের ফুলের বাগান তাছাড়াও আছে নারকেল গাছের ছায়া। পুরো এলাকা জুড়ে সবুজের বন্যা বয়ে দিচ্ছে আকাশ ছোঁয়া বিশাল সব নাম-না জানা গাছের সারি। খুশিতে ভরে গেল স্বাতীর মনটা, এখানে এসে ও ভুল করেনি। কল্পনার চেয়েও সুন্দর এই জায়গাটা।

প্রতিটা কটেজের সামনে শেকলে ঝোলানো কাঠের প্লেটে নাম্বার লেখা রয়েছে। স্বাতী একটু এগিয়ে গিয়ে সামনের কটেজের নাম্বারটা পড়ল। তিন। দশ নাম্বার কটেজটা ওর নামে রিজার্ভ করা আছে। অন্য কটেজগুলো থেকে বেশ দূরে শেষপ্রান্তে ছিমছাম একটা কটেজ। স্বাতীর মনে হলো ওটাই ওর। কারণ রিজার্ভেশনের সময় প্রাইভেসি চেয়েছিল ও।

গাড়ি নিয়ে রাস্তার শেষ মাথায় চলে এল স্বাতী। লক্ষ করল ওকে পাশ কাটিয়ে আসা গাড়িটাও ওর সামনে থেমে পড়েছে। স্বাতী ধারণা করল সানিসাইড রিয়ালটির কর্মকর্তা কেউ হবে, হয়তো ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

'হাই,' জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে ডাকল স্বাতী, ডানহাতে হাওয়ায় উড়তে থাকা খোলা চুলের গুচ্ছ সামলাচ্ছে।

'হ্যালো।'

পরিচিত কণ্ঠ! অবাক হয়ে স্বাতী দেখল এয়ারপোর্টে দেখা সেই সুদর্শন যুবক

গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। 'দেখুন, আমি কিন্তু আপনাকে অনুসরণ করছি না,' হেসে ফেলল স্বাতী।

যুবকের কালো দু'চোখে কৌতুকের ছাপ, স্বাতীকে দেখে সে-ও অবাক হয়েছে। 'আমি কিন্তু সেরকম কিছু সন্দেহ করিনি। আপনি সম্ভবত সানিসাইড রিয়ালটিতে কাজ করেন।'

'না। আমিও আপনাকে ওদেরই কর্মচারী ভেবেছিলাম,' কথা বলতে বলতে ভদ্রলোককে আর একবার ভাল করে দেখে নিল স্বাতী। কি চমৎকার পুরুষালী কণ্ঠস্বর! নির্ভুল ইংরেজি। তবে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে, পোশাকের ভাঁজে লম্বা-যাত্রার চিহ্ন।

'আমি নয় নাম্বার কটেজটা ভাড়া নিয়েছি,' ব্যাখ্যা করল যুবক, ডান হাতে উঁচু করে দেখাল হলুদ খামটা।

'কিন্তু এটা তো দশ নাম্বার।' স্বাতী বুঝল যুবক ভুল করে চলে এসেছে দশ নাম্বারে, কিন্তু তার জন্যে তাকে লজ্জা দেবার কোন মানে হয় না। স্বাতী ভদ্রভাবে বলল, 'এটাই সবশেষের কটেজ, দশ নাম্বার। নয় নাম্বার নিশ্চয়ই এর আগেরটা।'

'না, ওটা আট নাম্বার,' যুবকের মুখে হাসি, যেন বুঝতে পেরেছে স্বাতী মনে মনে কি ভাবছে।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল স্বাতী। দু'জনে মিলে খুঁজেও কটেজের আশেপাশে কোন নাম্বার পেল না।

'নাম্বার যখন লেখা নেই, তখন নিশ্চিত হবার জন্যে একটা রাস্তাই খোলা আছে,' স্বাতী ওর খামের ভেতর থেকে চাবি বের করল, 'দেখা যাক কার চাবিতে দরজা খোলে।'

চাবিহাতে কটেজের দিকে হাঁটা দিল স্বাতী, কাঁধে সাইড ব্যাগ। লক্ষ করেনি রাস্তা থেকে কটেজ পর্যন্ত সরু রাস্তাটা বালি বিছানো। হাঁটতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেল, পেন্সিল হিলের ডগা দুটো বারবার বালিতে গেঁথে যাচ্ছে, টেনে তুলতে জান খতম।

'দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি আসছি,' পেছন থেকে দৌড়ে এল যুবক, আপত্তি করার আগেই কাঁধ থেকে ভারি ব্যাগটা ছিনিয়ে নিল। 'আমার মনে হয় জুতোগুলো খুলে হাতে নিয়ে নিলেই...'

বেকায়দায় পড়ে লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল স্বাতী। নিজের উপরেই রাগ

হলো—কি দরকার ছিল পেন্সিল হিল পরে বিদেশ-বিভুঁইয়ে রওনা হবার! নিচু হয়ে পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিল, এছাড়া অবশ্য উপায়ও নেই।

'কেইমেনে কিন্তু আপনি হিল পরে হাঁটতে পারবেন না। সঙ্গে অন্য জুতো আছে তো?' যুবকের কণ্ঠে কৌতুক নয়, শুধুই আন্তরিকতা।

কৃতজ্ঞ বোধ করল স্বাতী। কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'আছে। আসলে বিভিন্ন ঝামেলায় এত ব্যস্ত ছিলাম যে মনেই পড়েনি এমন একটা ঝামেলায় পড়তে পারি।' যুবকের আপত্তি উপেক্ষা করে ব্যাগটা আবার নিয়ে কাঁধে ঝুলাল, হাতে জুতো জোড়া। বাকি মালামাল সামলাচ্ছে অন্য হাতে। খালি পায়ে উষ্ণ বালির উপর হাঁটতে বেশ লাগছে, শাড়ির কুঁচি উপরে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে।

কাছাকাছি আসতে দেখা গেল কটেজটা বেশ বড়সড়। পাশাপাশি দুটো সদর দরজা। মাঝখানে কমন দেয়াল, দু'পাশে একই নকশার দুটো ফ্ল্যাট।

'আরে! এটা তো একটা ডুপ্লেক্স!' বিড়বিড় করে উঠল যুবক, কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।

বিরক্ত হলো স্বাতীও। 'ডানদিকের দরজায় "নয়" আর বাঁ দিকের দরজায় "দশ" লেখা আছে।' স্বাতী আমেরিকায় এ ধরনের বাড়ি অনেক দেখেছে, ওদেশে এগুলোকে ডুপ্লেক্সই বলে।

'আশ্চর্য!' রাগে ফেটে পড়ল যুবক, 'আমি কিছুতেই এটা সহ্য করব না! আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলাম যাতে আলাদা একটা নির্জনমত কটেজ দেয়া হয় আমাকে!'

'আমিও ওদেরকে একই অনুরোধ করেছিলাম।' স্বাতী নিজেও যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ করে লোকটাকে রাগে ফেটে পড়তে দেখে হতবাক হয়ে গেল। তার চেয়েও বেশি অবাক হলো যখন সে স্বাতীকে কোনরকম বিদায় সম্ভাষণ না করেই চাবি দিয়ে নিজের দিকের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। একটাবার পিছু ফিরে তাকাল না পর্যন্ত!

স্বাতীর আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। ওর মত সুন্দরী মেয়ের পাশাপাশি থাকতে ওই অহঙ্কারী ছোঁড়ার এত আপত্তি! দোষটা তো স্বাতীর নয়! ও তো ইচ্ছে করে ঘটনাটা ঘটায়নি! দশ নাম্বার লেখা দরজাটা খুলে ঢুকে পড়ল স্বাতী, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। দরজার ওপর রাগ ঝাড়তে পেরে কিছুটা শান্ত হলো।

কটেজের ভেতরের দেয়ালগুলো ফকফকে সাদা, ছাদটা হালকা নীল। গাঢ় রঙের কাঠের আসবাবপত্রে সূক্ষ্ম কারুকাজ, বোঝাই যায় অ্যান্টিক। খোলা জানালায় সাদা লেসের পর্দা। বাদামী কাঠের মেঝেতে হাতে বোনা ক্রোশেটের বর্ণালী কার্পেট। খুব ভাল লাগল স্বাতীর, বারিধারার বাড়িতে ওর বেডরুমের সঙ্গে কোন মিলই নেই।

চাবিটা সাইড-টেবিলে রাখা একটা গোলাপী ঝিনুকের পাত্রে ছুঁড়ে দিয়ে মালপত্রগুলো মেঝেতে নামিয়ে রাখল। তারপর অন্য ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। বাথরুমটা ছোট্ট, তবে পরিষ্কার ঝকঝকে, দেয়ালে গোলাপী টাইলের ফাঁকে ফাঁকে ঝিনুক বসানো। সবচেয়ে ভাল লাগল রান্নাঘরটা। সিঙ্কের উপরেই বিশাল একটা জানালার ওপাশে বালুকাবেলায় আছড়ে পড়ছে বিশাল সব ঢেউ। রান্নাঘরের পিছনে নিচু রেলিঙ ঘেরা খোলা বারান্দা, একটা হ্যামক ঝুলতে দেখল স্বাতী।

শোবার ঘরটা ছিমছাম। নিচু বিছানায় সুতোর কাজ করা ভারী বেডকভার, লেসের ঝালর দেয়া নানা রঙের নানা আকৃতির বেশ ক'টা বালিশ। স্বাতীর মন খারাপ হয়ে গেল এই কটেজটা ছেড়ে দিতে হবে বলে। অন্য কটেজগুলো কি এটার মত এত সুন্দর হবে? পাশের লোকটা অন্য কটেজে উঠে গেলেও স্বাতী এখানে থাকবে না, বলা যায় না দু'একদিনের মধ্যেই হয়তো অন্য কেউ আবার চলে আসবে। কটেজটা ভাড়া দেবার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে নিষেধ করার কোন অধিকার নেই। প্রাইভেসির জন্যে স্বাতীকে অন্য কটেজেই যেতে হবে। একগাদা টিন-এজার যদি পাশের ঘরে সারারাত হৈ-হুল্লোড় করে, অথবা যদি গল্পবাজ প্রতিবেশী যখন তখন এসে হানা দেয়—তাহলে আর এতদূরে ছুটি কাটাতে আসার কি মানে! অবশ্য বর্তমান প্রতিবেশীটিকে খুব একটা বিপজ্জনক চরিত্র বলে মনে হচ্ছে না।

ভাবতে ভাবতে বসার ঘরে এসে টেলিফোনটা খুঁজে বের করল স্বাতী। কটেজের চাবির রিঙে সানিসাইড রিয়ালটির ফোন নাম্বার খোদাই করা আছে। তিনবার রিঙের পর ওদিক থেকে কেউ ফোন তুলল।

'আমি দশ নাম্বার কটেজ থেকে বলছি, আমি...'

'হ্যাঁ, আমি জানি,' বয়স্ক পুরুষকণ্ঠ, কথা বলার ভঙ্গিতে ক্লান্তির ছাপ। এইমাত্র আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা হলো। ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কেউ প্রাইভেসি চাইলে সাধারণত আমরা ওই

কটেজটাই দিয়ে থাকি, কারণ অন্য কটেজগুলোর থেকে ওটা বেশ অনেকটা দূরে। এই প্রথমবার ভুলে একই সঙ্গে দুটো দিক ভাড়া দিয়ে ফেলেছি।'

'বুঝতে পারছি। তাহলে ওই ভদ্রলোক অন্য কটেজে উঠে যাচ্ছেন?'

'না। এই প্রথমবারের মত আমাদের সবগুলো কটেজ একইসঙ্গে ভাড়া হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, হোটেলগুলোতেও কোন রুম খালি নেই। দু'তিনটা কনফারেন্সের ডেট পড়েছে একইসঙ্গে, সেজন্যে হঠাৎ করেই হাজার দু'য়েক ট্যুরিস্টের থাকার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে আমাদেরকে। তবে হাই-রাইজ হোটেলগুলোতে খোঁজ নিলে রিজার্ভেশন ক্যানসেল করা দু'একটা রুম পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত কটেজ পাবেন না।'

'ওই ভদ্রলোক কিন্তু খুব রেগে গেছেন,' স্বাতী ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না ওর প্রতিবেশী এত সহজে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

'হ্যাঁ, উনি খুব রাগারাগি করেছেন। তবে আপনার সঙ্গে কোনরকম খারাপ ব্যবহার করলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন। আপনার নাম তো স্বাতী চৌধুরী, তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে আমার জন্যে চিন্তা করবেন না, সেরকম কিছু হলে পরিস্থিতি নিজেই সামাল দিতে পারব,' হাসল স্বাতী। ওর প্রতিবেশী যদি ওর মতই প্রাইভেসি চেয়ে থাকে তাহলে তো চিন্তার কিচ্ছু নেই। ওরা কেউ কাউকে বিরক্ত করতে যাবে না। সত্যি বলতে কি স্বাতী রীতিমত নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

'যা ভাল মনে করেন,' বিনীতভাবে বললেন ভদ্রলোক, 'তবে কোন কিছু দরকার হলে আমাকে জানাবেন। আমার নাম রিচার্ড পামার।'

'ধন্যবাদ, আমার মনে থাকবে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বাথরুমে গিয়ে ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে নিল স্বাতী। আনকোরা নতুন তোয়ালে থেকে শুরু করে সাবান, শ্যাম্পু, বাথ্-অয়েল সবই সাজানো আছে জায়গামত। তুলোর মত নরম সাদা তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বিশাল আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিল। নাহ্, পথশ্রমের ক্লান্তির আর কোন চিহ্ন নেই। একদম তাজা ফুলের মত নিষ্পাপ দেখাচ্ছে ওর ডিম্বাকৃতি মুখটা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে শাড়ি পাল্টে সুতীর একসেট সালোয়ার-কামিজ পরে নিল স্বাতী। তারপর স্তূপ করে রাখা মালপত্রগুলো টানতে টানতে নিয়ে এল শোবার ঘরে। ব্যাগ থেকে জামাকাপড় বের করে ক্লজিটে তুলে

রাখল। হঠাৎ করেই নজর গেল ব্যাগের সাইড-পকেটে গুঁজে রাখা অবজার্ভারের দিকে। এয়ারপোর্টে ট্র্যাশ-ক্যান খুঁজে না পেয়ে আবার ব্যাগেই ঢুকিয়ে রেখেছিল ওটা। অবজার্ভারটা ঘরের কোণে রাখা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল স্বাতী। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছে প্রথম পৃষ্ঠার নিচের দিকে তিন কলাম জুড়ে ছাপা একটা ছবির দিকে। ছবির শিরোনামে লেখা হয়েছে—'রোবট-বিজ্ঞানী নিখোঁজ।'

ছবির মানুষটা স্বাতীর পরিচিত। ওর নতুন প্রতিবেশী! মেঝেতে বসে পড়ে তাড়াতাড়ি বিছানার উপর বিছিয়ে দিল খবরের কাগজটা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়তে শুরু করল।

> ডক্টর আসিফ মাহমুদ, বিখ্যাত রোবট-বিজ্ঞানী এবং চট্টগ্রামের পলিটেক ইণ্ডাস্ট্রিজের মালিক, গত তিনদিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। পলিটেক ইণ্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজার জনাব আবুল হোসেন গতকাল এই মর্মে চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানায় রিপোর্ট করেছেন।

ডক্টর! রোবট-বিজ্ঞানী! বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল স্বাতী। খবরটা হজম করতে একটু সময় লাগল, তারপর আবার পড়তে শুরু করল অসীম আগ্রহে।

> জনাব আবুল হোসেন বলেন, গত মঙ্গলবারে একটা জরুরী মীটিঙে ডক্টর মাহমুদ অনুপস্থিত থাকেন। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজার পরেও তাঁর কোন খবর পাওয়া যায় না। স্বভাবতই জনাব আবুল হোসেন চিন্তিত হয়ে পড়েন, কারণ এধরনের ব্যবহার ডক্টর মাহমুদের স্বভাববহির্ভূত। তিন বছর আগে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করার পর ডক্টর আসিফ মাহমুদ বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বিজ্ঞানী হিসেবে দেশে তাঁর তেমন পরিচিতি না থাকলেও রোবটিক্সে বেশ ক'টি মৌলিক অবদান রাখার কারণে পশ্চিমী বিশ্বে এই তরুণ বিজ্ঞানী ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছেন।

ধাতস্থ হতে সময় লাগল স্বাতীর। বিস্ময় কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে কৌতূহল জেগে উঠেছে। মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে স্বাতীর সাংবাদিক-সত্তা। যতদূর মনে হচ্ছে আসিফ মাহমুদ নিজেই গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু কার কাছ থেকে পালাতে

চাইছে সে? পুলিশ? সাংবাদিক? কাউকে না জানিয়ে এভাবে উধাও হয়ে যাবার কারণই বা কি? পৃথিবীর সব জায়গা বাদ দিয়ে এই কেইমেনে কেন হাজির হয়েছে সে?

ছবিতে সাদা একটা ল্যাব-কোট গায়ে গবেষণাগারে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে আসিফ মাহমুদকে। ছবিটা অন্তত দু'এক বছরের পুরানো। তবুও ময়লা নিউজপ্রিন্ট ভেদ করে ব্যক্তিত্বময় সুদর্শন চেহারাটা চিনতে একটুও কষ্ট হয় না।

নিজের অভাবিত সৌভাগ্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল স্বাতী। না চাইতেই হাতের কাছে এমন একটা স্টোরি!

পরমুহূর্তেই স্বাতীর মনে পড়ে গেল ও কেইমেনে এসেছে ছুটি কাটাতে। জোর করে ওকে এক মাসের ছুটি দেয়া হয়েছে। 'ঢাকা টাইম্‌সে'র অফিসে স্বাতী এখন নেহায়েত অপ্রয়োজনীয় একজন রিপোর্টার, যার অনুপস্থিতিতে ওদের কিছুই যায়-আসে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবজার্ভারটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল স্বাতী। কেইমেনে ছুটি কাটাবার উদ্দেশ্যে এসেছে ও, সেটাই করবে। অন্য কোনদিকে মনোযোগ দেবার কোন মানে হয় না। তাছাড়া পত্রিকার রিপোর্টে এমন কোন আভাস দেয়া হয়নি যে আসিফ মাহমুদ কোন অপরাধ করেছে অথবা আইনের সঙ্গে তার সংঘাত আছে। স্বাতী সবসময়ই অন্যের প্রাইভেসির মর্যাদা দিয়ে এসেছে, প্রত্যেকেরই নিজের মত করে চলার অধিকার আছে। হয়তো আসিফ মাহমুদ প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবন থেকে পালিয়ে এসেছে ক'টা দিন একান্তে বিশ্রামের জন্যে। সে অধিকার তার আছে।

কিন্তু তাহলে কাউকে না জানিয়ে আসার মানে কি? সবাইকে না হোক ঘনিষ্ঠ দু'একজনকে তো জানানো যেত, তাহলে আর থানা-পুলিশ হত না। যাই হোক, ভাগ্যের ফেরে আসিফ মাহমুদ এখন স্বাতীর ঘনিষ্ঠ-প্রতিবেশী। কিছু একটা ভজঘট থাকলে সেটা স্বাতীর চোখ এড়াবে না। স্বাতীকে এখন শুধু একটু চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। যদি তেমন কিছু ঘটে, তাহলে ঢাকার পত্রিকা অফিসে ফ্যাক্স করে দিতে আর কত সময় নষ্ট হবে?

সিদ্ধান্ত নিতে পেরে নির্ভার হলো স্বাতী। স্যাটিনের কভারে মোড়া ছোট্ট একটা বালিশ বুকে জড়িয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল, ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি।

রিসিভারটা ক্রেড্‌লে আছড়ে ফেলে ধপ্‌ করে গদিমোড়া সোফায় বসে পড়ল আসিফ। ডানহাতের আঙুলগুলো চিরুনির মত চলছে একমাথা অগোছালো চুলের অরণ্যে। কোনভাবেই এই কটেজে থাকা চলবে না ওর। অথচ রিচার্ড পামারকে টাকার লোভ দেখিয়েও কোন লাভ হয়নি, এই দ্বীপে কোন কটেজই খালি নেই। রিচার্ড বারবার জানতে চেয়েছে ওর অসুবিধা কোথায়। আসিফ প্রত্যুত্তরে কোন জোরালো যুক্তি দেখাতে পারেনি। কটেজের সব ব্যবস্থাই চমৎকার, অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু মাঝখানের যে দেয়ালটা পাশের ঘরের মেয়েটি থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, চেষ্টা করেও কিছুতেই আসিফ সে দেয়ালটা থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

মিস চৌধুরী। রিচার্ড পামার এনামেই মেয়েটিকে সম্বোধন করছিল। ভারতীয় বাঙালী? অবশ্য চৌধুরী নামটা অবাঙালীদেরও হতে পারে। হিথরো এয়ারপোর্টেই আসিফ প্রথম ওকে দেখে। তারপর থেকে শুধু দেখেই যাচ্ছে। শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য আর ধারালো ব্যক্তিত্বের এমন অপরূপ সমন্বয় কোন মেয়ের মধ্যে থাকতে পারে তা আসিফের কল্পনার বাইরে। প্লেনে মেয়েটা কয়েক সারি সামনে বসেছিল। সারাটা পথ আসিফ পিছন থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে চেয়ে দেখেছে লম্বা একবোঝা কালো চিকচিকে চুলের ঢাল আর কুসুম-রঙা জর্জেটের শাড়ির ফাঁকে সুঠাম একটা বাহু। আসিফের ভাগ্য ভাল মেয়েটা অন্যমনস্ক ছিল, আশেপাশে কি ঘটছে সেদিকে মনোযোগ ছিল না। আসিফের হ্যাংলামি ওর চোখে পড়লে লজ্জার আর সীমা থাকত না।

দেশে-বিদেশে সুন্দরী রমণী কম দেখেনি আসিফ। কিন্তু এমনটি আর কখনও চোখে পড়েনি। এই মেয়েটার মধ্যে কি যেন একটা আছে! ঘন কালো পাপড়ীঘেরা বিশাল এক জোড়া চোখ, যেখানে পৃথিবীর সব রহস্য লুকিয়ে আছে। টিকলো নাক, লোভনীয় ঠোঁট আর চিবুকে মাথা খারাপ করে দেয়ার মত একটা খাঁজ। বৃষ্টিভেজা কলাপাতার মত উজ্জ্বল শ্যামলা সতেজ ত্বক। বেশ লম্বা, পাঁচ ফুট চারের কম নয়। সবকিছু ছাপিয়ে চোখে পড়ে সর্বাঙ্গে ব্যক্তিত্বের ছটা—অসাধারণ! অথচ একটুও উগ্রতা নেই, নেই অনাবশ্যক চাপল্য। মেয়েদের বয়স বুঝতে পারে না আসিফ, তবে মনে হয় না এ মেয়ের বয়স পঁচিশ/ছাব্বিশের বেশি হবে।

অন্য যে কোন সময় হলে এ নারীর জন্যে আসিফ সানন্দে বোখারা-

সমরখন্দ বিলিয়ে দিত। কিন্তু এখন ওর সে উপায় নেই।

এয়ারপোর্টে ব্রিফকেস-কেলেঙ্কারির কথা মনে করে হাসি পেল আসিফের, একইসঙ্গে নিজের উপর রাগ হলো মেয়েটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্যে। স্বপ্নেদেখা রাজকন্যাটির সামনে ওরকম বেকায়দায় পড়লে কারইবা মাথার ঠিক থাকবে! রূঢ় ব্যবহার করে নিজের লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করেছিল আসিফ গাধার মত, সব ছেলেরাই বোধহয় সুন্দরী মেয়েদের সামনে চূড়ান্ত বোকার মত আচরণ করে। এই মুহূর্তে নিজেকে আসিফের প্রথম শ্রেণীর গর্দভ মনে হচ্ছে।

উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়তে শুরু করল সে। ঠিক করল, গোসল করেই শহরে ঘুরতে যাবে। মেয়েটার কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। সময় এবং পরিস্থিতি কোনটাই এই মুহূর্তে ওর অনুকূলে নয়। তারচেয়ে শহরের কোন ছোট্ট রেস্টোরান্টে বসে গরম রুটি, পনির আর মশলা দিয়ে ভাজা চিকেন সহকারে আয়েশ করে ডিনার সারাই বেশি যুক্তিযুক্ত। যে করেই হোক মিস চৌধুরীকে ভুলে থাকতে হবে।

## দুই

ধড়মড় করে উঠে বসল স্বাতী। ইস্! কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা নিজেই বলতে পারবে না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝল প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছে। এত লম্বা রাস্তা, বিশেষ করে হিথরোতে পাক্কা পাঁচ ঘণ্টা বসে থেকে সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন ঘুমালে রাতে আর ঘুম আসবে না।

মাথায় শ্যাম্পু ঘষে সময় নিয়ে গোসল করল স্বাতী। ঘুম এবং ক্লান্তি দুটোই দূর হয়ে গেল নিমেষে। জানালার বাইরে শেষ বিকেলের লালচে নরম রোদ। রান্নাঘরের দরজা খুলে বাইরে চলে এল। খালি পায়ের নিচে উষ্ণ সাদা বালির স্পর্শ শরীরে অদ্ভুত একধরনের প্রশান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। কটেজের দু'ধারে নামনাজানা মৌসুমী ফুল ফুটে আছে ছোটবড় ঝোপে। বাঁশের তৈরি একটা

তোরণ বেয়ে উঠে গেছে বুনো গোলাপের ঝাড়, রক্তবর্ণের গোলাপে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে কালচে সবুজ পাতাগুলো।

খানিকটা দূরেই ফেনার মুকুট মাথায় আছড়ে পড়ছে সারি সারি ঢেউ। ভেজা বালিতে ছুটোছুটি করছে একদল কাঁকড়া। ডিমের কুসুমের মত সূর্যটা ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে সাগরের বুকে, আকাশের নীল মুছে গেছে রক্তিম আভায়।

স্বাতীর মনটা বিষাদে ছেয়ে গেল। হাঁটুতে মুখ রেখে বালিতে বসে পড়ল, চোখভরে দেখল অপসৃয়মান সূর্যের শেষ লালিমাটুকু। পায়ের কাছে ভেজা বালিতে লুটিয়ে পড়ছে ঢেউয়ের পরে ঢেউ।

স্বাতী যখন ফিরতি পথে রওনা হলো, তখন আঁধার নেমে গেছে। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে গাছপালা ঘেরা কটেজের কাঠামো। আলোর কোন চিহ্ন নেই অদৃশ্য জানালাগুলোতে। তারমানে আসিফ মাহমুদ বাইরে গেছে। সম্ভবত শহরে। কারণ সমুদ্র সৈকতে দ্বিতীয় কোন প্রাণী দেখা যাচ্ছে না।

অন্ধকার রান্নাঘরের দেয়াল হাতড়ে সুইচ টিপে বাতি জ্বালাল স্বাতী। বেশ খিদে পেয়েছে। সেই কোন দুপুরে প্লেনে হালকা খাবার খেয়েছে, তারপর থেকে পেটে একটা দানাও পড়েনি। ফ্রিজে কিছু খাবার থাকার কথা, সানিসাইড রিয়ালটির সঙ্গে সেরকমই কথা হয়েছে। অবশ্য সেজন্যে ওরা আলাদা চার্জ করবে।

কিন্তু ফ্রিজ খুলে স্বাতীর মেজাজ খিঁচড়ে গেল। ভেতরটা একদম খালি। খাবার-দাবারের কোন চিহ্নই নেই। ইচ্ছে হলো তক্ষুণি সানিসাইডে ফোন করে ঝাড়ি মারে। কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হবে না। রাত হয়ে গেছে, ওদের করার কিছু নেই। খাবার জন্যে শহরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

বাথরুমে গিয়ে হাতে-পায়ে লেগে থাকা বালু ধুয়ে ফেলল। আড়ং থেকে কেনা নকশিকাঁথার সালোয়ার-কামিজটা বাথরুমের লম্বা আয়নায় ভালই দেখাচ্ছে, পোশাক বদলাবার কোন দরকার নেই। ভেজা চুল শুকিয়ে গেছে অনেক আগেই, একটু আঁচড়ে নিয়ে একটা হাতখোঁপা বাঁধল। চোখে একটু কাজল, আর হালকা করে লিপস্টিক বুলিয়ে নিল ঠোঁটে। পায়ে গলাল চামড়ার চপ্পল। ব্যাস্, স্বাতী এখন বাইরে যাবার জন্যে একদম তৈরি।

সাইডটেবিলের উপর থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিতে নিতে স্বাতী বাইরে গাড়ির আওয়াজ পেল। গাড়ির দরজা বন্ধ হলো, তারপর পর্চে ভারি পদশব্দ।

আসিফ মাহমুদ ফিরেছে। লিভিঙ রুমের জানালা দিয়ে আসিফ মাহমুদের গাড়িটা দেখা যাচ্ছে, আগে যেখানে পার্ক করা ছিল তার থেকে বেশ কিছুটা সামনে।

স্বাতী পরিষ্কার শুনতে পেল দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে আসিফ মাহমুদ, করিডর ধরে হেঁটে যাচ্ছে ভেতরের দিকে। বিরক্ত হলো স্বাতী, কাঠের তৈরি এই কটেজগুলোতে সামান্য শব্দটুকু পর্যন্ত গোপন করার উপায় নেই।

কোনকিছু না ভেবেই রান্নাঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে প্রতিবেশীর দরজায় টোকা দিল স্বাতী।

'কে ওখানে?' বলতে বলতে দরজা খুলে বাইরে মাথা বাড়াল আসিফ মাহমুদ, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ফুটে উঠল দু'চোখে।

'আপনার প্রতিবেশী।'

একটু ইতস্তত করে দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিল আসিফ মাহমুদ, 'আরে, আসুন আসুন! হঠাৎ কি মনে করে?'

ধীরপায়ে ভেতরে ঢুকল স্বাতী। পাশ কাটাবার সময় ইটারনিটির সুগন্ধ পেল। গোসল করে শেভ করেছে আসিফ মাহমুদ, পরনে হালকা বাদামী পোলো শার্ট আর সুতীর ট্রাউজার। বেশ ঝরঝরে দেখাচ্ছে। 'সানিসাইড থেকে কি আপনাকে কোন খাবার দেয়া হয়েছে? আমার খাবার দিতে ভুলে গেছে ওরা। সেজন্যেই দেখতে এলাম আপনারটাও ভুলেছে কিনা,' উত্তর দিল স্বাতী।

'খাবার?' ঠিক বুঝতে পারল না আসিফ।

'হ্যাঁ, খাবার। কেন, রিজার্ভেশনের সময় আপনি অর্ডার করেননি? ওরা কিছু বলেনি?'

'না। এরকম কোন ব্যবস্থা আছে তা-ও আমি জানতাম না। ফ্রিজের ভেতরটা এখনও দেখিনি আমি। দাঁড়ান, দেখি কিছু আছে কিনা।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ফ্রিজের দরজা খুলল আসিফ। ভেতরে থরে থরে সাজানো দুধের কার্টন, মাখন, পনির, রুটি আর ডিম। আইসবক্সে এক প্যাকেট আইসক্রিমও পাওয়া গেল। 'মনে হচ্ছে ভুলে আপনার খাবার এখানে চলে এসেছে,' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে আসিফ বলল, 'আমি এক্ষুণি এগুলো আপনার ঘরে দিয়ে আসছি।'

'না না, তার দরকার হবে না। তাছাড়া ওরা আপনাকেই বিল করবে।' আসিফের নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে অস্বস্তিবোধ করল স্বাতী, পুরুষের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি চিনতে কোন মেয়েরই ভুল হয় না। চলে যাবার জন্যে ঘরে দাঁড়াল স্বাতী

বলল, 'আগামীকাল সকালেই সানিসাইডের সঙ্গে কথা বলতে হবে, সব ব্যাপারেই এরা ঘাপলা পাকিয়ে রেখেছে।'

'রাতে কোথায় খাচ্ছেন?' মরিয়া হয়ে আসিফ জিজ্ঞেস করে ফেলল।

স্বাতী জানে ও কি ভাবছে। বুঝতে না পারার ভান করে বলল, 'ভাবছি শহরের কোন রেস্টোরান্টে যাব।'

'একা?'

'হ্যাঁ, এখানে তো আমি কাউকে চিনি না।'

লাজুক হাসি হাসল আসিফ, 'আমার সঙ্গেই নাহয় খেয়ে যান।' আসিফের দৃষ্টি অনুসরণ করে স্বাতী দেখল ক্যাবিনেটের ওপর বেশ বড়সড় একটা প্যাকেট, ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ফ্রেঞ্চ ব্রেডের ডগা। কয়েকটা স্ট্রবেরী গড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। পাশেই রাখা আছে পলিথিনের কাগজে মোড়া একগোছা টিউলিপ, উজ্জ্বল হলুদ রঙটা আশ্চর্যরকম সতেজ।

'শহর থেকে কিনে আনলেন?'

'আসলে বেরিয়েছিলাম খাবার জন্যে। শহরে গিয়ে দেখি রেস্টোরান্টগুলো লোকে লোকারণ্য, এসময়টাতেই সবাই রাতের খাবার খায়। বসার জায়গা পেতে হলে অন্তত ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে, তাই একটা সুপারমার্কেটে ঢুকে যা পেয়েছি কিনে এনেছি।' মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে কাজে লেগে পড়ল আসিফ, দ্রুতহাতে প্যাকেটের জিনিসপত্র বের করছে। নির্দ্বিধায় স্বাতীর উপর হুকুম চালাল, 'দেখুন তো প্লেট-গ্লাস কোথায় আছে!'

পিছন থেকে আসিফকে বিজ্ঞানী নয়, বরং টেনিস খেলোয়াড়ের মত দেখাচ্ছে। কোন বিজ্ঞানীর কি এমন পেশীবহুল পেটা শরীর থাকে? ভাবতে গিয়ে হাসি পেল স্বাতীর, সিনেমার পর্দা ছাড়া বাস্তব জীবনে কোন বিজ্ঞানী চোখে দেখেনি ও, কেমন করে জানবে বিজ্ঞানীরা দেখতে কেমন হয়? 'আচ্ছা, খাবারগুলো আমরা সাগরতীরে নিয়ে যেতে পারি না? আমি এতক্ষণ ওখানেই ছিলাম, এত ভাল লাগছিল!'

আসিফ মুখ না তুলে বলল, 'না, আমি একটা ফোন-কলের অপেক্ষা করছি।'

'ও, তাহলে থাক,' কথা না বাড়িয়ে প্লেট-গ্লাস, চামচ আর ন্যাপকিন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্বাতী।

একসময় আসিফ হঠাৎ বলল, 'পেছনের বারান্দায় বসে যেতে পারি আমরা,

ওখান থেকে ফোনের শব্দ শোনা যাবে।'

'দারুণ আইডিয়া!' চেষ্টা করেও কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারছে না স্বাতী। কার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছে আসিফ জানতে বড় ইচ্ছে হলো। অথচ ও ভাল করেই জানে এধরনের কৌতূহলের কোন মানে হয় না। আসিফ যার সঙ্গে ইচ্ছে কথা বলবে, তাতে ওর কি! তবে এটুকু বোঝা গেল, আসিফের অন্তর্ধানের ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন নয়। অন্তত একজন লোক জানে সে কোথায় আছে।

টিউলিপগুলো একটা কাঁচের গ্লাসে সাজিয়ে রাখতে রাখতে স্বাতী জিজ্ঞেস করল, 'ফুলগুলো খুব সুন্দর। কারও আসার কথা আছে নাকি?'

আড়চোখে দেখল আসিফ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। উত্তর দেবার আগে বেশ কিছুটা সময় নিল সে, 'ফেলে দিন ওগুলো। রাস্তায় এক ছোকরা বিক্রি করছিল, জোর করে কিনিয়ে ছেড়েছে।'

স্বাতীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিল আসিফ সত্যি কথা বলেনি। উচ্চবাচ্য না করে নীরবে কাজ করতে থাকল ও। স্ট্রবেরীগুলো ধুয়ে একটা বেতের ঝুড়িতে সাজিয়ে দিল। সালাদের লেটুস ধোয়ার জন্যে এগিয়ে আসছিল আসিফ, শেল্‌ফ থেকে বাটি নামাবার জন্যে স্বাতী হাত বাড়াতেই আসিফের বাহু ছুঁয়ে গেল সেটা। স্বাতীর হাত-পা ঝিমঝিম করে উঠল। একটু স্পর্শ বই তো নয়, অথচ মনে হলো যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল। নিজের এই ভাবান্তরে হতবাক হয়ে গেল স্বাতী।

'আমি দেখছি বাইরের টেবিলটা পরিষ্কার আছে কিনা,' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল আসিফ, ওর কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল একা শুধু স্বাতীর হৃৎপিণ্ডের গতিই বাড়েনি।

আসিফ যখন আবার রান্নাঘরে ঢুকল, স্বাতী তখনও একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আসিফ ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসল, 'আমরা কিন্তু পরস্পরের কাছে এখনও অপরিচিতই রয়ে গেছি। আমি আসিফ মাহমুদ।'

ভাগ্যিস, ইতিমধ্যেই নাম ধরে সম্বোধন করে বসেনি, স্বাতী মনে মনে ভাবল। খুব অবাক হবার ভান করে বাংলায় বলল, 'আপনি বাংলাদেশী! অথচ এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। আমি ঢাকা থেকে এসেছি, স্বাতী চৌধুরী।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল আসিফ, দু'চোখে নির্ভেজাল অবিশ্বাস। 'আপনি বাঙালী!' বাংলায় কথা বলছে আসিফও, 'অথচ আমি ধরেই নিয়েছি আপনি

ভারতীয়।'

'ভারতীয়! কেন আমাকে ভারতীয় বলে মনে হলো আপনার? বিদেশীরা ভুল করতে পারে, কিন্তু আপনার তো ভুল করার কথা নয়!'

'আসলে আমি চিন্তাই করতে পারিনি দেশী কোন মহিলা এভাবে একা একা এতদূরে বেড়াতে আসতে পারেন।'

রাগে স্বাতীর পিত্তি জ্বলে গেল। উষ্ণকণ্ঠে বলল, 'কেন, বাঙালী মেয়েদেরকে বুঝি শুধু রান্নাঘরেই মানায়?'

'না...মানে...' স্বাতী রেগেছে টের পেয়ে ঘাবড়ে গেল আসিফ, 'কখনও কাউকে দেখিনি তো!'

ওর কাঁচুমাচু চেহারা দেখে স্বাতীর হাসি পেল, 'বুঝতে পারছি। আসলে একদিক থেকে বিচার করলে আপনার অবাক হবার যথেষ্ট কারণ আছে। দেশে কিন্তু আমি এভাবে একা একা ঘুরে বেড়াই না, পরিবেশ এবং মানসিকতার কারণে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু বিদেশে তো আর সে সমস্যা নেই। তাছাড়া বছরে দু'তিনবার আমাকে ব্যবসার কাজে আমেরিকা যেতে হয়, বার বার কে আমাকে পাহারা দেবে? আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

নিপুণ হাতে বারান্দার টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেলল আসিফ। ছুরি দিয়ে রোস্ট করা আস্ত মুরগী টুকরো করতে করতে মুখ তুলে স্বাতীর দিকে চাইল, 'আপনার প্রশংসা না করে পারছি না। এরকম আত্মবিশ্বাস ক'জন বাঙালী মেয়ের আছে! আপনি কি বিদেশে বড় হয়েছেন?'

ফেঞ্চ ব্রেডে গার্লিক-বাটার মাখাচ্ছিল স্বাতী, আনমনে বলল, 'না। তবে পড়াশুনার জন্যে একটানা বছরখানেক ছিলাম ওকলাহোমাতে। বাবা মারা গেলে ডিগ্রী শেষ না করেই দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। আসলে ছেলেবেলা থেকেই আমি স্বাধীনচেতা, স্বনির্ভর। আমার বাবা-মা-ই সেরকম শিক্ষা দিয়েছেন। এবং সেজন্যে কখনও তাঁদেরকে অনুশোচনা করতে হয়নি।'

'সত্যিই তাঁরা প্রশংসার দাবিদার। অবশ্য আমি কিছুটা স্বার্থপরের মত কথা বলছি। কারণ আপনি যদি কেইমেনে না আসতেন, তাহলে হয়তো কখনোই আর আমাদের দেখা হত না।'

নীরবে খেতে থাকল ওরা। গাঢ় বেগুনী মখমলের মত আকাশ ফুটো করে একে একে উঁকি মারতে শুরু করেছে রাশি রাশি তারা। বাতাসে জুঁই আর গোলাপের সুরভী।

'আপনি কি সবসময়ই এমন রাজকীয় খাবার-দাবার খান?' প্রশ্ন করে স্বাতী, এখনও ওর ধারণা আসিফ কারও জন্যে অপেক্ষা করছিল।

একটা ক্র্যাকারে এক চামচ ক্যাভিয়ার তুলে নিয়ে সেটা স্বাতীকে দিল আসিফ। হেসে বলল, 'কাজের চাপে বেশির ভাগ দিনই খাবার কথা ভুলে যাই আমি। তাই যখনই সুযোগ পাই তখনই সেটা পুষিয়ে নিই। আমাদের দেশের নিয়মকানুনগুলো বড় অদ্ভুত। নিজেরা সাদামাঠা খাবে অথচ মেহমানের জন্যে রাজ্যের আয়োজন!'

'বা-রে! সেটাই তো স্বাভাবিক। আপনি কি মেহমানের জন্যে মৌলি থেকে বিফবার্গার আনিয়ে নিজে পোলাও-কোর্মা রেঁধে খান?' কাঁচভাঙা হাসিতে ভেঙে পড়ল স্বাতী।

'কেন নয়?' যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করল আসিফ। 'বাড়িতে যেদিন মেহমান দাওয়াত করেন সেদিন কি আপনি পেটপুরে খেতে পারেন?'

'বুঝতে পারছি আপনি কি বোঝাতে চাইছেন। মেহমান আসার কথা থাকলে সবকিছু নিখুঁতভাবে করার টেনশানে গৃহকর্ত্রী নিজেই ভাল করে খেতে পারেন না।'

'এই তো বুঝতে পেরেছেন,' টেবিলে চাপড় দিল আসিফ। 'তাই সুযোগ পেলে নিজেই নিজের মেহমান হয়ে যাই।'

একসঙ্গে হেসে উঠল ওরা দু'জনে।

প্রসঙ্গ পাল্টাল স্বাতী, কিছুই জানে না এমন ভাব করে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি ঢাকায় থাকেন?'

'না, চট্টগ্রামে। ওখানে একটা কারখানা আছে আমার।'

'কি তৈরি করেন আপনি?' স্বাতীর সাংবাদিক সত্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আবার। যতদূর মনে হচ্ছে পত্রিকার খবরটা সম্বন্ধে কিছুই জানে না আসিফ, এখন পর্যন্ত নিজের সম্বন্ধে কোন মিথ্যে কথা বলেনি সে। সেটাই ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে স্বাতীকে। গোপন কোন কারণে কেইমেনে এসে থাকলে পরিচয় গোপন করাটাই স্বাভাবিক ছিল।

'আমি, না আমার কারখানা?' জানতে চাইল আসিফ।

'দুটো কি ভিন্ন?'

'হ্যাঁ। কারখানায় আমরা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির পার্টস তৈরি করি। আমার কারখানার নাম পলিটেক ইণ্ডাস্ট্রিজ। তবে আমি নিজে একজন ইনভেনটার,

আবিষ্কারক।'

'ইনভেনটাররা তো একটু পাগলাটে হয়, তাই না?' হালকাভাবে বলল স্বাতী, 'অ্যাবসেন্ট মাইনডেড প্রোফেসারের কথা মনে পড়ে যায়।'

হো হো করে হেসে উঠল আসিফ, 'আমাকে কি তাই মনে হয়? অবশ্য একমাত্র পাগলরাই নিজেদেরকে সুস্থ মনে করে।'

টুকটুকে লাল একটা স্ট্রবেরী মুখে পুরল স্বাতী, 'তা এখন আপনি কি আবিষ্কার করছেন?'

'কথা-বলা রোবট, যারা হেঁটে চলে বেড়াতে পারে। গাড়ির কারখানায় যেসব রোবটিক-আর্ম ব্যবহার করা হয় সেরকম নয় কিন্তু। এরা ব্যক্তিগত কাজে সাহায্য করবে, ঘরোয়া-রোবট বলতে পারেন।'

'তাহলে আমার জন্যে একটা অর্ডার নিন। আমাদের বাসার বুয়া আজকাল প্রায়ই গার্মেন্টসে কাজ নিয়ে চলে যাবার হুমকি দিচ্ছে,' হাসতে হাসতে বলল স্বাতী।

'আপনি মনে হয় আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করেননি। আমার রোবট হিলডা কিন্তু অনেক কাজ করতে পারে। বাড়িতে লোক এলে দরজা খুলে দেয়। এমনকি সালাদ কাটা—পানি আনা—ঘরদোর পরিষ্কার করা সবই করতে পারে।'

লাফিয়ে উঠল স্বাতী, 'হিলডা? হেনরি বা হারবার্ট নয় কেন? ঘরের কাজ করে বলেই কি মেয়েলী নাম রাখতে হবে?'

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'হাত উঁচু করল আসিফ, 'আপনি ভুল বুঝেছেন। হিলডা মোটেই কাজের লোক নয়। সে আমার বন্ধু, বান্ধবীও বলতে পারেন। পাঁচটা ভাষায় কথা বলতে পারে, এমনকি অবিকল রেজুওয়ানা চৌধুরী বন্যার গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে। ভুল করে কখনও দু'পায়ে দুরকম মোজা পরে ফেললে হিলডাই ভুল ধরিয়ে দেয়।'

হাসতে হাসতে স্বাতীর চোখে পানি বেরিয়ে গেল, 'যাহ্! আপনি ঠাট্টা করছেন। রোবট কখনও এতসব কিছু করতে পারে না।'

'হয়তো আমি একটু বাড়িয়ে বলছি,' আহতকণ্ঠে বলল আসিফ। 'কিন্তু আজকাল রোবটিক্স যে কত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। হিলডাকে প্রথম যখন তৈরি করি তখন অনেক কিছুই সে পারত না। তারপর থেকে বলতে গেলে প্রতিদিনই একটু একটু করে ওকে গড়ে তুলছি।' ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেল আসিফ। স্বাতীর খালি গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে

বলল, 'সেই তখন থেকে শুধু নিজের কথাই বলছি। আপনার সম্বন্ধে কিছুই তো জানা হলো না। ঢাকায় কি করেন আপনি? কি যেন ব্যবসার কথা বলছিলেন?'

স্বাতীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সাংবাদিকতার কথা কিছুতেই বলা যাবে না আসিফকে, অন্তত এখানে ওর আগমনের কারণ উদ্ধার না করা পর্যন্ত তো নয়ই। সম্ভাব্য স্টোরি হাতছাড়া করতে চায় না স্বাতী। 'সোনার দোকান আছে আমাদের। বায়তুল মোকাররম আর এলিফ্যান্ট রোডে। নাম স্বাতী জুয়েলার্স,' ছোট্ট করে পানির গ্লাসে চুমুক দিল স্বাতী।

'আরে, তাই নাকি! ওটা আপনাদের! স্বাতী জুয়েলার্স তো ঢাকার সবচেয়ে বড় সোনার দোকান। কিন্তু ব্যবসার কাজে আমেরিকা যাবার কথা বলছিলেন...'

'ন্যুইয়র্ক, ন্যুজার্সি আর ওয়াশিংটনেও আমাদের তিনটে দোকান আছে। সেগুলো দেখাশোনার জন্যেই দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।'

'আপনি ন্যুজার্সিতে যান! আমি আট বছর ছিলাম ওখানে।'

'আচ্ছা!' না জানার ভান করে সরলমুখে স্বাতী জানতে চাইল, 'কি করেতেন ওখানে? নিশ্চয়ই পড়াশুনা?'

'হ্যাঁ। ইন্টারমিডিয়েট পাস করেই চলে গিয়েছিলাম। ডক্টরেট করার পর ফিরে আসি। আপনি ওকলাহোমাতে কিসের উপর পড়াশুনা করছেন?'

একটু ইতস্তত করে স্বাতী বলল, 'জার্নালিজ্‌ম। তবে ওখানে ডিগ্রী শেষ করতে পারিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার আগেই অবশ্য মাস্টার্স করেছি। কিন্তু আপনি দেশে ফিরে এলেন কেন? রোবটিক্সের গবেষণা তো ওদেশে বসেই ভালভাবে করা যেত।'

'অনেকগুলো কারণ। প্রথমত, আমি কারও অধীনে থেকে কাজ করতে চাইনি। আমেরিকায় বসে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ ধরনের গবেষণা করা প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, আমি যে ধরনের কাজ করছি তাতে টেকনলজির চেয়ে উদ্ভাবনী শক্তির দরকার বেশি। তাছাড়া যখন যা দরকার তা বিদেশ থেকে আনিয়ে নিই। তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় কারণ, আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমি ছাড়া দেখাশোনা করার কেউ ছিল না।'

বাতাসে উড়ে আসা একগুচ্ছ খুচরো চুল কপাল থেকে সরাতে সরাতে স্বাতী প্রশ্ন করল, 'আপনার কোন ভাইবোন নেই?'

মাথা নাড়ল আসিফ, 'না। আমার দু'বছর বয়সে বাবা মারা যান। মা-ই এতদিন কারখানার দেখাশোনা করে এসেছেন। কিন্তু হঠাৎ করে ক্যান্সার ধরা

পড়তে সবকিছু বদলে গেল।'

'উনি...'

'আট মাস হলো মা চলে গেছেন।'

চুপচাপ ওরা বসে রইল অনেকক্ষণ। দূরে সাগরের কালো জলে ফসফরাসের দ্যুতি। সাগরের চাপা গর্জন ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বাতাসে হাহাকার।

উঠে দাঁড়াল আসিফ, 'চায়ের পানি বোধ হয় শুকিয়ে গেল। আপনি একটু বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি।'

আসিফের পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসল স্বাতী। তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে চিন্তা করতে থাকল। প্রায় অপরিচিত এক যুবক, অথচ ওর সামনে এতটুকু অস্বস্তিবোধ করছে না স্বাতী। বরং প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছে। আসিফের সঙ্গে কথা বলতে কেন এত ভাল লাগছে? ওর নিখুঁত বাচনভঙ্গি? ব্যক্তিত্ব? স্মার্টনেস? নাকি ওর সুদর্শন চেহারার জন্যে? নাহ্! এসব কিছুই নয়। অন্য কিছু।

'চিনি? ক্রিম?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল আসিফ।

চমকে উঠে বসল স্বাতী, 'দুটোই।' আসিফের হাতের চায়ের সরঞ্জামের দিকে ইঙ্গিত করে হেসে বলল, 'আপনার মত একটা রোবট পেলে মন্দ হত না।'

স্বাতীর দিকে চায়ের কাপটা ঠেলে দিয়ে গভীর চোখে তাকাল আসিফ, 'দরকার নাকি? তাহলে বলুন, অতিসত্বর ডেলিভারি পেয়ে যাবেন।' স্বাতীর চোখের পাতায় লজ্জার ছায়া লক্ষ্য করে কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করল, 'আমি যে রোবট নই তাই বা কে বলল আপনাকে?'

হেসে উঠল স্বাতী, 'হ্যাঁ, আমাকে আহাম্মক পেয়েছেন!'

ঠিক তক্ষুণি ওদেরকে চমকে দিয়ে ফোন বেজে উঠল। 'এক্সক্যুজ মি,' বলে প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল আসিফ।

এতটা ব্যস্ত হবার কি আছে? এতক্ষণ তো বেশ খোশমেজাজেই গপ্পসপ্প করছিল। কে ফোন করেছে? তাতে তোমার কি—নিজেকে চোখ রাঙাল স্বাতী। আসিফ রোবটিক্স নিয়ে গবেষণা করছে—এছাড়া আর সবকিছুই স্বাভাবিক। গবেষণার ব্যাপারটাও গোপন বলে মনে হলো না। পত্রিকাতেও সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। যতদূর মনে হচ্ছে পত্রিকায় ছাপা খবরটার মধ্যে কোন ভজঘট আছে। ভুল খবর ছেপেছে ওরা।

অন্য সবার মত আসিফও হয়তো শুধু নির্জনে ক'টা দিন বিশ্রাম নিতে

এসেছে। যদিও দেখে মনে হয় সর্বক্ষণ ওর মাথার ভেতর গভীর চিন্তা চলছে, নিজের প্রাইভেসি বজায় রাখতেও বদ্ধপরিকর। কিন্তু বিজ্ঞানীরা হয়তো এরকমই হয়, কে জানে?

সুইট্জারল্যাণ্ডের মত কেইমেন দ্বীপপুঞ্জও বড়লোকদের কালো টাকা লুকিয়ে রাখার স্বর্গরাজ্য। সত্যি বলতে কি, গোপন ব্যাঙ্কিঙ নীতিমালার জন্যেই কেইমেন বিখ্যাত। আসিফ সেধরনের কোন কাজে আসেনি তো?

রান্নাঘরের কাউন্টারে রাখা টিউলিপের তোড়াটার কথাও স্বাতী কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কার জন্যে কিনে এনেছে ফুলগুলো? ওর কোন প্রেমিকা আছে কেইমেনে? কিন্তু তাহলে স্বাতীর প্রতি এত আগ্রহের কি কারণ? স্বাতী স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে আসিফের চোখে ভাল লাগা আর মুগ্ধতার ছায়া, কোন মেয়ের চোখকে তা ফাঁকি দিতে পারবে না।

নাহ্! যথেষ্ট গোয়েন্দাগিরি হয়েছে, অন্যের ব্যাপারে অযথা নাক গলিয়ে কোন লাভ নেই। উঠে দাঁড়িয়ে স্বাতী এঁটো প্লেট-গ্লাসগুলো গোছাতে লাগল। সেগুলো দু'হাতে তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে চলে এল। কাউন্টারে কাঁচের গ্লাসে টিউলিপের তোড়াটা সেই একইভাবে ঘরের শোভাবৃদ্ধি করে চলেছে। জোর করে সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে হাতের বোঝাটা সিঙ্কে নামিয়ে রাখল স্বাতী।

পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে আসিফের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, নিজের অজান্তেই কান খাড়া করল স্বাতী, 'আশ্চর্য! আমার চিঠিটা আজই চোখে পড়েছে! ড্যাম্! তোমরা যে এমন ঝামেলা পাকাবে কে তা জানত···যত্তসব! ভাগ্যিস, পুলিশকে বলে বসোনি যে আসিফ মাহমুদ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে!' বাংলায় কথা বলছে সে।

বেঁচে যাওয়া ফ্রেঞ্চ-ব্রেডের অর্ধাংশ ফ্রিজে তুলে রাখতে রাখতে স্বাতী শুনল, 'আগামীকাল এখান থেকে চলে যাবার আগে একবার ফোন করব, ঠিক আছে?' স্পষ্ট শোনা গেল রিসিভার ছুঁড়ে ফেলল আসিফ, প্রচণ্ড রেগে গেছে সে।

কার সঙ্গে কথা বলছিল আসিফ? স্ত্রী? স্বাতীর মনে পড়ল আসিফ একবারও বলেনি যে সে অবিবাহিত। পরমুহূর্তেই মনে হলো কোন মহিলার সঙ্গে আসিফ এরকম ব্যবহার করবে না, অল্প কিছুক্ষণের আলাপেই স্বাতী তা নিশ্চিত করে বলতে পারে।

আসিফকে ঢুকতে দেখে নার্ভাস হয়ে গেল স্বাতী, ও আবার ভেবে বসবে না

তো যে স্বাতী আড়ি পেতেছে! তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি তাহলে আসি, ডিনারের জন্যে ধন্যবাদ।'

লালচে দেখাচ্ছে আসিফের মুখটা, থমথমে কণ্ঠে বলল, 'বিচে হাঁটতে যাবেন? মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করা দরকার।'

ইতস্তত করল স্বাতী, 'খারাপ খবর?'

হাসির ভঙ্গি করল আসিফ, 'তা বলতে পারেন।'

স্বাতীর খুব লোভ হলো তারাভরা আকাশের চাঁদোয়ার নিচে আসিফের পাশাপাশি সাগরের তীর ধরে হাঁটবার। কিন্তু বেশ রাত হয়ে গেছে। প্রায় অপরিচিত এক যুবকের সঙ্গে এতক্ষণ বসে আড্ডা দেয়াটাও উচিত হয়নি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্বাতী, 'ভাল করে একটা ঘুম দিন, দেখবেন সকাল নাগাদ সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি বেশ ক্লান্ত।'

স্বাতীকে ওর ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল আসিফ। অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে পিছু ফিরে হাত নাড়ল, 'শুভ রাত্রি।'

## তিন

সাগরের তীর ধরে হাঁটছে আসিফ। খালি পায়ের নিচে ভেজা বালু সুড়সুড়ি দিচ্ছে। মাতাল হাওয়ায় শীতল আমেজ। চাঁদের আলোয় কেমন মায়াবী দেখাচ্ছে পরিচিত এই পৃথিবীটাকে।

সারাটা জীবন ঠিক এই রকম একটা মেয়েকে খুঁজে ফিরেছে আসিফ। সপ্রতিভ, কিন্তু উগ্র নয়। কোমল অথচ ব্যক্তিত্বশালিনী। সুন্দরী, কিন্তু অহঙ্কারী নয়। অবশেষে তার দেখা পেয়েছে ও, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দেখা না হলেই ভাল হত। চুম্বকের মত টানছে স্বাতী ওকে, অথচ এইমহূর্তে এগিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। বড় অসময়ে দেখা হয়েছে ওদের, যখন আসিফ ওর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। এক গলা বিপদের মধ্যে ডুবে আছে ও, স্বাতীকে

এর মধ্যে টেনে নেয়া যায় না।

জীবনে মাত্র দু'বার বড়ধরনের আঘাত পেয়েছে আসিফ। যেদিন ডাক্তারের মুখে মায়ের অসুখের কথা শুনল, আর মা যেদিন চোখ বুজলেন। মনে হচ্ছে আর একটা আঘাত পাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। অল্প ক'ঘণ্টার মাত্র পরিচয়, অথচ মনে হচ্ছে স্বাতীর সঙ্গে ওর জন্মজন্মান্তরের পরিচয়। স্বাতীকে হারাবার আঘাত কি ও সহ্য করতে পারবে?

এ মুহূর্তে মা কাছে থাকলে বড় ভাল হত। মায়ের কাছে ছিল সব সমস্যার সমাধান। মা ছিলেন ওর সবচেয়ে বড় বন্ধু। মা অসুস্থ হয়ে পড়লে কাজকর্ম ফেলে সর্বক্ষণ মায়ের ছায়া হয়ে ফিরেছে। মা-ও ওকে কাছে পেয়ে বড় সুখী হয়েছিলেন। বেড়াতে বড় ভালবাসতেন মা। মাকে নিয়ে এই কেইমেনে ছ'মাস বেড়িয়ে গেছে আসিফ, ছোট্ট মেয়ের মত উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন মা।

সাদা একটা শামুকের খোল কুড়িয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারল আসিফ। বালির উপর গড়িয়ে গড়িয়ে দূরের আঁধারে মিলিয়ে গেল শামুকটা। টিউলিপের গুচ্ছটার কথা মনে করে নিজেকে অভিশাপ দিল। বিকেলে দোকান থেকে কেনাকাটা সেরে বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছিল আসিফ। দোকানের ঠিক সামনেই ঠেলাগাড়িতে রকমারি ফুল সাজিয়ে বিক্রি করছে এক কিশোর। উজ্জ্বল হলুদ রঙা একরাশ টিউলিপ ওকে মনে করিয়ে দিল স্বাতীর পরনের শাড়িটার কথা। কোন কিছু না ভেবেই একগোছা টিউলিপ কিনে ফেলেছিল আসিফ। অথচ যার কথা মনে করে কেনা শেষ পর্যন্ত সাহসের অভাবে তাকে দেয়া হলো না।

একে একে পরনের পোশাকগুলো খুলে শুকনো বালুতে ছুঁড়ে দিল। তারপর দৌড়ে গিয়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল আসিফ। ঢেউয়ের দোলায় শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে আরামে চোখ বুজল। আহ্! কি শান্তি!

আর মাত্র ক'টা দিন, এর মধ্যেই কেইমেনের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু স্বাতী যদি তার আগেই ঢাকায় ফিরে যায়! মৃদু হাসল আসিফ, দরকার হলে পাতালপুরীতে গিয়ে খুঁজে বের করবে ওর স্বপ্নের রাজকন্যাকে। কিন্তু যদি কেইমেন থেকে ফিরতে না পারে ও? না, কেইমেন থেকে ফিরতে হবে ওকে, স্বাতীর আকর্ষণই ওকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাছাড়া শুধু স্বাতী নয়, ড্যান আর ওর বউয়ের কথাও চিন্তা করতে হবে। ওদের দু'জনের নিরাপত্তাও এখন আসিফের দায়িত্ব। ড্যানের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে, ওদের ইয়াট 'নাটালি' নিয়ে সাগরে যাবে আসিফ কয়েকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার জন্যে। ওদের স্বামী-স্ত্রীকে

বিপদের মধ্যে টেনে এনেছে আসিফ, স্বাতীকে কিছুতেই এর মধ্যে জড়ানো যাবে না।

চিৎ হয়ে সাগরে ভাসছে আসিফ, শীতল জলের স্পর্শে কেটে যাচ্ছে অবসাদ, দূর হয়ে যাচ্ছে সব দুশ্চিন্তা। তারাখচিত বেগুনী আকাশের নিচে এই ঘুমন্ত পৃথিবীটাকে খুব রূপসী মনে হলো, বড় মহৎ মনে হলো।

পুরানা পল্টনে 'ঢাকা টাইমসের' অফিসের সামনে গাড়ি থেকে নামলেন আই.জি শামসুল হক। ইশারায় ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বললেন ওখানেই।

অফিসের ভেতরটা আর দশটা পত্রিকা-অফিসের মতই আগোছালো। দরজার পাশের টেবিলে বসে কাজ করছেন মুসল্লি টাইপের টুপি পরা এক লোক, থুতনিতে ছাগল-দাড়ি। শামসুল হক তাঁকে বললেন যে তিনি সম্পাদক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান। অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে চলে গেলেন ভদ্রলোক, ফিরে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, 'আসুন। ওনার অফিস পিছনের দিকে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ছাগল-দাড়িকে অনুসরণ করে একটা সরু করিডরে চলে এলেন শামসুল হক। 'সম্পাদক' লেখা দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন ছাগল-দাড়ি।

নক্ করতেই ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ভেতরে আসুন।'

আধভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন শামসুল হক। ছিমছাম রুচিসম্মতভাবে সাজানো ঘরটা। শুধু বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলে রাজ্যের কাগজপত্র ছড়িয়ে আছে। ভারি চশমার উপর দিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন সম্পাদক হেলালউদ্দীন খান। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চৌকো মুখ, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবী।

হাত বাড়িয়ে দিলেন শামসুল হক, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেই চলে এসেছি, সেজন্যে ক্ষমা চাইছি। আমি...'

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন হেলালউদ্দীন খান, 'আপনি তো আই.জি শামসুল হক সাহেব, তাই না?'

হেসে ফেললেন তিনি, 'আপনার সঙ্গে কোথাও পরিচয় হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না।'

'রাজাকে তো সবাই চেনে, রাজা চেনে ক'জনকে? তাছাড়া আমি পত্রিকা চালাই, মানুষ চেনাই আমার কাজ।' আন্তরিকভাবে বললেন তিনি, 'বসুন,

বসুন।' বেল টিপে ডেকে আনলেন পিয়নকে, শামসুল হকের আপত্তি উপেক্ষা করে দুটো ঠাণ্ডা কোক নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। 'এবার বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি।'

'আমি এসেছি স্বাতী···মানে স্বাতী চৌধুরীর ব্যাপারে কিছু আলাপ করতে।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে ওর···'

'স্বাতী আমার মেয়ের মত। ওর বাবা ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু। স্বাতীর মা-ই আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।'

হাসি মুছে গেছে হেলালউদ্দীন খানের মুখ থেকে, 'হুঁ। তা কি জানতে চান বলুন।'

'দেখুন, স্বাতী বড় চাপা মেয়ে। অফিসের কোন ব্যাপারই বাড়িতে আলাপ করে না। ইদানীং ওর মা লক্ষ করছিলেন স্বাতী কোন কারণে একটু আপসেট হয়ে আছে। সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করলেও এড়িয়ে গেছে। মাত্র দু'দিন আগে আমার মেয়ের কাছ থেকে আসল ঘটনা জানা গেল। আমার মেয়ে রুহী স্বাতীর ছেলেবেলার বান্ধবী, একমাত্র ওর কাছেই মন খুলে কথা বলে মেয়েটা। আমরা যা বুঝলাম তাতে মনে হলো স্বাতীর উপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন আপনি। জোর করে একমাসের ছুটি দিয়েছেন ওকে, যেটা ওর কাছে সাসপেনশনের মতই অপমানকর। আপনার কাছে শুধু এর কারণটা জানতে এসেছি আমি। কি অপরাধ করেছে স্বাতী?'

ধৈর্য ধরে শুনলেন সম্পাদক সাহেব। তারপর চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে তার কাঁচ পরিষ্কার করতে বসলেন। 'আই.জি. সাহেব, স্বাতীর চাকরিটা সাংবাদিকের,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি, 'বড় টেনশনের কাজ। দূরদর্শী আর সহিষ্ণু না হলে এখানে টিকে থাকা দায়। স্বাতী আজকাল প্রায়ই কাজে ভুল করছিল। সেজন্যেই বিশ্রামের জন্যে ওকে ছুটিতে পাঠিয়েছি।'

পিওন কোকের দুটো ঠাণ্ডা বোতল নামিয়ে রাখল দু'জনের সামনে। ওদিকে নজর দিলেন না শামসুল হক। বললেন, 'ঠিক কি ধরনের ভুল করছিল? স্পষ্ট করে যদি বলেন···' বাক্যটা শেষ করলেন না তিনি।

নখ দিয়ে বোতলের গায়ে জমা কুয়াশায় আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে হেলালউদ্দীন খান বললেন, 'কাজে বড্ড অবহেলা করছিল। আমার কোন আদেশই মানত না। একজন নামী ব্যবসায়ীর পিছনে ক'দিন খুব লেগে রইল, ওর সন্দেহ ভদ্রলোক ড্রাগ-ব্যবসায়ী। আমি নিষেধ করার পরেও ভদ্রলোককে

জ্বালিয়ে মেরেছে সে।'

'কিন্তু সেটাই তো ওর কাজ!'

'না, আমি যা করতে বলি সেটাই ওর কাজ। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা আমার আদেশ অমান্য করেছে সে,' রাগতকণ্ঠে বললেন তিনি। 'আমি যা করেছি ওর ভালর জন্যেই করেছি। আমরা পত্রিকা চালাই, এটা আমাদের ব্যবসা। পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে অনেকগুলো লোকের রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যাবে, জানেন? স্বাতীর তো চিন্তা নেই, এটা ওর শখের চাকরি। বড়লোকের আদুরে মেয়ের এ চাকরিতে আসার কি দরকার? শুধু গরিবের না, বড়লোকদেরও ঘোড়ারোগ হয়!'

এবারে ধৈর্য হারালেন শামসুল হক। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'এটা আপনি ঠিক বললেন না। স্বাতী নিজের যোগ্যতায় এই চাকরি করছে। মাত্র অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দুর্দান্ত সব রিপোর্ট লিখে নাম করে ফেলেছে। শুধু বড়লোকের মেয়ে বলে মেয়েটার সব গুণ অস্বীকার করছেন?'

'দেখুন, আই. জি. সাহেব, স্বাতীকে আমি স্নেহ করি। মেয়েটা বড় সরল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ওর কৌতূহল একটু বেশি। আমি ওর ভালই চাই।' অতিথির সামনে রাখা কোকের বোতলটা আর একটু ঠেলে দিয়ে বললেন, 'নিন, গলাটা একটু ভেজান।'

ভদ্রতা রক্ষার্থে স্ট্র-তে মুখ ঠেকাতেই হলো। চিন্তিত ভঙ্গিতে শামসুল হক বললেন, 'খান সাহেব, আপনাকে আমি একটা অনুরোধ করব। স্বাতীর সম্বন্ধে কোনরকম সিদ্ধান্ত নেবার আগে একবার আমাকে জানাবেন। অল্প বয়সেই মেয়েটার কাঁধে অনেক দায়িত্বের বোঝা চেপেছে। কিন্তু ওর মন পড়ে থাকে এই চাকরিতে। সাংবাদিকতাই ওর ধ্যান, জ্ঞান। আমি চাই না হঠাৎ করে ও কোন কষ্ট পাক। স্বাতী বড় লক্ষ্মী মেয়ে।'

উপর নিচে মাথা ঝাঁকালেন হেলালউদ্দীন খান, 'অবশ্যই, অবশ্যই। আমার মনে থাকবে।'

পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এলেন আই. জি. শামসুল হক।

'দুটো ক্রয়সাঁ আর এক কাপ কফি, প্লীজ,' কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরীর উদ্দেশে বলল স্বাতী। চটপট অর্ডারগুলো একটা ট্রেতে সাজিয়ে স্বাতীর হাতে তুলে দিয়ে মিষ্টি হাসল কিশোরী।

সকালে বেশ বেলা করে ঘুম ভেঙেছে। তারপর গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে কেইমেন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী জর্জ টাউনে। এই বেকারিটার সামনে ফুটপাতে পাতা চেয়ার-টেবিলগুলো দেখে স্বাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখানেই নাস্তা করবে। এমন চমৎকার সকালটা ভেতরে বসে নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

ট্রে হাতে বাইরে বেরিয়ে রাস্তার দিকে মুখ করা একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসল স্বাতী। রোদ এখনও তেতে ওঠেনি, বাতাসে শীতল আমেজ। টেবিলগুলোর মাঝে মাঝে সাদা আর রক্তলাল ওলিয়ানডারের টব, ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। তুলোর মত নরম ক্রয়সাঁগুলো মাত্র আভেন থেকে বের করা হয়েছে, তাজা মাখনের গন্ধমাখা গরম ভাপ উঠছে এখনও। পরম তৃপ্তি সহকারে নাস্তা সারল স্বাতী।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে গতকালের কেনা পোস্টকার্ডগুলো বের করল। প্রথম দুটো কার্ডে সময় নিয়ে মা আর বাবনকে চিঠি লিখল। পরের দুটোতে রুহী আর চাচাজানকে।

কফি শেষ করে হেঁটে হেঁটে পোস্ট অফিসে গিয়ে কার্ডগুলো মেইল করে দিল। নিজের অজান্তেই স্বাতীর চোখ দুটো রাস্তায় হাজারো পথচারীর মধ্যে আসিফকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পাশের ঘরে আসিফের শাওয়ার নেবার শব্দ শুনেছে স্বাতী। কিন্তু শহরে রওনা দেবার সময় কটেজের সামনে আসিফের গাড়িটা দেখেনি। আগেই বেরিয়ে গেছে আসিফ।

সানিসাইড রেয়ালটির অফিসের সামনে গাড়ি থামাল স্বাতী। সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই মাঝবয়েসী সুদর্শন এক লোক ওর নাম ধরে ডাকল, 'মিস চৌধুরী যে! হঠাৎ কি মনে করে এদিকে?' কণ্ঠস্বর শুনেই স্বাতী চিনতে পেরেছে—রিচার্ড পামার।

'আমাকে চিনলেন কেমন করে?' বিস্ময়মাখা কণ্ঠে স্বাতী প্রশ্ন করে।

'কার-রেন্টাল অফিসের ডায়ানের মুখে নির্ভুল বর্ণনা শুনে।' রোদপোড়া চেহারায় অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যাবার চিহ্ন, রিচার্ড পামারকে বেশ হাসিখুশি লোক বলে মনে হলো। হাসতে হাসতেই বলল, 'তবে ও ঠিক বলেনি, যা বলেছে তার চেয়েও দ্বিগুণ সুন্দরী আপনি।'

'ব্যাপারটা ঠিক হলো না,' চামড়ার কভার মোড়া একটা সোফায় বসে পড়ল স্বাতী।

'ঠিক হলো না? কেন?' অবাক হলো রিচার্ড, ডায়ানের মত তার কণ্ঠস্বরেও

ব্রিটিশ ছাপ। 'আমার তো এতদিন ধারণা ছিল প্রশংসা শুনলে সুন্দরী মেয়েরা খুশি হয়।'

'সব সময় নয়।' হাসল স্বাতী, 'আমি এখানে এসেছি নালিশ করতে, আর শুরুতেই আমাকে আপনি দুর্বল করে দিচ্ছেন।'

'হায় আল্লাহ্!' কাতরে উঠল রিচার্ড, 'এইমাত্র আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গে একচোট হয়ে গেল!'

'উনি এখানে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। আপনাকে অন্য কোন কটেজে সরিয়ে নেবার জন্যে আমাকে মোটা ঘুষ দেবার চেষ্টা করছিলেন। পুরো কটেজটা উনি ভাড়া নিতে চাইছেন।'

অবাক হয়ে গেল স্বাতী। 'আমাকে সরাবার জন্যে ঘুষ পর্যন্ত দিতে চেয়েছে? কেন?'

শ্রাগ করল রিচার্ড। 'কেমন করে বলি? প্রতি বছর কেইমেনে শত শত লোক আসে যারা নিজেদের পরিচয় এবং পেশা সম্বন্ধে পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখে। বিশেষ করে বড় বড় ব্যবসায়ী আর ব্যাঙ্কাররা। আমরা তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। কেইমেন কালো টাকা লুকিয়ে রাখার স্বর্গরাজ্য।'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রিচার্ড। 'জর্জ টাউনে চারশোরও বেশি ব্যাঙ্ক আছে। একমাত্র লণ্ডন আর নিউ ইয়র্কেই এতগুলি ব্যাঙ্ক আছে। সুইটজারল্যাণ্ড, হংকং আর বাহামার সঙ্গে সঙ্গে কেইমেনও আজকাল কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে আমরাও মানুষের চলাফেরা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।'

'তা আমার প্রতিবেশীকে কি বলে বিদায় করলেন?' অভিমানে ভার হয়ে আছে স্বাতীর মনটা।

'আগেই তো বলেছি কোন কটেজ খালি নেই। শহরের এক হোটেলে শুধু একটিমাত্র ঘর খালি আছে। রাজি থাকলে বলুন, ঘুষের টাকাটা দু'জনে ভাগাভাগি করে নেয়া যাবে।'

'মাথা খারাপ!' চট করে কাজের কথায় চলে এল স্বাতী, 'রিজার্ভেশনের সময় আমি কিছু খাবার চেয়েছিলাম...'

'ও, এই ব্যাপার! মিস্টার মাহমুদ সব বলেছেন। ওনার ফ্রিজে চলে যাওয়া খাবারগুলো উনি রেখে দেবেন। আপনার খাবারগুলো দুপুরের মধ্যেই কটেজে

পাঠিয়ে দেব। আপনি তো আমাদের মেইড-সার্ভিস নেননি, তাই না?'

'হ্যাঁ। ঘরদোর আমি নিজেই পরিষ্কার করব। সকালে আমি যখন ঘুমাব তখন মেইড এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি করবে, তা আমার সহ্য হবে না।' চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'খাবার নিয়ে যখন লোক যাবে তখন কি আমাকে কটেজে থাকতে হবে?'

'না না, আমাদের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে,' উঠে গিয়ে স্বাতীর জন্যে দরজা খুলে ধরল রিচার্ড।

বিদায় নিয়ে বাইরে পা দিতেই মেঘ নেমে এল স্বাতীর চেহারায়। ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার জন্যে আসিফ এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে! স্বাতী ওকে এতটা বিরক্ত করেছে! গতরাতের কথা মনে করে নিজের উপর খুব রাগ হলো। কি দরকার ছিল যেচে পড়ে ওঘরে হানা দেবার! আসিফের যদি কিছু গোপন করার থাকে তাহলে তো বিরক্ত হবারই কথা।

স্বাতী সিদ্ধান্ত নিল এখন থেকে আসিফকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলবে। আসিফ যদি সত্যিই কালো টাকা লুকিয়ে রাখার জন্যে কেইমেনে এসে থাকে, তাহলেও ওর উপর গোয়েন্দাগিরি করার কোন অধিকার স্বাতীর নেই। কারণ ব্যবস্থাটা বেআইনী নয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্বাতী আবিষ্কার করল বাইশ মাইল লম্বা আর আট মাইল চওড়া একটা দ্বীপে এ ধরনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সহজ কাজ নয়। স্বাতী আর আসিফ প্রায় একই সময় দু'দিক থেকে একই সার্ভিস স্টেশনে এসে ঢুকল। আসিফ হাতের ইশারায় অ্যাটেনডেন্টকে আগে স্বাতীর গাড়িতে গ্যাস ভরতে বলল। গাড়ি থেকে নেমে স্বাতীর জানালার সামনে নিচু হলো, 'কি খবর, স্বাতী?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বাতী ভাবল, আসিফ যখন হাসে তখন ওর উপর রাগ করে থাকে কার সাধ্য! আসিফের পরনে খাকি শর্টস্ আর জলপাই-রঙা টি-শার্ট, পায়ে স্নিকার। ম্লান হাসল স্বাতী, 'এই তো চলে যাচ্ছে। বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?'

এক হাত স্বাতীর গাড়ির ছাদে, অন্য হাতে কপালে নেমে আসা চুল পিছনে ঠেলে দিতে দিতে আসিফ বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্য এখন আমার কাজ করার কথা।'

চেষ্টা করেও নিস্পৃহ ভাবটা বজায় রাখতে পারল না স্বাতী, 'কাজ? আপনি এখানে বেড়াতে আসেননি?'

'না। ছুটি কাকে বলে আমি জানি না। সপ্তায় সাত দিনই দশ থেকে বারো

ঘণ্টা করে কাজ করি আমি। তাই আজ একটু ফাঁকি দিতে ইচ্ছে হলো।'

রিয়ার-ভিউ মিররে স্বাতী দেখতে পেল ট্যাঙ্কে গ্যাস ভরা হয়ে গেছে। ব্যাগ থেকে টাকা বের করে দাম মিটিয়ে দিল। স্টার্ট দিয়ে এক ঝলক তাকাল আসিফের দিকে, 'আসি তাহলে?' রাস্তায় নামতে নামতে রিয়ার-ভিউ মিররে দেখল পকেটে হাত পুরে ওকে দেখছে আসিফ।

হাইওয়েতে উঠে স্পিড বাড়িয়ে দিল স্বাতী। জোর করে আসিফের চিন্তা দূর করে দিল মাথা থেকে। আগামী কয়েকদিনে কি কি করবে তার পরিকল্পনা করতে শুরু করল। গাইডবুক দেখে ইতিমধ্যেই মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছে স্কুবা ডাইভিঙে যাবে। আমেরিকায় থাকাকালীন স্কুবা ডাইভিঙের একটা কোর্স নিয়েছিল স্বাতী, এখন সেটা কাজে লাগবে। সমুদ্রের রহস্য সবসময়ই স্বাতীকে আকর্ষণ করে, তাছাড়া কেইমেনের প্রবাল প্রাচীরের সুনাম বিশ্বজোড়া। দেখে না গেলে মরেও শান্তি পাবে না। এছাড়াও বোটে করে আশেপাশের দ্বীপগুলো ঘুরে দেখার ইচ্ছে আছে। হঠাৎ রিয়ার-ভিউ মিররে স্বাতী দেখল, সাইডরোড থেকে একটা গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে হাইওয়েতে উঠল। বিপদজনকভাবে কমে আসছে দূরত্ব। স্বাতী সাবধান হবার আগেই পিছন থেকে ধাক্কা দিল গাড়িটা, কড়কড় করে ধাতব শব্দ হলো।

রাগে অন্ধ হয়ে গেল স্বাতী। গাড়ি থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল। ফুঁসতে ফুঁসতে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল পিছনে থেমে পড়া গাড়িটার দিকে। ছোট্ট কালো গাড়িটার ভেতর চাপাচাপি করে বসে আছে পাঁচ/ছ'জন মঙ্গোলিয়ান চেহারার যাত্রী, একটা মেয়েও আছে।

'কি ব্যাপার? চোখে দেখেন না নাকি?' কোমরে হাত দিয়ে রুখে দাঁড়াল স্বাতী, 'আমার কোন দোষ ছিল না, আপনারা পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছেন।'

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামেনি। কোন উত্তর না দিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল, যেন উত্তর দেবার আগে তাদের সমর্থন চাইছে। হাবভাবে অপ্রস্তুত ভঙ্গি।

স্বাতীর রাগ পড়ে এল, এভাবে মাথা গরম করা উচিত হয়নি। এই লোকগুলোও ওর মতই ট্যুরিস্ট। তবে ওরা চাইনিজ, নাকি কোরিয়ান, না ভিয়েতনামী তা আন্দাজ করতে পারল না স্বাতী। অন্য অনেকের মত স্বাতীও ওদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না।

দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল ড্রাইভার, পরনে দু'সাইজ বড় ঢলঢলে সস্তা একটা

কালো স্যুট। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'আপনি হঠাৎ স্পিড কমিয়ে দিয়েছিলেন।'

'ঠিক আছে, আগে পুলিশ আসুক তারপর দেখা যাবে দোষটা ঠিক কার,' শান্ত গলায় বলল স্বাতী।

'না,' প্রতিবাদ করল ড্রাইভার, ছোট ছোট চোখ দুটোতে অস্থিরতা। 'পুলিশ ডাকার দরকার নেই, আমরা নিজেরাই মিটমাট করে ফেলি।' এগিয়ে গিয়ে স্বাতীর গাড়ির বাম্পারটা পরীক্ষা করল, তারপর হাসিমুখে বলল, 'তেমন কিছুই হয়নি।' পকেট থেকে বেশ কিছু ডলার বের করে স্বাতীর দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

'উঁহুঁ, আমি ওটা নিতে পারব না। গাড়িটা আমার নয়, রেন্টাল কম্পানির।' এরা বোধহয় এখানকার নিয়মকানুন জানে না। 'রাস্তার ওপাশে একটা দোকান দেখা যাচ্ছে। চলুন, ওখান থেকেই থানায় ফোন করি।'

'একটু অপেক্ষা করুন,' স্বাতীকে বাধা দিয়ে গাড়িতে ফিরে গেল ড্রাইভার। দুর্বোধ্য বাক্যালাপ শুরু হয়ে গেল যাত্রীদের মধ্যে, একই সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে গেছে সবাই। ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে থাকা ভদ্রলোককে অন্যদের থেকে ভিন্ন মনে হচ্ছে। পরনের স্যুটটা দামী, চ্যাপ্টা চৌকো মুখে আভিজাত্যের ছাপ। বসে থাকা অবস্থাতেই বোঝা যাচ্ছে অন্যদের থেকে বেশ কিছুটা লম্বা, চওড়া কাঁধ। ছোট ছোট চোখ দুটোতে জ্বলন্ত দৃষ্টি। একটু অস্বস্তি বোধ করল স্বাতী, মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকা ।

কিচিরমিচির ঐক্যতানের ভেতর কখন গাড়িটা স্টার্ট নিয়েছে স্বাতী বুঝতেই পারেনি। যখন টের পেল তখন গাড়িটা তীরবেগে ওর গা ঘেঁষে সামনে লাফ দিয়েছে। চমকে পিছু হটতে গিয়ে স্বাতী পড়ে গেল। ছোট্ট কালো গাড়িটা প্রচণ্ড গতিতে ইউ-টার্ন নিয়ে যে সাইডরোড ধরে এসেছে সে রাস্তায় নেমে মিলিয়ে গেল পিছনে ধুলোর মেঘ তুলে।

## চার

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল স্বাতী। সংবিৎ ফিরে পেয়ে লাফিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে পড়ল। ধুলোর মেঘটা অনুসরণ করে সাইডরোডে নেমে গেল। কিন্তু উল্টোদিক থেকে এক ঝাঁক সাইকেল আসতে দেখে গতি কমাতে বাধ্য হলো। তারপর বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েও কালো গাড়িটার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। রাস্তার দু'পাশে গাছগাছালি আর মাঝে মাঝে দু'একটা খড়ো-চালের কুটির, আশেপাশে কোন গাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে রাস্তার শেষ মাথায় চলে এল স্বাতী, সামনে খোলা সমুদ্র। দূরে জলের কাছাকাছি বাচ্চারা খেলছে, তোয়ালে বিছিয়ে উপুড় হয়ে রোদ পোহাচ্ছে ক'জন মহিলা। রাস্তার দিকে কারোই মনোযোগ নেই। গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তার পাশের প্রথম বাড়িটার সামনে এসে থামল স্বাতী। অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করার পর থুত্থুড়ে বুড়ো এক লোক বেরিয়ে এল। কালো রঙের কোন গাড়ি এদিকে এসেছে কিনা জানতে চাইলে মাথা নাড়ল, 'আমি ঘুমাচ্ছিলাম।' ক্ষমা চেয়ে গাড়িতে ফিরে গেল স্বাতী।

রাগে, দুঃখে আর হতাশায় মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। কেইমেনে আসার পর থেকে কিছুই যেন ঠিকভাবে হচ্ছে না। পদে পদে ঝামেলা। অ্যাক্সিডেন্ট করে লোকগুলো এভাবে পালাতে পারে তা স্বাতী কল্পনাও করতে পারেনি। ওরা কারা? কেন এভাবে পালিয়ে গেল? ছুটি কাটাতে এসে এসব ঝামেলা আর ভাল লাগে না।

স্বাতী সোজা চলে এল এয়ারপোর্টের কার-রেন্টাল এজেন্সিতে। ডায়ান ওকে দেখে মিষ্টি করে হাসল।

'বিপদে পড়ে এসেছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল স্বাতী।

'তাই নাকি?' ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল ডায়ান, 'গাড়ির এঞ্জিন

গণ্ডগোল করলে এক্ষুণি অন্য একটা গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন, কোন অসুবিধা নেই।'

'না, এটা সত্যিকারের বিপদ। পিছন থেকে একটা গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে, বাম্পারটা ভেঙে গেছে।'

ডায়ানের মুখের হাসি অটুট রইল, 'পুলিশ রিপোর্টটা আমাকে দিন, ইনস্যুরেন্স ক্লেইমের সঙ্গে জমা দিতে হবে।'

'বিপদ তো সেখানেই। গাড়িটা আমাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়েছে। এখন আমি কি করি?'

হাসি মুছে গিয়ে ডায়ানের নীল দুই চোখে সমবেদনা ফুটে উঠল। 'আমার ভাই পুলিশে চাকরি করে। ওকে আমি এক্ষুণি ফোনে ডাকছি, আপনি ততক্ষণে গরম এক কাপ কফি খান।'

'ধন্যবাদ,' হাঁফ ছেড়ে বাঁচল স্বাতী। কাপে কফি ঢেলে নিয়ে ছোট ছোট চুমুক দিতে শুরু করল।

'ববি এক্ষুণি চলে আসবে,' রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে ওকে জানাল ডায়ান। 'আপনার কি অন্য একটা গাড়ি দরকার? যেটা পছন্দ হয় নিয়ে যেতে পারেন।'

'না,' মাথা নাড়ল স্বাতী। 'কেমন যেন ভয় ভয় করছে। তারচেয়ে আমাকে একটা সাইকেলের ব্যবস্থা করে দিন।' দু'জনেই হেসে ফেলল ওরা। স্বাতীর মনমরা ভাবটা কেটে গেল।

ডায়ানের ভাই ববি স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্ট, হাসিখুশি ভদ্র ছেলে। ডায়ানের মতই নীল চোখ, সোনালী চুল। ববি কথা দিল কালো গাড়িটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। স্বাতীকেও অনুরোধ করল রাস্তায় বের হলে চোখকান খোলা রাখতে, গাড়িটা দেখতে পেলেই যেন ওকে জানায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ছাড়া পেল স্বাতী।

সাইকেল নিয়ে রাস্তায় নামল। অনেকদিনের অনভ্যাসে প্রথমে একটু কষ্ট হলেও মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সাইকেলটাকে বাগে নিয়ে এল। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় পড়াশুনার বাইরে বাকি সময়টা সাইকেল নিয়েই মেতে থাকত স্বাতী। বহুদিন পর আজ সাইকেলে চেপে মনে হলো যেন ছেলেবেলাটাই ফিরে এসেছে। প্রথমেই কেন সাইকেলের কথা মনে পড়েনি ভেবে আফসোস হচ্ছে।

ভাগ্যিস, কেইমেন দ্বীপপুঞ্জ পুরোপুরিই সমতল। সাইকেল চালাতে একটুও

কষ্ট হচ্ছে না। একটা রেস্টোরান্টের বাইরে সামুদ্রিক খাবারের লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেখে থামল স্বাতী। বেশ খিদে পেয়েছে, লাঞ্চের সময় হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রেন্টাল কম্পানির দেয়া চেইন দিয়ে র‍্যাকের সঙ্গে লক্ করে দিল। টেনে টেনে লক্‌টা ভাল ভাবে পরীক্ষা করল, সাইকেলটা চুরি হয়ে গেলেই সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হবে।

রেস্টোরান্টে ঢুকেই দমে গেল স্বাতী। ভেতরে দমবন্ধ করা ভীড়। দরজার কাছে লম্বা লাইন, টেবিল খালি হবার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই কৃষ্ণাঙ্গিনী ওয়েইট্রেস ছুটে এল, 'আপনি কি একা? তাহলে বারে বসে খেতে পারেন। এখানে একটা সীট খালি হয়েছে।'

এ সময় অন্য কোথাও জায়গা পাওয়াও সমস্যা হবে ভেবে লোকজনের ভীড় ঠেলে বারের দিকে এগুলো স্বাতী। মাথার উপর বেশ ক'টা ফ্যান ঘুরছে বনবন করে। তারপরেও ভেতরে গুমোট গরম, তবে রুচিসম্মতভাবে সাজানো। ছাদ থেকে পিতলের টবে ঝুলছে পুষ্পিত মৌসুমী লতা, দেয়ালে অভিজাত মিউরাল। খাবারের গন্ধে স্বাতীর খিদে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বারের কাছে এসে খালি সীটের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল।

'এই যে, কি খবর?' কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে তাকাতেই স্বাতী দেখতে পেল আসিফ ইঙ্গিতে ওর পাশের খালি সীটটা দেখাচ্ছে, ঠোঁটে রহস্যময় একটুকরো হাসি।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। রেস্টোরান্টে ঢোকার আগে বাইরে আসিফের গাড়িটা খোঁজেনি বলে নিজের উপর স্বাতী রেগে গেল। আসিফ এখানে এসেছে জানলে স্বাতী এই রেস্টোরান্টের ছায়াও মাড়াত না। কিন্তু আসিফ কি তা বুঝবে?

বিনাবাক্যব্যয়ে গদি আঁটা উঁচু টুলে উঠে বসল স্বাতী। ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে লাগল।

'আপনার জন্যে বলব নাকি একটা?' হাতের বিয়ার ভর্তি গ্লাসটা উঁচু করে দেখাল আসিফ।

'প্লীজ, আমাকে রাগাবেন না। এমনিতেই মেজাজ খাট্টা হয়ে আছে। তাছাড়া আমি ওসব খাই না।'

'কেন, কি হয়েছে?' সিরিয়াস হলো আসিফ।

'অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলাম।'

'অ্যাক্সিডেন্ট!' সোজা হয়ে বসল আসিফ। 'কোথায়? কেমন করে?'

'পিছন থেকে একটা গাড়ি ধাক্কা মেরেছে। তবে সেটা কোন ব্যাপার নয়। ধাক্কা দেবার পর গাড়িটা পালিয়ে গেল, সেজন্যেই বেশি রাগ হচ্ছে।' বারটেনডারকে একটা ঠাণ্ডা কোক দিতে বলল স্বাতী।

'আশ্চর্য তো! স্থানীয় লোক নাকি?'

একটু ইতস্তত করে বেশি কিছু না বলাই সাব্যস্ত করল স্বাতী। 'না, ট্যুরিস্ট বলে মনে হলো। তবে এত ছোট একটা দ্বীপে পালিয়ে যাবে কোথায়? দু'একদিনের মধ্যেই খুঁজে বের করে ফেলব, গাড়িটা তো চিনে রেখেছি।'

'লাইসেন্স নাম্বার টুকে রেখেছেন?'

মাথা নাড়ল স্বাতী, 'না, হঠাৎ করেই স্টার্ট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। পিছু নিয়েছিলাম, কিন্তু কোথায় যে পালিয়ে গেল!'

'ওটা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। ক'জনই বা লাইসেন্স প্লেটের দিকে তাকায়!' সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল আসিফ। 'আপনি ব্যথা পাননি তো?'

কোক গলায় আটকে খুকখুক করে কেশে উঠল স্বাতী। আসিফ যদি জানত ও সাংবাদিক! শুধু লাইসেন্স প্লেট নয়, আরও অনেক কিছু লক্ষ্য করার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েছে সে। অথচ কাজের সময় ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে রইল! নিজের উপরই স্বাতীর সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছে। নিচু গলায় বলল, 'আমি ঠিকই আছি। শুধু মনটাই খারাপ হয়ে আছে।'

ওয়েইট্রেস হাতে ধোঁয়া ওঠা প্লেট নিয়ে হাজির হলো। আসিফের সামনে প্লেটটা নামিয়ে রেখে স্বাতীর দিকে ফিরে হাসল, 'আপনি কি খাবেন? এই একই জিনিস?'

'না, আমার জন্যে একটা ভাজা লবস্টার আর সালাদ হলেই চলবে। ও হ্যাঁ, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি, প্লীজ।'

'সালাদে কি ধরনের ড্রেসিঙ চান?'

'ড্রেসিঙ দরকার নেই, শুধু দু'টুকরো লেবু দেবেন।'

ওয়েইট্রেস চলে গেলে আসিফ আগের প্রসঙ্গের খেই ধরে বলল, 'এ ধরনের ঘটনা কেইমেনে ঘটেছে বলে আগে কখনও শুনিনি। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।'

'শুধু অ্যাক্সিডেন্ট হলে এত খারাপ লাগত না। ওরা কেন যে এভাবে পালিয়ে গেল!'

'পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছে আইনের প্রতি যাদের কোনরকম শ্রদ্ধা

নেই,' দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল আসিফ।

অবাক হলো স্বাতী। আসিফের কণ্ঠস্বরে একটু যেন বেদনার ছায়া। ও কি কথাটা নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলল? কিন্তু আসিফকে দেখে তো মনে হয় না ও বেআইনী কিছু করতে পারে।

প্লেটটা স্বাতীর দিকে ঠেলে দিল আসিফ, 'আপনার খাবার আসতে দেরি হবে, দেখছেন তো কি ভীড়! আমার সঙ্গে না হয় ততক্ষণ শেয়ার করুন।'

'ধন্যবাদ।' লেজ ধরে সোনালী করে ভাজা একটা চিংড়ি তুলে নিল স্বাতী। খিদেয় রীতিমত মাথা ঘুরতে শুরু করেছে।

'গাড়ির কি খুব বেশি ক্ষতি হয়েছে?'

'হ্যাঁ...মানে, না...' হেসে ফেলল স্বাতী, 'গাড়ি বদলে একটা সাইকেল নিয়ে এসেছি।'

'ভালই তো, অভ্যাস থেকে থাকলে কেইমেনে সাইকেলই সবচেয়ে ভাল পরিবহন।' একটু সামনে ঝুঁকল আসিফ, 'স্বাতী, আপনি কেইমেনে কেন এসেছেন?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল স্বাতী। হঠাৎ কেন সে এ প্রশ্ন করল বুঝতে পারল না। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য...দেখার মত সমুদ্রসৈকত। তাছাড়া সমুদ্র আমি ভালবাসি। এখানকার প্রবাল প্রাচীরের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। ইচ্ছে আছে স্কুবা ডাইভিঙে যাব। এসব কারণই কি কেইমেনে আসার জন্যে যথেষ্ট নয়?'

'সবাই তো এখানে আসে কালো টাকা লুকিয়ে রাখার ধান্দায়।'

'আপনি বুঝি সে কাজেই এসেছেন?' ওয়েইট্রেসের রেখে যাওয়া খাবারের প্লেট টেনে নিয়ে খেতে শুরু করল স্বাতী।

হেসে ফেলল আসিফ, 'না, আমি এসেছি অন্য কাজে।'

'হিথরোতে যেভাবে চেক করল, তারপরেও মানুষ কিভাবে টাকা নিয়ে আসে?' খেতে খেতে স্বাতী মুখ তুলে তাকাল, 'আচ্ছা, আপনি তো ঢাকা থেকে আমার ফ্লাইটে হিথরোতে নামেননি, তাই না?'

'আপনার নজর বড় সাংঘাতিক। দু'দিন আগেই আমি লনডনে চলে এসেছিলাম। ওখানে কাজ ছিল। এখন আফসোস হচ্ছে, দু'দিন পরে রওনা দিলে আপনার সঙ্গে পরিচয়ের দৈর্ঘ্যটা আর একটু লম্বা হত,' গভীর চোখে তাকাল আসিফ।

চেষ্টা করেও হৃদয়ের অতলে ভাল লাগার উচ্ছ্বাসটুকু ঠেকিয়ে রাখতে পারল না স্বাতী। এই রমণীমোহন যুবককে বুঝে উঠতে পারছে না ও। দেখা হলে নিজেই যেচে আলাপ করছে, আবার ওদিকে স্বাতীকে কটেজ থেকে তাড়াবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সত্যিই কি চায় সে?

খাওয়া শেষ করেই উঠে দাঁড়াল স্বাতী। আসিফের কাছে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ও চায় না আসিফ ভাবুক স্বাতী ওকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে। পূর্ণযৌবনা সূর্য ঠিক মাথার উপর, বাতাসে আর্দ্রতাও বেড়ে গেছে। সাইকেল চালাতে চালাতে হাঁপিয়ে উঠল স্বাতী। কটেজে ফিরে লম্বা একটা ঘুম দিতে হবে।

পিছন থেকে হঠাৎ করে কেউ হর্ন দিতে চমকে উঠে স্বাতী প্রায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিল। বিরক্ত হলো সে। রাস্তার একদম ধার ঘেঁষে চলছে ও, আরও সরতে গেলে রাস্তা ছেড়ে বালুতে নেমে পড়তে হয়। ঘাড় কাত করে দেখার চেষ্টা করল কে হর্ন দিচ্ছে, ঠিক তক্ষুণি আবার হর্ন বেজে উঠল। চোখের কোণে গাড়িটার কালো রঙ দেখতে পেয়েই পিছু ফিরল স্বাতী। বিস্ময়ে নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠল। সেই কালো গাড়িটা! সেই একই ড্রাইভার!

পাশ ফিরে তাকাল ড্রাইভার। স্বাতীকে চিনতে পেরে সেও কম অবাক হয়নি। পরমুহূর্তে সাইকেল সহ রাস্তার পাশের ঢালু জমিতে ছিটকে পড়ল স্বাতী।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে চোখে অন্ধকার নেমে এল। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে চিন্তাশক্তি। হাত-পা ভেঙেছে কিনা বুঝতে পারল না। পর পর দুটো গাড়ি থামার শব্দ পেল, কিন্তু মাথা তুলে দেখার মত শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারল না। আশেপাশে কারা যেন কথা বলছে।

'মনে হয় আঘাত পেয়েছে।'

'কালো গাড়িটাই কি ধাক্কা দিয়েছে?'

'গাড়িটা থামল না কেন?'

'মেয়েটা চিৎকার করছিল···নিশ্চয়ই গাড়িটার দোষ আছে।'

অনেক কষ্টে বাঁ কনুইয়ে ভর দিয়ে চিৎ হলো স্বাতী। সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আবার চোখ খুলতেই দেখতে পেল প্রায় দৌড়ে আসছে স্নিকার পরা বাদামী একজোড়া পা। ক্লান্তিতে চোখ বুজল স্বাতী।

কানের কাছে পরিচিত কণ্ঠস্বর, 'স্বাতী, আপনি ঠিক আছেন তো? কি

হয়েছে?' ঘাসের উপর বসে পড়ে স্বাতীকে তুলে ধরল আসিফ, জড়িয়ে ধরল দু'হাতে।

ধীরে ধীরে আসিফের ঝাপসা চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। দুটো শক্ত বাহুর আলিঙ্গনে স্বাতীর সব ভয় সব উৎকণ্ঠা কেটে গেল। আর কোন চিন্তা নেই, আসিফ চলে এসেছে। পরম নিশ্চিন্তে আসিফের বুকে মাথা রাখল স্বাতী।

পরমুহূর্তেই ঘোরটা কেটে গেল। এ কি ছেলেমানুষী হচ্ছে? কত কাজ পড়ে আছে! কালো গাড়িটাকে খুঁজে বের করতে হবে। পথচারীরা যারা অ্যাকসিডেন্টটা দেখেছে তাদের সাক্ষ্য নিতে হবে। সাইকেলটার কি অবস্থা সেটাও দেখা দরকার। দু'হাতে আসিফের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল স্বাতী। 'দয়া করে আমাকে একটু দাঁড় করিয়ে দিন। গাড়িটা কোথায় গেল...'

বন্ধনটা তাতে যেন আরও দৃঢ় হলো। পরম যত্নে স্বাতীর কপালে হাত রাখল আসিফ, 'চুপচাপ শুয়ে থাকুন, আমি অ্যামবুলেন্স ডেকে আনছি।'

কপোলে আসিফের উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেতেই শিউরে উঠে জোর করে উঠে বসার চেষ্টা করল স্বাতী, 'প্লীজ, আমাকে ছেড়ে দিন, আমার কিচ্ছু হয়নি।' এত লোকের মাঝখানে সঙের মত শুয়ে থাকতে রীতিমত লজ্জা হচ্ছে, তাছাড়া তেমন কোন আঘাতও লাগেনি। শুধু বাঁ কনুই আর কব্জিতে একটু ছড়ে গেছে, ওটা কিছুই না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল আসিফ। লাভ নেই জেনেও কালো গাড়িটার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল স্বাতী। তারপর কৌতূহলী পথচারীদের ভিড়টার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, 'ঠিক কি ঘটেছিল আপনারা কেউ দেখেছেন?'

'কালো গাড়িটা আমার ঠিক সামনে ছিল,' বছর আটেকের একটা ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মহিলা বলে উঠলেন। 'ড্রাইভার বার বার হর্ন দিচ্ছিল। আপনি পিছু ফিরে তাকিয়েছিলেন। তারপরেই দেখলাম আপনি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলেন।'

'ড্রাইভার ইচ্ছে করেই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল...'

'স্বাতী...' বাধা দেবার ভঙ্গিতে আলতো করে স্বাতীর বাহুতে চাপ দিল আসিফ।

শক্ত হাতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল স্বাতী। 'আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি,'

সমবেদনা জানানোর ভঙ্গিতে বললেন মহিলা। 'আপনি ঠিক আছেন তো দরকার হলে বলুন, আমার গাড়িতে করেই নাহয় ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।'

'না, ধন্যবাদ,' একটু হাসল স্বাতী। 'আমার কিচ্ছু হয়নি। আপনি কি গাড়িটার লাইসেন্স নাম্বার দেখেছিলেন?' মহিলা মাথা নাড়লে অন্যদের দিকে ঘুরে তাকাল স্বাতী।

'পরের গাড়িটাই ছিল আমার,' এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠলেন। 'আপনার কোন দোষ ছিল না, আপনি রাস্তার ঠিক দিকেই ছিলেন। কালো গাড়িটা কেন বার বার হর্ন দিচ্ছিল কে জানে!'

'দু'বার হর্ন দিয়েছিল,' মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট ছেলেটা কথা বলে উঠল।

'শ্ শ্, এরিক!' শাসালেন মহিলা, 'বড়দের কথার মধ্যে কথা বলতে হয় না!'

'কিন্তু আমি তো লাইসেন্স নাম্বারটা দেখেছি!' নাকি সুরে আপত্তি জানাল সে, চেহারা-সুরতেই বোঝা যাচ্ছে ছেলেটা চালাকচতুর।

ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল স্বাতী। কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় স্বাতী বহুবার প্রমাণ পেয়েছে যে বড়দের তুলনায় বাচ্চাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। 'নাম্বারটা তোমার মনে আছে, এরিক?' প্রশ্ন করল স্বাতী।

'পুরোটা মনে নেই। শুরুতে একটা "ওয়াই" আর একটা "থ্রী" আছে। বাকিটুকু ভুলে গেছি।'

'তুমি তো দারুণ বুদ্ধিমান ছেলে!' উৎসাহ দিল স্বাতী। 'আর কি কি দেখেছ মনে আছে?'

'ওর কথা বিশ্বাস করবেন না,' বলে উঠলেন এরিকের মা, মুখে বিরক্তির রেখা। 'বাঁদরটা বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে ওস্তাদ।'

মাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এরিক বলে যেতে থাকল, 'গাড়িতে দু'জন লোক ছিল···লোক মানে একজন লোক, একজন মহিলা। লোকটা খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। গাড়িটা বারবার এদিক-ওদিক করছিল। মনে হয় লোকটা ভাল গাড়ি চালাতে পারে না।'

'আর কিছু মনে আছে? গাড়িটা কোন্ কম্পানির তৈরি বা কোনও ডেন্ট ছিল কিনা? লোকটা দেখতে কেমন ছিল?'

একটু চিন্তা করল এরিক। 'লোকটার চুল কালো। এছাড়া আর কিছু মনে নেই। আমি তো চেহারা দেখতে পাইনি। তবে আপনি যখন ঘুরে তাকালেন, তখন লোকটা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল,' হাসতে লাগল এরিক।

স্বাতীও হেসে ফেলল। 'লোকটার ভয় পাওয়াই উচিত। অনেক ধন্যবাদ, এরিক।' উঠে দাঁড়িয়ে অন্যদের দিকে ফিরল। 'একটা কাগজে আপনাদের ক'জনের নাম আর ঠিকানা লিখে দিলে আমার খুব উপকার হয়। বাইকটা ভাড়া করা। এজেন্সি হয়তো অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে,' বলতে বলতে স্বাতী লক্ষ্য করল আসিফের দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে বিস্ময় ফুটে উঠছে।

'ঠিক আছে, আমিই নামগুলো লিখে দিচ্ছি,' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করতে করতে বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

'আপনার বাইক ঠিকই আছে, কোন ক্ষতি হয়নি।' ঘাসের উপর থেকে সাইকেলটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে আসিফ। 'এমনকি ফ্রেমটাও অক্ষত আছে, একটা স্পোকও ভাঙেনি।'

পরনের ঢোলা মার্কিনের শার্ট আর জিন্স থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে স্বাতী একে একে সবাইকে ধন্যবাদ জানাল।

'আপনি চাইলে আমার ডাক্তারের নাম-ঠিকানা দিতে পারি,' এরিকের মা বললেন। 'দেখে মনে হচ্ছে আপনি ট্যুরিস্ট, নিশ্চয়ই কাউকে চেনেন না।'

'না না...' আপত্তি জানাতে গেল স্বাতী।

কিন্তু আসিফ ততক্ষণে বলে উঠেছে, 'হ্যাঁ, ডাক্তারের ঠিকানা পেলে খুব উপকার হত।'

'আমার কিচ্ছু হয়নি,' শক্ত গলায় বলল স্বাতী। 'ডাক্তারের কাছে যাবার কোন দরকারও নেই।'

'মাইল তিনেক দূরেই একটা এমার্জেন্সি ক্লিনিক আছে,' বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন। 'ওখানে একবার ঘুরে যাওয়াই ভাল। তাছাড়া এখন হয়তো কিছু অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু রাতবিরেতে যদি ব্যথা শুরু হয়? একজন ডাক্তারকে অন্-কলে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।' উপস্থিত সবার নাম-ঠিকানা-ফোন নাম্বার লেখা কার্ডটা স্বাতীকে দিলেন তিনি।

'ধন্যবাদ। আমার জন্যে অনেক সময় নষ্ট হলো আপনাদের। বাইকের কোন ক্ষতি না হয়ে থাকলে এজেন্সি হয়তো আর আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে না।'

যে যার গাড়িতে চেপে চলে গেলে স্বাতী দেখতে পেল বাইকটা ঘাড়ে চাপিয়ে আসিফ হাঁটতে শুরু করেছে। 'আরে! আমার বাইক নিয়ে চললেন কোথায়?' আসিফের পিছু দৌড়াতে শুরু করল স্বাতী। 'আমি কটেজে ফিরব কেমন করে?'

'সে ভাবনা আমার। বাইকটা আমার গাড়ির ট্রাঙ্কে তুলছি। আর আপাতত আপনি আমার সঙ্গে ক্লিনিকে যাচ্ছেন।'

পিছনের বুট খুলে সাইকেলটা ভেতরে ঠেলে দিল আসিফ। স্বাতীকে গাড়িতে উঠে বসতে সাহায্য করল। আপত্তি করে কোন লাভ হবে না বুঝতে পেরে মুখ বুজে রইল স্বাতী। তাছাড়া ইতিমধ্যেই হাঁটুতে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে। স্বাতীর সীট-বেল্ট আটকে দিয়ে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে আসিফ থমকে দাঁড়াল। 'আপনার চুলের রূপোর ক্লিপটা কোথায়? নিশ্চয়ই ওখানে খুলে পড়ে গেছে।'

স্বাতী নিজেও লক্ষ্য করেনি সাইকেলসহ গড়িয়ে পড়ার সময় কখন ক্লিপ খুলে চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে। আসিফের এই মনোযোগটুকু ভারি ভাল লাগল। 'ছেড়ে দিন। ওটা রূপো না, ইমিটেশন।'

'আপনি একটু বসুন, আমি খুঁজে দেখছি।' লম্বা লম্বা পা ফেলে ফিরতি পথে রওনা হলো আসিফ।

ওকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না স্বাতী। বার বার দূরে সরে যেতে চাইছে আবার একই সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। শুধুই কি ভদ্রতা? চক্ষুলজ্জা? স্বাতী নিজেও ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছে, কিন্তু কি এক অমোঘ আকর্ষণ মাকড়সার জালের মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে ওকে।

মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই ক্লিপ হাতে হাসতে হাসতে ফিরে এল আসিফ। ড্রাইভার্স সীটে উঠে বসে ক্লিপটা স্বাতীকে দিল। দু'হাত উঁচু করে ক্লিপটা চুলে পরতে যেতেই স্বাতী কাতরে উঠল, পিঠের আহত মাংসপেশীতে টান পড়ায় খচ্ করে লেগেছে।

'যদি কিছু মনে না করেন, ক্লিপটা আমি পরিয়ে দেই?' আসিফের কালো দু'চোখের গভীরে একইসঙ্গে সংকোচ আর আগ্রহের ছায়া। ওই চোখে চোখ রেখে নিষেধ করতে পারল না স্বাতী, চোখ নামিয়ে নিল। মৃদু হেসে আলগোছে স্বাতীর চুলের বোঝা জড়ো করে ক্লিপটা তাতে আটকে দিল আসিফ। স্বাতীর

ঘন পল্লব ঘেরা চোখের পাতায় তিরতিরে কম্পনটুকু আসিফের চোখ এড়াল না।

বাকি পথটা কেউ কোন কথা বলল না। গোলাপী রঙের একতলা একটা বাংলোর সামনে গাড়ি পার্ক করল আসিফ। বাইরে সাদা-কালোয় লেখা ক্লিনিকের সাইনবোর্ড। দরজা খুলে নামতে নামতে স্বাতী বলল, 'আমার বাইকটা নামিয়ে দিন। কাজ হয়ে গেলে আমি নিজেই কটেজে ফিরে যাব।'

'আমি অপেক্ষা করব, আপনি ঘুরে আসুন।'

'কতক্ষণ লাগবে কে জানে! আপনি কতক্ষণ বসে থাকবেন?'

'কোন অসুবিধা নেই। আমার হাতে অঢেল সময় আছে।'

'সকালেই না বললেন আপনার অনেক কাজ?'

'সত্যিই তাই। তবে আমার কাজ হলো চিন্তা করা। সেটা যে-কোনখানে বসেই করা যায়।'

'বাহ্! বেশ মজার কাজ তো!' হেসে ফেলল স্বাতী। 'তাহলে গাড়িতে বসেই চিন্তাভাবনা করুন। ভেতরে নিশ্চয়ই রোগজীবাণুর ছড়াছড়ি।'

'ওটা কোন ব্যাপার নয়। বাইকটা পাহারা দেবার জন্যেই বাইরে থাকতে হবে আমাকে। সুযোগ পেলেই কেউ ঝেড়ে দেবে।' সীটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল সে। 'কোন কারণে আমার দরকার পড়লে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সতর্ক পায়ে ক্লিনিকের উদ্দেশে রওনা হলো স্বাতী। যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে হাঁটার চেষ্টা করছে যাতে আসিফ বুঝতে না পারে ও হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে।

স্বাতীকে অবাক করে দিয়ে মাত্র আট মিনিট পরেই ভেতরে ডাক পড়ল। টাকমাথা শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার ওকে ভালভাবে পরীক্ষা করে রায় দিলেন, 'সবকিছুই স্বাভাবিক। আজ রাতের মধ্যে ব্যথা সেরে যাবে। হাঁটুর ব্যথাটা বেকায়দায় ঝাঁকুনি খাবার জন্যে হয়েছে। আগামীকালও যদি ব্যথা করে তাহলে এক্স-রের জন্যে একবার আসতে হবে। নাহলে এই ট্যাবলেটগুলোই যথেষ্ট।' ছোট্ট একটা সেলোফেনের প্যাকেটে কয়েকটা ট্যাবলেট স্বাতীর হাতে দিলেন তিনি। 'এখনই দুটো খেয়ে নিন। রাতে ঘুমাবার সময় খাবেন আরও দুটো।'

খুব দরকার না হলে স্বাতী ওষুধ খায় না। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে তর্ক করার কোন মানে হয় না। সামনের ডেস্কে ভিজিটের টাকা জমা দিয়ে গাড়িতে ফিরে এল সে। ঝুঁকে পড়ে স্বাতীর দিকের দরজা খুলে দিতে দিতে আসিফ ঠাট্টা করল,

'ডাক্তার কি বলল? এ যাত্রা বেঁচে যাবেন তো?'

'ইশ্! আমাকে মারে কার সাধ্য? ডাক্তারও আমার সঙ্গে একমত, আমার কিচ্ছু হয়নি।'

'তাহলে ওগুলো কি?' ইঙ্গিতে স্বাতীর হাতের ওষুধের প্যাকেটটা দেখাল আসিফ।

'বীমা। ডাক্তারের নিজের জন্যে। যাতে গভীর রাতে গায়ের ব্যথা নিয়ে ডাক্তারের ঘুম না ভাঙাই। যাই হোক, এতক্ষণ অনেক সময় নষ্ট করলেন, তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি না থাকলে একটু মুশকিলেই পড়তাম।'

'বিধাতাই সময়মত আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, ওতে আমার কোন হাত নেই।'

কটেজে পৌঁছে আসিফ স্বাতীকে ওর ঘরে আমন্ত্রণ জানাল, 'এক কাপ হট চকোলেট খেয়ে যান, আমি বানিয়ে দিচ্ছি। এত ঝামেলার পর খেতে ভালই লাগবে।'

স্বাতীর লোভ হলো। সত্যিই গরম এক কাপ চকোলেট এ মুহূর্তে শরীরের সব অবসাদ দূর করে দেবে। রিয়ালটি থেকে যদি খাবার-দাবার পাঠিয়ে না থাকে, তাহলে ঘরে ফিরে এক কাপ চা খাবারও উপায় নেই। 'চটপট বানিয়ে দিতে পারবেন তো? খেয়েই আমাকে চম্পট দিতে হবে।' বলে স্বাতী নিজের মনেই ভাবল, শুধু চকোলেটের লোভেই কি থেকে গেল ও?

## পাঁচ

ভেতরে পা দিয়েই যে কেউ বুঝতে পারবে ঘরের বাসিন্দার স্বভাব মোটেই গোছাল নয়। পলিশ করা চকচকে কাঠের মেঝেতে ছড়িয়ে আছে কয়েকটা খোলা বই আর খবরের কাগজ। সাইড টেবিলে আধ-খাওয়া চায়ের কাপ। 'বাড়িতে হিলডাই এসব করে,' বলতে বলতে লজ্জিত মুখে অনভ্যস্ত হাতে

বইগুলো গোছাবার চেষ্টা করল আসিফ।

'বেচারী হিলডা! বিনিময়ে সে কি পায়?' সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আরামে চোখ বুজল স্বাতী।

'আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব আর ভালবাসা।'

'হুম্‌ম্‌!' নড়েচড়ে বসল স্বাতী। 'সেটাই কি যথেষ্ট? বেতন, সাপ্তাহিক এবং বাৎসরিক ছুটি, সিক-লিভ—এসবের দরকার নেই?'

'না। হিলডার ওসবের দরকার পড়ে না। আমার সেবা করার জন্যেই ওর জন্ম।'

'সব পুরুষেরই যা স্বপ্ন।' চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরের তিক্ততা ঢেকে রাখতে পারল না স্বাতী।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না,' সচেতন হলো আসিফ। 'হিলডা মানুষ নয়, যন্ত্র মাত্র। তাছাড়া আমাদের সম্পর্কটা পারস্পরিক। দিনের বেশিরভাগ সময় আমার কাটে হিলডাকে কিভাবে আরও উন্নত করা যায় সে চিন্তা করে।'

'তার মানে ওকে আরও কতভাবে খাটানো যায় সে চিন্তা করে।'

রান্নাঘরে যেতে যেতে মাঝপথে থমকে দাঁড়াল আসিফ। 'পুরুষদের প্রতি আপনার এতই আক্রোশ?'

'পুরুষদের প্রতি নয়,' লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল স্বাতী। বুঝতে পারল এভাবে বলা উচিত হয়নি ওর। 'আসলে আমাদের দেশের মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের কথা চিন্তা করলে নিজেকে আমি সামলাতে পারি না। এই নব্বইয়ের দশকেও আমাদের দেশের লোকেরা মনে করে স্বামী আর শ্বশুরকুলের সেবা করার জন্যেই মেয়েদের জন্ম। শুধু পুরুষরা নয়, মেয়েরা নিজেরাও সেটাই সত্যি বলে জানে, সেভাবেই তাদের শিক্ষা দেয়া হয় এখানেই আমার দুঃখ।'

'সেজন্যেই কি আপনি বিয়ে করছেন না?'

'কেন, আমার বিয়ের বয়স কি পেরিয়ে গেছে?' হেসে ফেলল স্বাতী। 'অবশ্য আপনার অনুমান খুব একটা মিথ্যে নয়। কে-ই বা শখ করে নিজের ব্যক্তিত্ব আর স্বাধীনতা হারাতে চায়?'

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আসিফ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ হাসল, 'পৃথিবীর পুরুষ-জাতির পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে আমি আপনার সেবা করতে প্রস্তুত। তবে এতে পাপ কতটা খণ্ডাবে জানি না। আপনি আরাম করে বসুন, আমি হট চকোলেট নিয়ে আসছি।'

জোরে হেসে উঠল স্বাতী, 'দেখা যাক এ কাজে আপনার দক্ষতা কতখানি।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এল আসিফ, দু'হাতে দুটো ধূমায়িত কাপ। মিষ্টি চকোলেটের সৌরভে জিভে পানি চলে এসেছে, কৃতজ্ঞ বোধ করল স্বাতী। 'আপনার কাছে আমি ঋণী হয়ে রইলাম। এরপরে ঋণ শোধ না করলে তো আমার বাঙালীত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।'

'আপনার ঋণ অনেক আগেই শোধ হয়ে গেছে,' খুব আস্তে করে বলল আসিফ। স্বাতীর উল্টোদিকের সোফায় বসল সে।

কাপে চুমুক দিয়ে চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল স্বাতী, না বোঝার ভান করে বলল, 'কিভাবে শোধ হলো?'

'এই যে সামনাসামনি বসে কথা বলছেন, আমাকে সঙ্গ দিচ্ছেন, দু'চোখ ভরে আপনাকে দেখার সুযোগ দিচ্ছেন...' আবেগে কাঁপছে আসিফের কণ্ঠস্বর।

বুকের ভেতরে শিরশির করে উঠল। জোর করে ভাল লাগার অনুভূতিটুকু কাটিয়ে উঠল স্বাতী, কাউকে প্রশ্রয় দিতে অভ্যস্ত নয় সে। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাতের কাপটা উঁচু করে ধরে শীতল গলায় বলল, 'ওগুলো পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। আপনাকে একদিন রেঁধে খাওয়াবার কথা ভাবছিলাম আমি।'

স্বাতী জানে ওর কথাগুলো আসিফের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে আঘাত করেছে। বেদনার ছায়া নেমে এসেছে ওর চোখের তারায়। 'দুঃখিত। আমি মনে করেছিলাম আপনাকে সঙ্গে করে ক্লিনিকে নিয়ে যাবার জন্যে ধন্যবাদ দিতে চাইছিলেন আপনি। যাই হোক, ঋণী হয়ে থাকতে না চাইলে একটা আইসক্রিমের বাক্স বা ক্যাণ্ডি পাঠিয়ে দেবেন, ওতেই কাটাকাটি হয়ে যাবে।'

'দেখুন...' অনুশোচনায় কুঁকড়ে গেল স্বাতী, মনে মনে নিজেকে শাপশাপান্ত করছে। কি দরকার ছিল ওকে এভাবে আঘাত করার? আসিফ এ পর্যন্ত কোন অসঙ্গত আচরণ করেনি, বরং বারবার স্বাতীকে সাহায্যই করেছে। কাউকে ভাল লাগা তো কোন অপরাধ নয়। 'আমি দুঃখিত। ওভাবে বলা আমার অন্যায় হয়েছে,' বলল স্বাতী।

আসিফ কিছু বলল না। একদৃষ্টে জানালার বাইরে বেগুনী বোগেনভিলিয়ার ঝাড়ের দিকে চেয়ে আছে। অন্যমনস্কভাবে কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে।

'কি হলো? মাফ করবেন না?'

ওর মাফ চাওয়ার মারমুখী ভঙ্গি দেখে আসিফ হাসি চেপে রাখতে পারল না। 'মাফ না করে উপায় আছে?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের মনেই বলল,

'আচ্ছা, কখনও চিন্তা করে দেখেছেন সময় আমাদের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?'

'সময়!' অবাক হলো স্বাতী।

'হ্যাঁ, সময়। কত তুচ্ছ অথচ কত গুরুত্বপূর্ণ! ধরুন, খুব ভাল জায়গায় যদি খারাপ সময়ে উপস্থিত হন, তাহলেই সব মাটি। আবার অসময়ে যদি কাঙ্ক্ষিতজনের দেখা পান, তাতেও কোন লাভ নেই।'

'হিলডা যদি আপনার সব কথা বুঝে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সে আমার চাইতে বেশি বুদ্ধিমতী। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

হেসে উঠল আসিফ। 'হিলডার অনেক সুবিধা আছে। যেমন, ও আমার আবেগ বা অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন নয়। হিলডা ওসব বুঝতে পারে না। তাই যখন আমি দার্শনিকসুলভ কথাবার্তা বলতে থাকি, তখন সে বারবার বলতে থাকে, "ব্যাড মেসেজ। ব্যাড মেসেজ। প্রেস এসকেপ টু ডিলিট।"

কাঁচভাঙা হাসিতে ভেঙে পড়ল স্বাতী। 'আমি ইতিমধ্যেই হিলডাকে ভালবেসে ফেলেছি,' হাসতে হাসতেই বলল সে। হঠাৎ লক্ষ করল আসিফ অপলকে ওকে দেখছে, দৃষ্টিতে একরাশ মুগ্ধতা। লাল হয়ে উঠল স্বাতী। হাতের খালি কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। 'অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম। এবার তাহলে উঠি।'

ঠিক তক্ষুণি সাইড টেবিলে রাখা ফোনটা তারস্বরে বেজে উঠল। রিসিভার তুলতে তুলতে আসিফ বলল, 'এক মিনিট দাঁড়ান।'

সম্ভবত বাংলাদেশের ফোন। কারণ আসিফ বাংলায় কথা বলছে। নিশ্চয়ই কোন ভাল খবর, খুশি হয়ে উঠেছে সে। 'ওহ্! ...দারুণ!...ওকে রিসিভ করার জন্যে এয়ারপোর্টে থাকব আমি...আর হ্যাঁ, ওকে বলো এখানে আসার পর থেকে প্রতি মুহূর্তে ওর কথা মনে পড়ছে...আসলে ওকে ছাড়া আমার চলে না...আর শোনো, প্লেনে তুলে দেবার সময় সাবধানে থেকো যাতে কেউ আবার দেখতে না পায়...'

আষাঢ়ের মেঘ নেমে এল স্বাতীর মুখে। কথা বলার ভঙ্গিতে কারও বুঝতে ভুল হবার কথা নয় আসিফ কোন মহিলা সম্পর্কে কথা বলছে। ওর স্ত্রী? আসিফ বিবাহিত! নিজে যেভাবে গোপনে দেশ ছেড়েছে, স্ত্রীকেও সেভাবেই কেইমেনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে? সেজন্যেই সাবধান করে দিল যাতে এয়ারপোর্টে তাকে কেউ দেখতে না পায়? তাহলে স্বাতীর প্রতি কেন সে দুর্বলতা প্রকাশ

করছে? কেন এভাবে বারবার ওকে কাছে টানতে চাইছে? ওই সুপুরুষ অবয়বের আড়ালে আসিফ কি আসলে এক ভণ্ড প্রতারক?

জোর করে কৃত্রিম হাসির ভঙ্গি করল স্বাতী। 'আমি তাহলে আসি,' ফিসফিস করে বলল।

এক হাতে মাউথপিস চেপে ধরে ঘুরে ওর দিকে তাকাল আসিফ। 'এত তাড়াহুড়োর কি আছে? দাঁড়ান...'

'না না, আপনি ফোনে ব্যস্ত আছেন। আমাকেও ঢাকায় একটা ফোন করতে হবে।'

আসিফকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল স্বাতী। দুরন্ত অভিমানে ভার হয়ে আছে মনটা। ঘরে ঢুকে সোজা বাথরুমে চলে এল। বাথটাবে ঠাণ্ডা পানি ভরে নগ্ন শরীরে শুয়ে রইল পুরো আধঘণ্টা। তাতেও যেন রাগটা কমল না। কেমন করে পারল আসিফ? এভাবে অভিনয় করার কি দরকার ছিল? ফোনের কথোপকথন শোনার আগে পর্যন্ত স্বাতী নিজেও বুঝতে পারেনি আসিফের প্রতি কখন সে এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা আবিষ্কার করে নিজের উপরেই এখন রাগ হচ্ছে।

তুলোর মত নরম সাদা তোয়ালেটা গায়ে পেঁচিয়ে ড্রায়ারে চুল শুকানোর সময় ফোনের শব্দ শুনতে পেল স্বাতী। দৌড়ে এসে শোবার ঘরে ফোন ধরল।

'মিস চৌধুরী,' ওপাশে পুলিশ সার্জেন্ট ববি, 'ঘণ্টা দু'য়েক আগে একবার ফোন করেছিলাম, আপনি কটেজে ছিলেন না। আমার মনে হয় আমি জানি কালো গাড়িটা কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে।'

উত্তেজনায় স্বাতীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, 'গাড়িটা কোথায় আছে?' আসিফের সম্মোহনী সাহচর্য ওকে বাস্তবতা থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে। একই দিনে দ্বিতীয়বারের মত কালো গাড়িটার সঙ্গে সংঘর্ষ হবার মত অদ্ভুত ঘটনাটাও কিনা এতক্ষণ ধরে মনেই পড়েনি।

'দাঁড়ান দাঁড়ান, অত উত্তেজিত হবেন না,' হেসে উঠল ববি। 'আমি গাড়িটাকে চোখে দেখিনি এখনও। আপনি সমুদ্রের কাছে একটা বাড়িতে এক বুড়োর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, মনে আছে?'

'হ্যাঁ, বেচারার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলাম।'

'ওই বাড়িটার পিছনদিকে বেশ ঘন জঙ্গল আছে, লক্ষ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' এলিফ্যান্ট রোডের ট্যাফিক জ্যামে পড়া রিকশার মত ধীরগতিতে

আসল কথার দিকে এগুচ্ছে বলে ববির উপর বিরক্ত হলো স্বাতী।

'ওই জঙ্গলের ভেতর বিশাল এলাকা জুড়ে একটা বাগানবাড়ি আছে। আপনি রাস্তার পাশে যে বাড়িগুলো দেখেছেন, তাদের মাঝখান দিয়ে কোথাও একটা চোরা রাস্তা আছে। আমার মনে হয় গাড়িটা এই পথে চট করে ভেতরে ঢুকে গেছে।'

'তাহলে চলুন না আমরা গিয়ে দেখি বাগানবাড়ির সামনে গাড়িটা পার্ক করা আছে কিনা।'

'না, সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া যাওয়া যাবে না। এ দেশেও আইন-কানুন আছে, জানেন তো। কোন প্রমাণ ছাড়া সার্চ ওয়ারেন্ট বের করা যাবে না।'

'তাহলে আমাকে বলে আর কি লাভ হলো!' হতাশ হলো স্বাতী।

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভাল। তাছাড়া ইন্স্যুরেন্স তো সব ক্ষতি মিটিয়ে দেবে, আপনার পকেট থেকে একটা পাইও খসবে না।'

'দেখুন,' রেগে গেল স্বাতী, 'এটা পয়সার ব্যাপার নয়। নীতির ব্যাপার।'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? বিশাল সমুদ্রের বুকে কেইমেন দ্বীপপুঞ্জ কয়েকটা ফুটকি মাত্র। আমাদের কোন প্রাকৃতিক সম্পদও নেই যা অর্থনীতিকে পোক্ত করবে। সারা বিশ্বের ধনী লোকেরা এখানে ছুটি কাটাতে আসে, ওরাই আমাদের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কোন শক্ত কারণ ছাড়া পুলিশ তাদের কাউকে ঘাঁটাতে সাহস করবে না।'

'তাহলে অন্তত একটা উপকার করুন, বাগানবাড়িটার মালিক কে সেটা বের করার চেষ্টা করে দেখুন।'

'অবশ্যই। সেটা আমার দায়িত্ব। রেকর্ড অফিসে চেক করেই আপনাকে জানিয়ে দেব।'

'আর একটা কথাও আপনাকে জানানো দরকার।' একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'কালো গাড়িটার সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়েছে।' পুরো ঘটনাটা খুলে বলল স্বাতী।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ববি। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি নিশ্চিত ওটা ওই একই গাড়ি ছিল?'

'হ্যাঁ। ড্রাইভারকেও চিনতে পেরেছি।'

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ববি। 'এরপরে আবার যদি দেখেন তাহলে লাইসেন্স নাম্বারটা মনে রাখার চেষ্টা করবেন। আমার মনে হয় আগামীকাল

শহরে না গিয়ে আপনি যদি সাগর সৈকতে সময় কাটান, তাহলেই আর ঝামেলা হবে না।'

'দুঃখিত, সার্জেন্ট। এরপরে ঝামেলায় পড়ে আপনাকে আর বিপদে ফেলার চেষ্টা করব না।' খটাশ্ করে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল স্বাতী।

ঘণ্টাখানেক পরে পাশের ঘরের দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ হলো। তারপরেই গাড়ির শব্দ। আসিফ বাইরে গেল, সম্ভবত শহরে। জোর করে মাথা থেকে ওর চিন্তা দূর করে দিল স্বাতী। গায়ে ব্যথা শুরু হয়েছে, সঙ্গে মাথাব্যথা ইচ্ছে না থাকলেও দুটো ট্যাবলেট খেতেই হলো। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ এপাশওপাশ করল। খুব একা একা লাগছে। ভারি ইচ্ছে হলো মায়ের সঙ্গে কথা বলে। প্রায় পনেরো মিনিট চেষ্টার পর ঢাকার লাইন পেল। ওপাশে মায়ের গলা শুনতে পেয়ে কোন কারণ ছাড়াই স্বাতীর দু'চোখ ভিজে এল, 'মা, মাগো, তুমি কেমন আছ, মা?'

'খুকু! কিরে, তুই ভাল আছিস তো?' লাইনের গণ্ডগোলে খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে মায়ের গলা।

'হ্যাঁ, মা। তোমার শরীর ভাল তো?' প্রায় চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে স্বাতীকে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ভাল আছি···শুধু তোর জন্যেই যা চিন্তা···' ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল মায়ের কণ্ঠ, কি দরকার ছিল অতদূরে একা একা বেড়াতে যাবার? তার চেয়ে খুলনায় তোর বড় খালার কাছে ক'দিন ঘুরে আসতি, কত খুশি হত ওরা!'

'বাবন কোথায়, মা?'

'ও তো ঘুমাচ্ছে। দাঁড়া, ডেকে দিচ্ছি।'

'না না, এখন থাক। একদম কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। আমি বরং দু'একদিন পরে আবার ফোন করব।' বিদায় নিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল স্বাতী। একরাশ প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। সব মায়ের কণ্ঠেই বুঝি এমন জাদু থাকে।

সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে বলে ঠিক করল স্বাতী। সকালে বা দুপুরে কোন এক সময়ে রিয়ালটির লোক এসে ফ্রিজে খাবার রেখে গেছে। দুটো ডিম সিদ্ধ করে কেচাপ আর

মেয়নেজ মিশিয়ে স্যাণ্ডউইচের পুর বানাল। এক গ্লাস দুধের সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে বাইরে গাড়ি থামার শব্দ পেল স্বাতী। আসিফ ঘরে ফিরেছে। পাশের ঘর থেকে ধুপধাপ আওয়াজ ভেসে আসছে, তবে কারও কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না। ঢাকা থেকে ছোট্ট ওয়াকম্যানটা সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি বলে আফসোস হলো। শব্দের অত্যাচার থেকে বাঁচার কোন পথ নেই।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করাই সার হলো, ঘুম আসছে না। আলো জ্বালিয়ে স্যুটকেস খুলল স্বাতী। আসার সময় নিউমার্কেটের জিনাত বুকস্টল থেকে চারটে উপন্যাস কিনে নিয়ে এসেছিল। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সবচেয়ে নতুন লেখাটা বেছে নিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

মগ্ন হয়ে পড়ছিল স্বাতী। মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা শিসের শব্দে। আসিফ! অপূর্ব সুরের কারুকাজ, কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরিচিত সুর, অথচ এই নির্জন রাতে কি অসাধারণ শোনাচ্ছে!

ধড়মড় করে উঠে বসল স্বাতী। দ্রুতপায়ে চলে এল বসার ঘরে। নাহ্! এ ঘর থেকে আর শোনা যাচ্ছে না। বড় অস্থির লাগছে। সোফায় বসে ফোনটা কোলে তুলে নিল। ডায়াল করল ঢাকায় রুহীর বাসার নাম্বারে। ভাগ্য ভাল হলে ওকে বাসাতেই পাওয়া যাবে। রুহী ঢাকা মেডিকেল কলেজে ফিফ্থ্ ইয়ারে পড়ছে, ওর বর রকীব ভাই ওখানকারই ডাক্তার। ওদের বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক। এগারো মাসের নাদুসনুদুস একটা ছেলেও আছে।

'হ্যালো,' রুহীই ফোন ধরেছে।

'রু, কেমন আছিস তোরা?'

'আরে! সাত সমুদ্দুরের ওপারে থেকে রাজকন্যা হঠাৎ কি মনে করে? ভাল আছিস তো? জায়গাটা কেমন রে?' খুশি হয়ে উঠল রুহী।

'দারুণ। একদম ছবির মত। তোদেরকে এত করে আসতে বললাম, এলি না। ছবি দেখে পরে নিজেই মাথা চাপড়াবি।'

'একবার সংসার শুরু কর, দেখি তারপর কত হিল্লি-দিল্লী ঘুরে বেড়াস! রোকন ভাই তো প্রায় দেবদাস হয়ে গেছে, এবার তুই রাজি হয়ে যা।'

'মাথা খারাপ! ওকে তো ভাল করে চিনিই না!'

'ন্যাকামি করিস না তো! অত হ্যাণ্ডসাম স্মার্ট ছেলে, কত ভাল চাকরি করছে! শিক্ষিত অভিজাত পরিবার। এতেও তোর মন গলে না?'

'রু, তুই আবার এমন পেশাদার ঘটক হয়ে উঠলি কবে থেকে?'

'তুই যবে থেকে ভাল ভাল ছেলেগুলোর মুণ্ডু ঘুরাতে শুরু করেছিস।'

'ওসব কথা বাদ দে। নতুন কোন খবর আছে কিনা বল্।'

একটু ইতস্তত করে রুহী বলল, 'আব্বা তোকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছেন। তোকে বলতে বলেছেন যাতে হেলাল উদ্দীন খানের সঙ্গে গ্যাঞ্জাম্ না করিস।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল স্বাতী। তারপর খুব আস্তে করে বলল, 'রু, তুই কি মনে করিস আমি খুব বেশি কৌতূহলী?'

'বেশি কৌতূহলী বলেই তো তুই এত ভাল সাংবাদিক হতে পেরেছিস। আমার বাসায় তুই যখনই আসিস, খুঁটিনাটি সব পরিবর্তনই তুই লক্ষ করিস। অন্য কেউ তো তা করে না! তোর কি মনে আছে, বাবুর যখন প্রথম দাঁত বেরিয়েছিল, আমার আগে তুই-ই সেটা আবিষ্কার করেছিলি?'

'ভাল কথা মনে করেছিস। বাবুমণিটা কই? আশেপাশে সাড়াশব্দ পাচ্ছি না!'

'ঘুমাচ্ছে। সারাদিন যা দুষ্টুমি করে না! গতকাল ক্রিস্টালের ফুলদানীটা ভেঙে টুকরো টুকরো করেছে।'

'রকীব ভাই কোথায় রে?'

'হাসপাতালে, ডিউটি আছে। নাহলে কখন আমার হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিত!'

'ঢাকায় ফেরার আগে আবার একবার ফোন করব। রকীব ভাইকে জিজ্ঞেস করিস স্পেশাল কিছু লাগবে কিনা, নাহলে কিন্তু আমার পছন্দমত উপহারই নিতে হবে।'

'আমাদের কারও কিছু লাগবে না, সু। তুই তাড়াতাড়ি চলে আয়।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল স্বাতী। এই প্রথমবারের মত ভয় হলো, যদি চাকরিটা চলে যায়! কিন্তু ও তো কোন অন্যায় করেনি! শুধু মনেপ্রাণে একজন ভাল সাংবাদিক হতে চেষ্টা করেছে। সেজন্যে প্রশংসাও কম জোটেনি। তাহলে হেলাল উদ্দীন সাহেব কেন এভাবে বাধা দিচ্ছেন?

বাইরে নিশুতি রাত। কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই। রান্নাঘরে এসে ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেল স্বাতী। তারপর শুয়ে পড়ল। ঘুমে জড়িয়ে আসছে দু'চোখ।

গভীর রাতে হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। জানালার বাইরে পৃথিবীটা

জোছনায় ভেসে গেছে। স্বাতী মনে করতে পারল না ও কোথায় আছে। চারপাশের সবকিছুই কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই ওষুধ খাবার ফল। আধো ঘুম আধো জাগরণে পাশ ফিরে শুল স্বাতী।

কারা যেন কথা বলছে! কাছেই কোথাও। দেয়ালের ওপাশে। পুরুষকণ্ঠ। অপরিচিত কোন ভাষা, কারণ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কোন আগ্রহ বোধ করল না স্বাতী। চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়ে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

## ছয়

বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল। ভোরের লালচে সূর্যকিরণ সোনালী হতে শুরু করেছে। ঝরঝরে মন নিয়ে বিছানা ছাড়ল স্বাতী। ট্যাবলেটগুলো কাজ করেছে, শরীরের কোথাও ব্যথার চিহ্নমাত্র নেই।

হাতমুখ ধুয়ে কেতলিতে কফির প্যানি চাপিয়ে দিল। খোলা জানালায় তরল পারদের মত চিকচিক করছে দিগন্তবিস্তৃত সাগর। একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে বেলাভূমিতে ছুটোছুটি করছে। আকাশে গাংচিলের ঝাঁক, তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে। কি চমৎকার একটা সকাল!

কফির কাপ হাতে কিচেন-টেবিলে এসে বসল স্বাতী। কফি খেতে খেতে ফোন-বুক থেকে দ্বীপের স্কুবা ডাইভিঙের জায়গাগুলো বাছতে শুরু করল। হঠাৎ মনে হলো কটেজের পিছনদিকে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে, যেন মাটিতে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভারী কিছু একটা। পরমুহূর্তেই রান্নাঘরের দরজায় টোকা পড়ল।

দরজা খুলে স্বাতীর প্রায় ভিরমি খাবার জোগাড়! সিলিণ্ডারের মত দেখতে ফুট পাঁচেক লম্বা একটা মেশিন দাঁড়িয়ে আছে। সর্বাঙ্গে লাল-নীল-সবুজ আলো জ্বলছে আর নিভছে। দুপাশে হাতের মত দেখতে দুটো দণ্ড, তিনটে করে আঙুলও আছে। মুখের জায়গাটায় ঈদের চাঁদের মত করে কাটা বাঁকা একটা

ফুটো, তাই চেহারাটা সর্বক্ষণই হাসি হাসি।

'স্বাতী,' ওকে অবাক করে দিয়ে একঘেয়ে যান্ত্রিক সুরে কথা বলে উঠল যন্ত্রটা, 'তোমার জন্যে নাস্তা নিয়ে এসেছি।'

'হায় আল্লাহ্!' বিস্ময় কাটিয়ে উঠে স্বাতী এবার হাসতে হাসতে খুন হয়ে গেল। দরজা থেকে সরে যেতে যেতে কোনমতে বলল, 'এসো এসো, ভেতরে এসো।'

তলায় ফিট করা চাকার উপর গড়িয়ে গড়িয়ে ভেতরে চলে এল অদ্ভুতদর্শন যন্ত্রটা, স্বাতীর ঠিক মুখোমুখি থমকে দাঁড়াল। পেটের কাছাকাছি একটা দরজা খুলে গেলে চৌকোনা একটা গহ্বর তৈরি হলো। পরমুহূর্তেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ট্রে। ট্রেতে সাজানো আছে দু'গ্লাস অরেঞ্জ জ্যুস আর একটা প্লেটে দুটো ক্রয়সাঁ।

'ভেতরে আসতে পারি?' দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছে আসিফ। বোঝাই যাচ্ছে ওর সকালটা কেটেছে সাগর সৈকতে। খালি পা, পরনে শুধু সুইমিঙ ট্রাঙ্ক। কাঁধে ঝুলানো তোয়ালেটা পেশীবহুল সুঠাম শরীরটাকে পুরোপুরি ঢাকতে পারেনি। 'কফির গন্ধ পাচ্ছি বলে মনে হয়!'

স্বাতীর চমক ভাঙল। 'আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।' জোর করে ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। 'ও কি হিলডা? কখন এল বলুন তো?'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল আসিফ। 'গতকাল সন্ধের ফ্লাইটে। আমার ম্যানেজার একটা কাঠের বাক্সে ভরে ঢাকা থেকে প্লেনে তুলে দিয়েছে। হিলডার সার্কিটে দু'একটা খুঁটিনাটি পরিবর্তন দরকার, সেজন্যেই ওকে এখানে আনিয়ে নিয়েছি।'

'ভুল তথ্য। ভুল তথ্য,' একঘেয়ে নাকি সুরে বলে উঠল হিলডা। আর হাসতে হাসতে স্বাতীর পেট ব্যথা হবার উপক্রম হলো।

'দুঃখিত, খুকুমণি,' আদরের ভঙ্গিতে হিলডার গায়ে দুটো চাপড় দিল আসিফ। 'তোমার কথাই ঠিক, আমি মিথ্যে বলেছি। আসলে তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার ভারি কষ্ট হয়, সেজন্যেই তোমাকে আনিয়েছি।'

'হিলডা আপনার কথা বুঝতে পারে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল স্বাতী।

'ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

হিলডার দিকে ফিরল স্বাতী। 'বলো তো আমি কে?'

'তুমি স্বাতী, আসিফের বন্ধু, তাই মারও বন্ধু,' আবেগহীন যান্ত্রিক কণ্ঠে

উত্তর দিল হিলডা।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল স্বাতী আসিফের দিকে তাকিয়ে। 'ওটা বলার জন্যে আপনি নিশ্চয়ই ওকে প্রোগ্রাম করে দিয়েছেন, আমরা কি কথাবার্তা বলছি তা ও কি করে বুঝবে?'

হিলডার ট্রে থেকে ক্রয়সাঁর প্লেট আর জ্যুসের গ্লাস দুটো তুলে নিয়ে টেবিলে রাখল আসিফ। 'হিলডা, ঘরে ফিরে যাও।' খটাখট শব্দ তুলে ট্রেটা ভেতরে ঢুকে গেল, গড়িয়ে গড়িয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল হিলডা। 'ওর সামনে ওর সম্বন্ধে আলোচনা না করাই ভাল,' বলল আসিফ।

'আপনি তো বড় অদ্ভুত লোক! আপনার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে হিলডা যেন মানুষ।'

'হিলডা নিজেকে তাই মনে করে। তাহলে সকালের নাস্তাটা এখানেই সেরে যাই?'

হেসে আর এক কাপ কফি বানাতে লেগে গেল স্বাতী। মনে হচ্ছে যেন বুকের উপর থেকে বিরাট একটা ভার নেমে গেছে। স্ত্রী নয়, গতকাল হিলডাকে আনার জন্যেই এয়ারপোর্টে গিয়েছিল আসিফ। আর অপূর্ব উদ্ভাবনী ক্ষমতার বলে কত কিছুই না কল্পনা করে নিয়েছিল সে! একটা পাঁচফুটি রোবটের প্রতি ঈর্ষায় সারাটা রাত কি কষ্টেই না কেটেছে, এখন সেকথা মনে করে রীতিমত হাসি পাচ্ছে। কিন্তু আসিফ সত্যিই অবিবাহিত কিনা সেটা জানা দরকার। 'হিলডা আপনার স্ত্রীকে ঈর্ষা করে না তো?' কফির সঙ্গে একটা প্লেটে পোচড্ ডিম আর ক্রিম চিজ মাখানো টোস্ট এগিয়ে দিতে দিতে আড়চোখে আসিফের দিকে তাকাল স্বাতী।

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল আসিফ। 'ঠিক জানি না। কখনও পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাইনি। কারণ এখনও বিয়ে করার সৌভাগ্য হয়নি আমার।'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্বাতী। সেটা ঢাকার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হিলডা কি নিজে থেকে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?'

'কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারে।' ডিম আর টোস্ট খেতে শুরু করল আসিফ। 'ওর মস্তিষ্কটা আসলে একটা ভয়েস-অ্যাকটিভেটেড কম্পিউটার। পশ্চিমী দেশগুলোর ঘরে ঘরে এখন এ ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে। হিলডার বেলায় সেটাকে আরও উন্নত করে নিয়েছি আমি। ক্যামেরার লেন্সের সাহায্যে ও দেখতে পায়। তবে সত্যি বলতে কি, প্রোগ্রামের বাইরে কোন কিছু করতে পারে

না সে।'

'ঘরের কাজকর্ম করতে পারে?'

'চট্টগ্রামে আমার বাড়িতে পারে। কারণ বাড়ির প্ল্যানটা ওর মস্তিষ্কে পুরে দিয়েছি। কিন্তু এখানে কটেজটা ওর অপরিচিত বলে নিজ থেকে নড়াচড়া করতে পারবে না।'

'কবে ওকে তৈরি করেছেন?'

'বছর পাঁচেক আগে। তবে তখন নড়াচড়া করতে পারত না হিলডা, দেখতেও অন্য রকম ছিল।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! নিজের চোখে কোনদিন রোবট দেখতে পাব কল্পনাও করিনি। আমার ধারণা ছিল শুধু প্রোফেসর শঙ্কুর গল্পেই রোবটের অস্তিত্ব আছে।' হিলডার আনা ক্রয়সাঁ আর জ্যুস খেতে খেতে স্বাতী জানতে চাইল, 'সব পরীক্ষা নিরীক্ষা কি শুধু হিলডার উপরেই চলে?'

'হিলডাকে "ব্যক্তিগত রোবট" বলতে পারেন। এটা আমার শখের ব্যাপার, শুধু অবসর সময়ই হিলডাকে নিয়ে মেতে থাকি আমি। তবে ভবিষ্যতের পৃথিবীতে "ব্যক্তিগত রোবট" নয়, "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রোবটেরই" বেশি চাহিদা হবে। শিল্পে বিপ্লব ঘটাচ্ছে ওরা।'

'হিলডা যদি আপনার শখ হয়, তাহলে কি নিয়ে গবেষণা করছেন আপনি?'

ইতস্তত করল আসিফ, যেন বলা উচিত হবে কিনা ভাবছে। এতে স্বাতীর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। 'আমার গবেষণার বিষয় আণ্ডার ওয়াটার এক্সপ্লোরেশন,' অবশেষে বলল আসিফ। তারপর যেন প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যেই খোলা ফোন-বুকটা টেনে নিল। 'স্কুবা-ডাইভিঙের এজেন্সিগুলো দেখছিলেন মনে হয়? যাবেন নাকি?'

'সাগর তলে চলাফেরা করাই আমার জন্যে বেশি নিরাপদ। ওখানে তো আর গাড়ি ঘোড়া নেই!'

'ওহ্ হো, জিজ্ঞেস করতে একদম ভুলে গেছি, রাতে ব্যথা-ট্যথা হয়নি তো?'

'নাহ্। দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছিলাম...' হঠাৎ করেই রাতের কথা মনে পড়ে গেল স্বাতীর। 'আচ্ছা, হিলডা কি কোন বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পারে?'

ফোন-বুকের পাতা উল্টাচ্ছিল আসিফ, হাত দুটো স্থির হয়ে গেল। 'হঠাৎ

এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন যে?'

'গতরাতে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখছিলাম, কারা যেন অজানা কোন ভাষায় কথা বলছে,' শ্রাগ করল স্বাতী।

একদৃষ্টে স্বাতীকে দেখছে আসিফ। 'কি ধরনের ভাষা, মনে আছে?'

'ঠিক জানি না,' ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে মনে করার চেষ্টা করল স্বাতী, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, মনে পড়েছে। জাপানী চাইনিজ এ ধরনের কিছু হবে। তবে দূরপ্রাচ্যের কোন ভাষা, এতে কোন সন্দেহ নেই।'

স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল আসিফের চেহারায়। ইঙ্গিতে ফে -বুকটা দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ডাইভিঙ এজেন্সিগুলোর কোনটায় ফোন করেছিলেন নাকি?'

'না। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কোথায় গেলে ভাল হবে।'

'আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি আছে?'

'না, আপনি সঙ্গে থাকলে তো খুব ভাল হয়,' ভেতরে ভেতরে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও বাইরে নিরুত্তাপ ভাব বজায় রাখল স্বাতী। বেশি উৎসাহ দেখালে যদি হ্যাংলা ভাবে? 'তাহলে কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'ঠিক আধ ঘণ্টা পরে। ছোট একটা ব্যাগে দু'একটা কাপড়-জামা নিয়ে নেবেন। অন্য একটা দ্বীপে যাচ্ছি আমরা। দরকার হলে রাতে ওখানকার কোন হোটেলে থাকা যাবে, তাহলে আর তাড়াহুড়ো করে ফিরতে হবে না।' স্বাতীকে ইতস্তত করতে দেখে হাসল, 'ওখানে আমার এক বন্ধু আর তার স্ত্রী আছে। ইচ্ছে করলে আপনি ওদের বাড়িতেও থাকতে পারেন।'

'ঠিক আছে।' আপত্তির আর কোন কারণ দেখল না স্বাতী।

ঘরে ফিরেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্বাতীর কথাই ভাবছে আসিফ। কিছুতেই ভুলতে পারছে না জলপ্রপাতের মত একঢাল চুলের সৌন্দর্য, কাজল কালো চোখের তারায় রহস্যের হাতছানি। অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে যাবার আগেই বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে স্বপ্নে দেখা এই নারীকে।

গত তিনদিন ধরে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আসিফ। অবশেষে বুঝতে পেরেছে, এই আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠার শক্তি ওর নেই ছোট্ট একটা স্পোর্টস্ ব্যাগে টুকটাক দু'একটা জিনিস গুছিয়ে নিতে নিতে নিজেকে অভিশাপ দিল আসিফ। স্বার্থপরের মত নিষ্পাপ মেয়েটাকে এ কোন্

বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে ও?

ওরা আসিফের পিছু ধাওয়া করে এই কেইমেনেও এসে হাজির হয়েছে। গতকাল গভীর রাতে আচমকা ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ভাগ্যিস, বাক্সবন্দী হিলডাকে ওরা দেখতে পায়নি। ঘুম ভেঙে চমকে উঠেছিল আসিফ, পায়ের কাছে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল ওরা তিনজন। ডলারের লোভ দেখাচ্ছে ওরা তাকে। যেন টাকাটাই মানুষের জীবনের সবকিছু। স্বাতী ঘুমের ঘোরে ওদের কথাবার্তাই শুনতে পেয়েছিল।

উপায়ন্তর না দেখে ওদেরকে একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দিয়েছে আসিফ, তবে সেটা আসল নয়। ডায়াগ্রামটা নকল, সেটা দু'একদিনের মধ্যেই ওরা টের পেয়ে যাবে। এই দু'একদিনই আসিফের জন্যে যথেষ্ট, এর মধ্যেই ওর কাজ শেষ হয়ে যাবে। হিউগোর কর্মদক্ষতা হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখার পরিকল্পনা আরও ছ'মাস আগে থেকে ঠিক করা। এখন আর সেটা পরিবর্তন করার উপায় নেই। পুলিশে জানিয়েও কোন লাভ নেই, উপরন্তু গবেষণার সব কাজ ভেস্তে যাবে। শত হলেও এটা নিজের দেশ নয়। তাছাড়া একবার পুলিশের কাছে গিয়ে ওর শিক্ষা হয়েছে। চট্টগ্রামে ওরা প্রথম যখন ওর সঙ্গে দেখা করে ভয় দেখাতে শুরু করল, তখন সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে গিয়েছিল আসিফ। অথচ বকলম ইন্সপেকটর রোবট আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা শুনে ওকে পাগল-ছাগল কিছু একটা ঠাউরে বসেছিল। ভাগ্যিস, হেমায়েতপুরে পাঠাবার আগেই পালিয়ে বেঁচেছে আসিফ। ম্যানেজার আবুল হোসেনটাও একটা গর্দভ। অফিসের টেবিলে একটা চিরকুট রেখে এসেছিল আসিফ, ওরা সেটা দেখতেই পায়নি। খবরের কাগজে ছবিটবি ছাপিয়ে নাকি বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা!

স্বাতীর কাছে মিথ্যে বলতে হচ্ছে বলে নিজের উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। এরপরে ও যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, আসিফ ঠিক করল, কিছুটা সত্যি কথা ওকে জানিয়ে দেয়াই ভাল।

সামনের দরজা ভালমত বন্ধ করে দিয়ে পিছনে চলে এল আসিফ। পরনে শর্ট্স্ আর হাতকাটা গেঞ্জি, পায়ে স্নিকার, কাঁধে স্পোর্ট্স্ ব্যাগ। কিচেনের দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে হিলডা। আসিফের জন্যে অপেক্ষা করছে। কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত রাখল আসিফ। 'স্বাতী যদি রাজি হয়, তাহলে আজ দুপুরটা ওর ঘরে কাটাতে তোমার কোন আপত্তি আছে নাকি, হিলডা?'

'নেগেটিভ,' আবেগহীন গলায় পরিকল্পনাটা সমর্থন করল হিলডা।

জিন্সের সঙ্গে গোলাপী-নীল ডোরাকাটা একটা ব্যাগি শার্ট পরে নিল স্বাতী। চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আসিফের ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিলে কেমন হয়? গতরাতের স্বপ্নের কথা বলার সময় আসিফের ভাবান্তর ওর চোখ এড়ায়নি, কিছু একটা ভজঘট আছে। ফোন তুলে নিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল স্বাতী। কয়েকটা নাম্বারে মিনিট দশেক চেষ্টার পর অবশেষে রুহীর বাসার লাইন পেল। পাঁচবার রিঙ হবার পর ফোন তুলল রুহী।

'রু, হাতে বেশি সময় নেই, শোন...'

'আরে! তুই এই অসময়ে! কি হয়েছে রে...'

'কিচ্ছু হয়নি,' ওকে থামিয়ে দিল স্বাতী। 'মুখ বন্ধ করে শুধু শুনে যা। চাচার বাসার লাইন পাচ্ছি না বলেই তোকে করলাম। হাতের কাছে পেন্সিল আছে?'

'দাঁড়া,' কয়েক সেকেণ্ড পর রুহী বলল, 'এবারে বল কি বলবি।'

'চাচাকে বলিস আসিফ মাহমুদের নামে পুলিশ বা অন্য কোন দপ্তরে কোন ফাইল আছে কিনা সেটা চেক করে দেখতে। নামটা লিখে রাখ—আসিফ মাহমুদ, কিছুদিন আগে আমেরিকা থেকে ফিরেছে। রোবট-বিজ্ঞানী। চিটাগাঙে পলিটেক ইণ্ডাসট্রিজ নামে একটা কারখানার মালিক।'

'আরে, এ যে মিস্টার আইনস্টাইন! ক'দিন আগে খবরের কাগজে এর ছবি বেরিয়েছিল না? দেখতে কিন্তু দারুণ হ্যাণ্ডসাম। কিন্তু তুই হঠাৎ এত খবর করছিস কেন?'

'এখানে এসে পরিচয় হয়েছে। একই কটেজে উঠেছি আমরা।' একটু ইতস্তত করে স্বাতী বলেই ফেলল, 'বেশ বন্ধুত্বও হয়েছে।'

'বলিস কিরে!' আনন্দে লাফিয়ে উঠল রুহী। 'রাধা তাহলে এতদিনে কৃষ্ণের বাঁশী শুনল!'

'ধ্যাৎ! এইজন্যেই তোকে কিচ্ছু বলতে ইচ্ছে করে না।' কৃত্রিম রাগ দেখাল স্বাতী। 'তেমন কিছুই হয়নি। দেশে ফিরে সব বলব। চাচাকে বলিস আগামী সপ্তাহে একবার ফোন করে জেনে নেব কি হলো।' দরজার বাইরে আসিফের শিস শুনতে পেয়ে তাড়াহুড়ো করে ফোন রেখে দিল স্বাতী। দৌড়ে এসে দরজা খুলে দিল।

আসিফের পিছন পিছন হিলডাও ঘরে ঢুকল। 'আপনার ক্লজিটে কি হিলডার

জন্যে কিছুটা জায়গা হবে? আমারটাতে ওর প্যাকিঙ বাক্সটা ঢুকিয়েছি কোনমতে। ঘর পরিষ্কার করার জন্যে আজ মেইড আসার কথা, দরজা খুলে হিলডাকে দেখতে পেলে নির্ঘাৎ ফিট হয়ে যাবে।'

'কোন অসুবিধা নেই, হিলডা আমার ক্লজিটেই থাকবে।' একটু আগের ফোন-কলটার কথা চিন্তা করে মরমে মরে যাচ্ছে স্বাতী। কাজটা কি ঠিক হয়েছে?

'আমি তাহলে হিলডাকে রিপ্রোগ্রাম করি যাতে একা একা থাকতে ওর কোন কষ্ট না হয়।' হিলডার বুকের কাছের একটা প্যানেল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আসিফ। পকেট থেকে ডিস্কেট বা মিনিয়েচার টেপের মত দেখতে কিছু একটা বের করে প্যানেলের নিচের একটা স্লটে ঢুকিয়ে দিল। সম্ভবত সাময়িকভাবে ওকে অকেজো করে দিচ্ছে। হিলডাকে ক্লজিটে ঢুকিয়ে দিয়ে স্বাতীর দিকে ফিরে হাসল আসিফ, 'তৈরি?'

মাথা ঝাঁকাল স্বাতী। 'ডাইভিঙ ইকুইপমেন্টস কোত্থেকে ভাড়া করতে হবে?'

'আপনার সি-কার্ড আছে তো? তাহলেই হবে। ড্যানের কাছে সবকিছুই আছে।'

ব্যাগ থেকে সি-কার্ড বের করে দেখাল স্বাতী। ডাইভিঙ লাইসেন্সটাকেই সি-কার্ড বলা হয়, ওটা ছাড়া সমুদ্রের নিচে নামা নিষিদ্ধ। 'ড্যান কে?' প্রশ্ন করল স্বাতী।

'আমার বন্ধু, যাদের কথা বলছিলাম একটু আগে। ড্যানের বোটে করেই ডাইভিঙে যাচ্ছি আমরা।'

'ফোন-বুক থেকে কোন এজেন্সিতে যোগাযোগ করেননি?' অবাক হলো স্বাতী।

'না। তার কি দরকার? আমি যে আণ্ডারওয়াটার রোবটটা তৈরি করছি, সেটার ওপর কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার জন্যে ড্যানের বোটটা ভাড়া করেছি ক'দিনের জন্যে। ডাইভিঙের জন্যে আলাদা করে বোট ভাড়া করার দরকার নেই।'

নতুন তথ্যটা হজম করার চেষ্টা করল স্বাতী। আণ্ডার-ওয়াটার রোবটের কথা এই প্রথম শুনল। 'তারমানে কেইমেন দ্বীপপুঞ্জে আগেও এসেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। তবে গ্র্যাণ্ড কেইমেনে এই প্রথম থাকলাম। সাধারণত কেইমেন

ব্র্যাকে ড্যানের ওখানেই থাকি আমি। বড় ধরনের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে ওখানেই যাই।'

আসিফ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব কথাই খুলে বলছে বলে স্বাতীর অনুশোচনা চরমে পৌঁছল। গাড়িতে উঠে বসার পর স্বাতী আর পারল না। বলল, 'আমার একটা স্বীকারোক্তি করার আছে।'

স্টিয়ারিঙে হাত রেখে স্বাতীর দিকে প্রশ্নবোধক চোখে চাইল আসিফ।

'আমি প্রথম থেকেই আপনার পরিচয় জানতাম। অবজার্ভারে আপনার ছবি বেরিয়েছে। কাউকে না জানিয়ে এভাবে দেশ ছাড়লেন কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আসিফ। তারপর বলল, 'অফিসে একটা চিরকুট রেখে এসেছিলাম, কেউ দেখতে পায়নি। হঠাৎ করেই চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু প্রথমদিনেই কেন বললেন না যে আমাকে আপনি চিনতে পেরেছেন?'

'জানি না,' চোখ সরিয়ে নিল স্বাতী।

## সাত

সমুদ্রের তীর ধরে উড়ে চলেছে রক্তলাল ক্রাইসলার ডাইনাস্টি। রাস্তার একদিকে সারি সারি সুসজ্জিত হোটেল, শপিং মল্ আর ফুলে ফুলে ঢাকা সবুজ পার্ক। অন্যদিকে মেঘহীন ঘননীল আকাশের নিচে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। বর্ণালী পালওয়ালা ছোট ছোট অসংখ্য সেইলবোট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সাগরের ফিরোজা জলে। ক্ষুধার্ত গাঙচিলেরা মাঝে মাঝেই নেমে আসছে জলের কাছাকাছি, উড়ে যাবার সময় রোদ লেগে ঝিক করে উঠছে ঠোঁটের ফাঁকে আঁকড়ে ধরা ছোট ছোট রূপোলী মাছ।

একটা জেটির সামনে থামল ওরা। সাগরের জলে ভাসছে সাদা রঙের মাঝারি আকারের একটা বোট।

'নাটালি,' কাঠের পাটাতনের উপর হাঁটতে হাঁটতে বোটের নামটা পড়ল

স্বাতী।

'ড্যানের স্ত্রীর নাম,' বলল আসিফ। 'খুব ভাল মেয়ে, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। বহুবছর ধরে এদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। আমেরিকায় আমি আর ড্যান একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি। মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে আসে ও। পাঁচ-ছ' বছর ধরে এখানেই আছে ওরা।'

'রোবট সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে বোট ভাড়া দেয়া ছাড়া ড্যান আর কি করে?'

'ওরা স্বামী-স্ত্রীতে একটা ফিশিং সার্ভিস চালায়। এছাড়াও ট্যুরিস্ট সিজনে ডাইভিঙ, ওয়াটার স্কিইং, সার্ফিং সবধরনের কাজে বোট আর স্পীডবোট ভাড়া দেয়। সব ব্যবস্থাই পাবেন ওর কাছে।'

কাঠের মই বেয়ে বোটে উঠে পড়ল ওরা। ইঞ্জিনরুম থেকে সুঠামদেহী লম্বা এক লোক বেরিয়ে এল, আসিফ ওর দিকে হাত নাড়ল। 'স্বাতী, এ হলো আমার বন্ধু ড্যান ম্যাথিসন, ''নাটালি''-র ক্যাপ্টেন।"

খুলি কামড়ানো লালচে-বাদামী কোঁকড়া চুল, রোদে পোড়া রুক্ষ চেহারা, অথচ নীল চোখজোড়ায় শিশুর সরলতা। 'এমন সুন্দর রোবট আসিফ এই প্রথম আমার বোটে নিয়ে এল,' মিস্টি হেসে আন্তরিকভাবে স্বাতীর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল ড্যান।

একনজরেই ভদ্রলোককে ভাল লেগে গেল স্বাতীর। আসিফের চেয়ে কম করেও পাঁচ বছরের বড় হবে, অথচ ড্যানের হাবভাবে শিশুসুলভ চপলতা। 'কি সুন্দর বোট আপনার! একটু ঘুরে দেখি?' স্বাতী অনুমতি চাইল।

'আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আসিফকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, ওর তো আবার সবকিছুই টপ সিক্রেট।'

স্বাতীর চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল আসিফ। 'আপনার জন্যে আমার সব সিক্রেটই ওপেন। ইচ্ছেমত ঘুরে দেখুন।' তারপর ড্যানকে বলল, 'মিস চৌধুরী প্রবাল প্রাচীর দেখতে চায়, তার ব্যবস্থা করো।'

'আই আই, স্যার,' কৃত্রিম স্যালুট ঠুকল ড্যান। তারপর চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েও কি মনে করে পিছু ফিরল। 'ওহ্, ভাল কথা, গতকাল কয়েকজন লোক তোমার খোঁজখবর করছিল। বলল, তোমার সঙ্গে নাকি ওদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক। এশিয়ান, চাইনিজ বা কোরিয়ান হবে। ওরা কারা? তুমি তো কিছু বলোনি!'

আসিফের দৃষ্টিতে স্পষ্ট উদ্বেগ। 'কি কথা হয়েছে ওদের সঙ্গে?' আড়চোখে স্বাতীর প্রতিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করল।

'কিছুই না। বলেছি তোমার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। আমা একজন খদ্দের, এছাড়া তোমার কোন খবর রাখি না। কিন্তু লোকগুলোকে দেখে তো সুবিধের মনে হলো না। জোটালে কোত্থেকে?'

'সবসময় কি আর পছন্দমত বন্ধু জোটানো যায়?' প্রায় ধমকে উঠল আসিফ। তারপর অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে স্বাতীর দিকে ফিরে হাসার চেষ্টা করল 'ড্যান বড় অদ্ভুত জন্তু। যাত্রীদের কাউকে পছন্দ না হলে মাঝসাগর থেকে বোট নিয়ে সোজা তীরের দিকে রওনা হয়, তারপর পয়সাকড়ি সব ফেরত দিয়ে ঘাড় ধরে বোট থেকে নামিয়ে দেয়।'

অস্বস্তি বোধ করল স্বাতী। ওর সামনে ড্যান লোকগুলোর কথা বলাতে রেগে গিয়েছে আসিফ। কেন? কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছে সে, কোন সন্দেহ নেই। ওই লোকগুলোর সঙ্গে আসিফের কি সম্পর্ক? চাইনিজ বা কোরিয়ান লোক! স্বাতী বুঝতে পারল, গতরাতের স্বপ্নটা পুরোপুরি স্বপ্ন ছিল না। একই-সঙ্গে মনে পড়ে গেল সেই কালো গাড়িটার আরোহীরাও দূরপ্রাচ্যেরই লোক। এটা কি শুধুই কাকতালীয় ব্যাপার?

আসিফ আর ড্যান ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে অন্যমনস্ক ভাবটা ঝেড়ে ফেলে একটু হাসির ভঙ্গি করল, 'চিন্তার কোন কারণ নেই, ড্যান। আমি ভদ্র হয়ে থাকব।'

কোমরে হাত রেখে কৃত্রিম রোষে আসিফের দিকে ধেয়ে গেল ড্যান। 'দ্যাখ্, শালা! তোর জন্যে এমন সুন্দর একটা মেয়ে আমাকে ভিলেন ভাবছে!' যুযুৎসুর প্যাঁচ মেরে দু'সেকেণ্ডের মধ্যেই আসিফকে পেড়ে ফেলল ডেকে। 'কেন রে, শয়তানের নাতি, আমার বদনাম করে বেড়াচ্ছিস? আমি কি স্বাতীকে তোর কাছ থেকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি? আমার বউ আছে না?' দুই বন্ধুতে মিলে বাচ্চাদের মত ঝাপটাঝাপটি শুরু করে দিল।

হাসতে হাসতে স্বাতীর চোখে পানি এসে গেল। ড্যানের প্রতি ওর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে। কি চমৎকারভাবে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটা সামলে নিল!

ভেতর থেকে কেউ ড্যানের নাম ধরে ডেকে উঠতে আসিফকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল ড্যান। স্বাতীর দিকে চেয়ে চোখ টিপল, তারপর হাসতে হাসতে ইঞ্জিনরুমে ঢুকে গেল। আসিফ কিন্তু একবারও স্বাতীর দিকে

তাকাল না। পরনের কাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দূরে সরে গেল। রেলিঙে ভর দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সাগরের দিকে।

মিনিট পাঁচেক পর হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়াল। 'কি ব্যাপার? মিস চৌধুরী যে কোন প্রশ্ন করছেন না?'

'প্রশ্ন!' বিমূঢ় হয়ে জানতে চাইল স্বাতী, 'কিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করব?'

'আপনি তা ভাল করেই জানেন।'

মৃদু গর্জন করে নড়ে উঠল নাটালি। মন্থর গতিতে জল কেটে রওনা হলো গভীর সাগরের দিকে।

আসিফের বলার ভঙ্গিতে খুব রাগ হলো স্বাতীর। 'গভীর রাতে আপনার ঘরে যে মেহমানরা এসেছিল, তাদের কথা বলছেন তো? বুঝতে পেরেছি গতরাতে স্বপ্ন দেখিনি আমি।'

শ্রাগ করল আসিফ। 'ওরা চায়নি কেউ ওদের দেখে ফেলুক, তাই অত রাত করে এসেছিল।'

উদ্দাম বাতাসে উড়তে থাকা চুলগুলোকে দু'হাতে সামলাবার চেষ্টা করতে করতে শীতল কণ্ঠে স্বাতী বলল, 'চিন্তার কোন কারণ নেই, আমি ওদেরকে দেখিনি।'

বোটের দুলুনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে বলে রেলিঙের মুখোমুখি একটা বেঞ্চে বসে পড়ল স্বাতী। আসিফ কোন কথা বলছে না দেখে অবশেষে বলল, 'ওসব কথা বাদ দিন। আপনার ব্যাপারে নাক গলাবার কোন অধিকার আমার নেই।'

রেলিঙের উপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আসিফ, অবশ্যই আছে!' স্বাতী এতক্ষণে বুঝতে পারল, ওর উপর নয়, আসিফ নিজের উপরেই রেগে আছে। দ্রুতপায়ে স্বাতীর পাশে এসে বসল। অসহায়ের মত বলল, 'আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছি। কেন, তা জানার পূর্ণ অধিকার আপনার আছে। অবশ্য যদি আমাকে ভাল করে চিনতে চান।'

হৃদয়ের গভীরে বাঁধভাঙা খুশির কাঁপন, আবেশে দু'চোখ বুজে এল। দ্রুত নিজেকে সামলে নিল স্বাতী, নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আপনাকে চিনতে চাইব? কেন?'

স্বাতীর চোখে চোখ রাখল আসিফ। 'আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই আমার পৃথিবীটা বদলে গেছে, স্বাতী। এক মিনিটের জন্যেও আপনাকে ভুলে

থাকতে পারছি না।' সামনে ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল আসিফ। 'আমি ঠিক জানি না কিভাবে বলতে হয়···কি বলতে হয়। ক'দিন ধরে নিজেকে বড় অসহায় লাগছে। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

অধোবদনে বসে রইল স্বাতী, কি বলবে বুঝে পেল না। এত তাড়াতাড়ি এরকম কিছু শোনার জন্যে ও ঠিক তৈরি ছিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরেও স্বাতীর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আসিফ। বলল, 'দুঃখিত। কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেললাম। আপনি জানতে চাইছিলেন আমি মিথ্যে বলেছি কেন।'

'আমি নই, আপনিই বলার জন্যে জোর করছেন,' বাধা দিল স্বাতী।

দিগন্তে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে আসিফ অন্যমনস্কভাবে বলতে শুরু করল, যেন ওর মন পড়ে আছে অন্য কোথাও, 'মাস চারেক আগে একটা আমেরিকান জার্নালে আমার লেখা একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়। প্রবন্ধটা আমার গবেষণা সম্পর্কিত। এর পর থেকেই কয়েকটা বিদেশী রাষ্ট্র এ ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে পড়ে।'

'গতরাতের অতিথিরা তাহলে ওদেরই কেউ।'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল আসিফ। 'ওরা বিপদজনক লোক। সেজন্যেই আমি আপনাকে কটেজ থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম।' বিষাদমাখা গভীর কালো চোখ দুটোতে একরাশ আকুলতা, আবেগঘন কণ্ঠে আসিফ বলল, 'আপনি আমার উপর রাগ করেননি তো? বোকার মত হঠাৎ করে আজেবাজে কি সব বলে বসলাম···আমাকে নিশ্চয়ই খুব খারাপ মনে হচ্ছে, তাই না?'

'মোটেই না।' মিষ্টি করে হাসল স্বাতী। 'আপনার মত এমন বিখ্যাত এবং জিনিয়াস একজন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, এটা তো আমারই সৌভাগ্য। তাছাড়া মানুষ হিসেবেও আপনি চমৎকার। আর বাকি গুণগুলো নাহয় উহ্যই থাক, শুনলে আবার গর্বে মাটিতে পা পড়বে না।'

অবাক হয়ে স্বাতীর দিকে তাকাল আসিফ। 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আমাকে···আপনার ভাল লেগেছে?'

'এত সহজ কথাটা বুঝতে এতদিন লাগল? আপনি কি ভেবেছেন সবসময় আমি যারতার সঙ্গে এভাবে ঘুরে বেড়াই? ভাল না লাগলে আপনার সঙ্গে

দ্বিতীয়বার কথা বলতাম?'

'ই-য়া-হু!' স্বাতীকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আসিফ। মেঘ কেটে গিয়ে সুপুরুষ চেহারায় একশো রামধনু হেসে উঠেছে। বেঞ্চ থেকে নেমে ধপ্ করে স্বাতীর পায়ের কাছে বসে পড়ল সে। 'তুমি সত্যি বলছ, স্বাতী? আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না!'

খোলা আকাশের নিচে নিজেকে সম্রাজ্ঞীর মত মনে হলো স্বাতীর। 'আপনি এখনও আমাকে...'

'আপনি নয়, তুমি,' মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিল আসিফ।

লাল হয়ে উঠল স্বাতী। একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা পরস্পরকে এখনও ভাল করে চিনি না...'

'আমি তোমার উপর কখনও জোর করব না, স্বাতী। তোমাকে কোন কথাও দিতে হবে না। শুধু আমাকে তোমার কাছাকাছি থাকতে দাও। তুমি পাশে থাকলে পৃথিবীটা বড় সুন্দর মনে হয়।'

পিছনে মাথা হেলিয়ে হেসে উঠল স্বাতী। বলল, 'বিজ্ঞানীরাও হিন্দি ফিলমের নায়কদের মত ডায়লগ ছাড়তে পারে!'

তৃষিতের মত চেয়ে রইল আসিফ। ঠিক মাথার উপরেই নবযৌবনা সূর্য, অথচ স্বাতীকে তার চেয়েও বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মাতাল হাওয়া এলোমেলো করে দিয়েছে ওর চিকচিকে লম্বা চুলের রাশি, রোদের আঁচে লালচে দেখাচ্ছে অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা। ক্লিওপেট্রা কি এর চেয়েও বেশি রূপসী ছিল? হেলেনের চোখে কেউ কি কখনও এমন মাদকতা দেখেছে?

লজ্জা পেয়ে স্বাতী মুখ ঘুরিয়ে নিতে আসিফের চমক ভাঙল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কেইমেন ব্র্যাকের কাছাকাছি চলে এসেছে নাটালি, খালি চোখেই তীরের বাড়িঘর-গাছগাছালি আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। যে তিনটে দ্বীপ নিয়ে কেইমেন দ্বীপপুঞ্জ গড়ে উঠেছে, কেইমেন ব্র্যাক তাদেরই একটা। ধীরে ধীরে নাটালির গতি কমে আসছে।

ইঞ্জিনরুম থেকে বেরিয়ে এল ড্যান। স্বাতীর উদ্দেশ্যে বলল, 'যন্ত্রপাতি সব নিচের ঘরে আছে, আপনি ওখানেই পোশাক বদলে নিতে পারেন।' কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল স্বাতী। কি ঘটে গেল এখনও ভাল করে বুঝে উঠতে পারেনি, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছে সে। যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেল সবকিছু।

স্বাতী যখন ডেকে উঠে এল, ওর পরনে তখন রাবারের তৈরি ওয়েট-স্যুট, গলা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সঙ্গে সেঁটে আছে। আসিফ ওর দিকে তাকিয়ে ভাবল, বিধাতা এই নারীকে নির্ঘাত ছুটির দিনে বানিয়েছেন। বয়ানসি-ভেস্ট হাতে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ড্যান, স্বাতী আসতেই পরিয়ে দিল। আসিফ ওয়েট-স্যুট পরেনি, ওর পরনে শুধু সুইমিঙ-ট্রাঙ্ক। একটু নড়াচড়া করলেই কিলবিল করে উঠছে শরীরের দৃঢ় পেশীবিন্যাস। রোমশ বুকের দিকে চেয়ে স্বাতীর দম বন্ধ হয়ে এল। আসিফ ওর হাতে ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ি পরিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে আসতে ঘাড় নেড়ে নিষেধ করল, 'আপনার হাতে আছে তো? ওতেই চলবে।'

'উঁহুঁ। আপনি নয়, তুমি,' হাসল আসিফ। 'সমুদ্রের কতটা নিচে নামার অভ্যেস আছে?'

'বেশি না। গতবছর একশো ফুটের কাছাকাছি নেমেছিলাম।'

'ঠিক আছে। অসুবিধা হলেই ইশারা করো।'

তীর থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে থেমে পড়ল নাটালি। দু'জন ক্রু মিলে ডাইভিঙ প্ল্যাটফর্মটা নিচে নামাতে শুরু করল। আসিফ আর স্বাতী প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়াতে ড্যান ওদের পিঠে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বেঁধে দিল। পায়ের ফ্লিপার আর মাথার হুড নিজেই পরে নিল স্বাতী। রেগুলেটর মাউথপিসটা দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিতে দিতে স্বাতীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে আসিফ বলল, 'বলতে ভুলে গেছি, তোমাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে।'

স্বাতী কিছু বলার আগেই সাগরে ঝাঁপ দিল আসিফ। মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে ওর পিছু নিল স্বাতী। পিঠে ভারি ট্যাঙ্ক নিয়ে জলের নিচে প্রথম কয়েক মুহূর্ত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। ধীরে ধীরে সামলে নিয়ে শরীরের ভার ছেড়ে দিল উষ্ণ স্রোতের তোড়ে, শরীরের স্বাভাবিক ভার ওকে টেনে নিয়ে চলল নিচের দিকে।

এই মুহূর্তের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। ওজন শূন্যতা আর শব্দহীন পরিবেশ এক অদ্ভুত ধরনের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, যেখানে জাগতিক চিন্তা ভাবনার কোন স্থান নেই। শরীরের প্রতিটা রোমকূপ দিয়ে শুধু উপভোগ করে যেতে হয় প্রকৃতির অপার রহস্যের মহিমা।

নিচে আসিফকে দেখতে পেল স্বাতী। এক হাতে আঁকড়ে ধরে আছে প্রবালের অসমান খাঁজ, অপেক্ষা করছে স্বাতীর জন্যে। ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে

বলে এই মুহূর্তে স্বাতীর নিজেকে বড় ভাগ্যবতী মনে হলো। যতই কাছে সরে আসতে থাকল, ততই অনুভূতিটা প্রবল হয়ে উঠল। বুড়ো আঙুল তুলে ইশারায় আসিফ জানতে চাইল সব ঠিকঠাক আছে কিনা। একইভাবে বুড়ো আঙুল দেখাল স্বাতী, সব ঠিক আছে। দুটো বিশাল গ্রুপার লেজ নাড়তে নাড়তে ওর গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। প্রবাল প্রাচীরের ফাঁকফোকরে লুকোচুরি খেলছে রঙবেরঙের ছোট ছোট মাছের ঝাঁক। আসিফকে অনুসরণ করে নিচে নামতে নামতে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল স্বাতী। পৃথিবীর বুকে এমন কোন জায়গা আছে, তা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারবে না। অদেখা স্বর্গের সঙ্গেই শুধু এর তুলনা করা যায়।

মাথার উপরের ফিরোজা-নীল জল নিচের দিকে গাঢ় হতে হতে কালচে-নীলে পরিণত হয়েছে। আসিফ আলগোছে ওর হাত টেনে নিয়ে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা একটা প্রবালের ঝোপে রাখল। কি আশ্চর্যরকম নরম! অথচ কি রুক্ষ আর কঠোর অবয়ব! বিস্ময় আর ধরে রাখতে পারছে না স্বাতী। আসিফ ওর ডেপ্‌থ্‌-গজের দিকে ইঙ্গিত করল, ওরা এখন পঞ্চাশ ফুট নিচে আছে। বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন জাতের গাছ-গাছালি, ব্যাঙের ছাতার মত দেখতে রঙিন গুল্ম, জীবন্ত প্রবাল আর স্পঞ্জে ঢাকা দেয়ালের গা বেয়ে নিচে নামতে থাকল ওরা। চারপাশে বাহারি মাছের ভিড়। ভীতু চিংড়ি মাছেরা উঁকি দিয়েই আবার লুকিয়ে পড়ছে পাথরের আড়ালে।

কেইমেন দ্বীপের প্রবাল প্রাচীরের কথা স্বাতী এতদিন শুধু শুনেই এসেছে, এর প্রকৃত সৌন্দর্য সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই ছিল না। সাগরতলে এর আগেও ক'বার নেমেছে, কিন্তু এর সঙ্গে আগের অভিজ্ঞতার কোন তুলনাই নেই। যতদূর চোখ যায় শুধু বর্ণালী প্রবালের ঝাড়। উজ্জ্বল হলুদ, লাল, কমলা আর বিভিন্ন ধরনের নীলের শেডে স্বপ্নপুরীর মত দেখাচ্ছে প্রকৃতির এই রহস্যময় রাজ্যপাট। নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুধু দেখে যেতে হয় রঙের এই অপার্থিব বিন্যাস, পিকাসোর ক্যানভাসও হার মানে এই বৈচিত্র্যের কাছে। এই ঐশ্বর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় তুচ্ছ মনে হলো স্বাতীর।

আসিফ ইশারা করতে চমক ভাঙল। আরও নিচে নামতে শুরু করল ওরা। আলো কমে আসছে, কিন্তু রঙের কমতি নেই। জলের আলোড়নে কেঁপে কেঁপে উঠছে ফুলের মত দেখতে অপূর্ব সব রঙিন সামুদ্রিক উদ্ভিদ। স্বাতীর আঙুলের ফাঁক দিয়ে তিরতির করে চলে গেল ডোরাকাটা একটা রিফ-ফিশ। ডেপ্‌থ্‌-গজের দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছে স্বাতী। একশো। একশো দশ। একশো বিশ ফুট

নামার পর চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করল। বুক ভরে অক্সিজেন টেনে নিল স্বাতী নাইট্রোজেনের প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্যে। কিন্তু একই সঙ্গে কানেও ব্যথা করতে শুরু করেছে। আসিফ সব সময়ই ওর দিকে লক্ষ রাখছিল। ও ঠিকই লক্ষ করেছে স্বাতীর নড়াচড়া ক্রমেই শ্লথ হয়ে আসছে। আসিফ উপরে যাবার জন্যে ইশারা করতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্বাতী।

'নাটালি'র কাছাকাছিই ভেসে উঠল ওরা। একজন ক্রু ওদের জন্যে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিল। বলতে গেলে স্বাতীকে সে একাই টেনে তুলল। সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল ড্যান। স্বাতীর শরীরে আটকানো যন্ত্রপাতি খুলে নিতে নিতে জানতে চাইল, 'কেমন দেখলেন?'

স্বাতীর তখন কথা বলার মত শক্তি নেই। আবছাভাবে শুধু মাথা নাড়ল, হাপরের মত নিঃশ্বাস বইছে।

'নিচের ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে নিন। আমি আপনার জন্যে গরম কফি বানাচ্ছি,' বলল ড্যান।

'খুব বেশি খারাপ লাগছে?' পিঠের অক্সিজেন ট্যাঙ্কটা খুলতে খুলতে উদ্বিগ্ন চোখে স্বাতীর দিকে চাইল আসিফ।

একটু হেসে মাথা নেড়ে ওকে আশ্বস্ত করল স্বাতী। তারপর অনেক কষ্টে সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে নিচের কেবিনে চলে এল। মনে হচ্ছে যেন শরীরের ওজন বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। দরজা বন্ধ করে কোন মতে ওয়েট স্যুটটা খুলে ফেলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। পরনে শুধু সুইম স্যুট।

পুরো দশ মিনিট শুয়ে রইল স্বাতী। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি, মাথাটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। যেখানে রেখে গিয়েছিল, জামাকাপড়গুলো ঠিক সেখানেই আছে। ছোট্ট বাথরুমটায় ঢুকে চট করে গোসল করে ফেলল, ভাল করে ধুয়ে ফেলল চুলের ফাঁকে লুকিয়ে থাকা কিচকিচে বালি। চুল আঁচড়ে পোশাক পরে ডেকে উঠে এল স্বাতী।

'এই যে আপনার কফি, মিস চৌধুরী,' এগিয়ে এল ড্যান।

'শুধু ধন্যবাদ দিলে আমার পাপ হবে, এই কফিটা না পেলে এই মুহূর্তে আমাকে পটল তোলার আয়োজনে লেগে পড়তে হত,' ড্যানের হাত থেকে কফির বিশাল মগটা নিতে নিতে হাসল স্বাতী। 'কিন্তু আপনার গুণধর বন্ধুটি কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে? আশেপাশে তো দেখতে পাচ্ছি না!'

'ওই শালার ভাই ইঞ্জিনরুমে ওর আদরের রোবটের কাছে আছে। মাঝে

মাঝে মনে হয় আমার চেয়ে রোবটটার সঙ্গেই ওর বেশি খাতির। জানেন, ওটার সঙ্গে আসিফ এমনভাবে কথা বলে যেন ওটা রক্তমাংসের মানুষ!'

'হ্যাঁ, দেখেছি। তা এই রোবটটার নাম কি?'

'হিউগো। ব্যাটাকে দেখতে চান?'

'অবশ্যই।' লাফিয়ে উঠল স্বাতী। প্রায় খালি কফির মগটা একটা শেলফে গুঁজে দিয়ে ড্যানের পিছু পিছু ইঞ্জিনরুমে চলে এল। ড্যান ফিরে গেল ওর ক্রুদের কাছে।

আসিফ মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে কমপিউটার-স্ক্রিনওয়ালা একটা ধাতব প্যানেলের সুইচ ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। স্বাতীকে দেখে সুন্দর করে হাসল।

'ড্যানের মুখে হিউগোর প্রশংসা শুনে পরিচয় করতে এলাম।'

'অবশ্যই, অবশ্যই।' খুশি হয়ে উঠে দাঁড়াল আসিফ। ধাতব প্যানেলটা দেখিয়ে বলল, 'এটা হলো কন্ট্রোল। হিউগো আছে ওই দরজার ওপাশে।' তালাবন্ধ একটা দরজার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'নাম যখন হিউগো, তখন ধারণা করা যায় ওর জীবনটা হিলডার চাইতে অনেক বেশি ঘটনাবহুল আর বৈচিত্র্যপূর্ণ,' ফোড়ন কাটল স্বাতী।

'আবার সেই বিতর্ক!' আসিফের হাসিহাসি মুখে মেঘ নেমে এল।

'আরে বাবা, ঠাট্টা করছি তো!'

'দুষ্টু মেয়ে কোথাকার!' হেসে ফেলে স্বাতীর চুল টেনে ধরল আসিফ।

'উহ্! লাগে তো!' চুল ছাড়িয়ে নিয়ে কৃত্রিম রোষে চোখ পাকাল স্বাতী। 'পাগল কোথাকার!'

'আমার লাইনে একটু পাগলাটে না হলে মান সম্মান থাকে না, বুঝলে? ওহ্, ভাল কথা, ড্যান হোটেলে খবর নিয়েছে। বেশ ক'টা রুম খালি আছে। তুমি কি ড্যানের বাড়িতে থাকতে চাও? তাহলে ওকে বলি ওর বউকে খবর দিক।'

এ ব্যাপারটা নিয়ে স্বাতী বেশ ভাবনা-চিন্তা করেছে। অপরিচিত কারও বাড়িতে হঠাৎ করে এভাবে হামলা করতে মন সায় দিচ্ছে না, তাছাড়া ড্যানের বউ মানুষ কেমন কে জানে! তারচেয়ে হোটেলেই ভাল, অন্তত নিজের মত করে থাকা যাবে। আসিফের প্রতি ওর পূর্ণ আস্থা আছে। তাছাড়া গত ক'দিন তো ওরা কটেজে পাশাপাশিই রাত কাটাচ্ছে, হোটেলেও সেভাবে থাকতে অসুবিধা কি? 'হোটেলেই থাকব আমি,' জানাল স্বাতী।

'ঠিক আছে, ড্যানকে তাহলে দুটো রুমের কথা বলে দিচ্ছি। বোট থেকেই

ও রিজার্ভেশন দিয়ে দেবে।' এগিয়ে গিয়ে সময় নিয়ে দরজার কমবিনেশন লক্‌টা খুলল আসিফ। দরজার পাল্লাটা খুলে ভেতরের আলো জ্বালিয়ে দিল। ঘরটা এতই ছোট যে ভেতরে পা দেবার জায়গা নেই।

'হিউগোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা দেখছি বেশ জোরদার,' 'তুমি' করে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে বলে সম্বোধনের ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছে স্বাতী।

'সাবধান থাকাই ভাল।' ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা রোবটটার দিকে ইঙ্গিত করল আসিফ, 'এই হলো হিউগো। ওর চোখের জায়গায় আছে ছোট্ট একটা স্টিরিও ক্যামেরা যা অনবরত কন্ট্রোলের স্ক্রিনে ছবি পাঠাতে থাকে। ওর হাত দুটো অ্যাডজাস্টেবল্, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে কোন নমুনা হাতে তুলে নিতে পারে। সমুদ্রের অনেকটা নিচে নেমে যেতে পারে হিউগো, যেখানে আজ পর্যন্ত কোন মানুষ যেতে পারেনি।'

হিউগোকে দেখতে দেখতে স্বাতী আর একবার অনুভব করল কতবড় গুণী একজন লোকের ভালবাসা পেয়েছে সে। হিলডার সঙ্গে হিউগোর চেহারার তেমন কোন মিল নেই। হিউগোর দুটো পা দেখা যাচ্ছে, যা হিলডার নেই। হিউগোর চেহারাও অনেক বেশি জটিল আর পরিশীলিত। 'হিউগোর কাজ কি?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল স্বাতী।

'অনেক কাজেই ওকে ব্যবহার করা যাবে। খাদ্যের উৎসের সন্ধানে জীববিজ্ঞানীরা হিউগোকে সাগরের গভীরে পাঠাতে পারবে। এছাড়াও তেল বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারের কাজে হিউগোর কোন জুড়ি নেই। মিসাইল বা সাবমেরিন গাইডেন্সের কাজেও ওকে ব্যবহার করা যাবে।' একটু থেমে যোগ করল, 'এই শেষের কাজটাতেই ওর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে।'

ধীরে ধীরে ওর গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে শুরু করেছে স্বাতী। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'যা মনে হচ্ছে, শুধু হিউগো নয়, আপনারও আলাদা নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে।'

'আবার "আপনি"!' চোখ পাকাল আসিফ। 'এরপরে আর একবার ভুল করলে কিন্তু পিট্টি খাবে।'

'ধ্যাত্তেরিকা! আর পারি না!' মাথা ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল স্বাতী। গুনে গুনে তিন বার বলল, 'তুমি তুমি তুমি। হলো তো?' এক ছুটে বেরিয়ে গেল স্বাতী।

# আট

কেইমেন ব্র্যাক মূল দ্বীপটার চেয়ে আকারে অনেক ছোট, কিন্তু ভারি ছিমছাম আর নির্জন। তুষারের মত শুভ্র বেলাভূমি মালার মত ঘিরে আছে সবুজ দ্বীপটাকে, অথৈ সাগরের বুকে ঠিক যেন একখণ্ড পান্না। আসিফের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে বোট থেকে নেমে এল স্বাতী। বালুবেলা পেরিয়ে গাছগাছালির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সরু একটা মেঠোপথে এসে পৌঁছুল ওরা।

'দশ মিনিট হাঁটলেই আমরা হোটেলে পৌঁছে যাব,' স্বাতীর উদ্দেশ্যে বলল আসিফ। দ্বীপের কেন্দ্রের দিকে নয়, ওরা সাগরের তীর ধরে হাঁটছে।

নারকেল গাছ ঘেরা হোটেলটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল স্বাতী। আইসক্রিমের মত মোলায়েম গোলাপী আর সাদা রঙ করা দোতলা কাঠামো, বারান্দায় কারুকাজ করা লোহার রেলিঙ। অনেকটা জমিদার বাড়ির মত। নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য আম গাছও চোখে পড়ল। সদর দরজার দু'দিকের দেয়াল ঢাকা পড়েছে রক্তলাল বোগেনভিলিয়ার ঝাড়ে।

'ইশ্! কি সুন্দর!'

স্বাতীকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখে খুশি হলো আসিফ। 'আমি জানতাম, জায়গাটা তোমার পছন্দ হবে।'

কাউন্টারে আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড বের করে স্বাতী নিজের ঘরের বিল মিটিয়ে দিল। আসিফ শুধু একটু হাসল, বাধা দিল না। ভাল লাগল স্বাতীর, অন্য দশজন পুরুষের সঙ্গে এখানেই ওর পার্থক্য।

দোতলায় পাশাপাশি দুটো ঘর দেয়া হলো ওদেরকে। চাবি দুটো এগিয়ে দিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন মহিলা, বললেন, 'প্রায় দুটো বাজে, পা চালিয়ে গেলে ডাইনিং হলটা হয়তো খোলা পাবেন।'

'খিদে পেয়েছে, তাই না?' করিডর ধরে ডাইনিং হলের দিকে হাঁটতে

হাঁটতে জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'হ্যাঁ, বেলা তো কম হলো না। তাছাড়া ডাইভিঙে গেলে এমনিতেই ভবের খিদে পায়।'

বিশাল ডাইনিং হলের একপাশে পুরু কাঁচের দেয়াল, ওপাশে ঝলমল করছে তরল রূপোর মত খোলা সাগর। টেরাকোটার মেঝের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টেবিলগুলোর ঢাকনার হালকা সবুজ রং চমৎকার মানিয়ে গেছে। দেয়ালের কোণে পিতলের টবে মৌসুমী ফুলের ঝাড়। সবগুলো টেবিলই প্রায় খালি, শুধু বৃদ্ধ এক দম্পতি কফির কাপ নিয়ে বসে আছে। কাঁচের দেয়ালের ধার ঘেঁষে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল ওরা। কাঁধ থেকে নামিয়ে পায়ের কাছে রাখল ব্যাগ দুটো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওয়েইটার এসে হাজির। কাউন্টার থেকে নিজেদের পছন্দমত খাবার বেছে নিয়ে আসতে হবে, ওয়েইটার শুধু পানীয়ের অর্ডার নেবে। আসিফ একটা বিয়ার আর স্বাতী একটা ডায়েট পেপসি চাইল।

ওয়েইটার চলে গেলে ওরা দু'জনে বুফে টেবিলের দিকে রওনা হলো। সুগন্ধে জিভে পানি চলে আসছে। রূপকথার গল্পের ভোজসভার দৃশ্যের মত থরেথরে সাজানো আছে কম করেও পঞ্চাশ রকমের খাবার-দাবার। স্বাতী প্লেট ভর্তি করে নিল মশলা দিয়ে ভাজা ভাত, মুরগির কারি আর ভাজা চিংড়ি। আসিফ নিয়েছে এক বাটি সব্জির স্যুপ, কয়েক রকমের ভাজা মাছ আর সেদ্ধ সব্জি।

প্রথম কয়েক মিনিট কেউ কোন কথা না বলে শুধু খেয়েই গেল। বেশ ক'দিন পরে ভাত খেতে পেয়ে স্বাতীর রসনা সিক্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে আমের চাটনিটা মুখে দিতে অমৃতের মত লাগল। 'অপূর্ব! এরপর যদি কখনও কেইমেনে আসি তাহলে এখানেই উঠব। মুরগিটা একদম আমাদের মত করে রান্না করেছে।'

'দ্বীপের বেশিরভাগ লোকই হিসপানিকবংশোদ্ভূত। হিসপানিকরান্নাবান্নার সঙ্গে ভারতীয় রান্নার অনেক মিল রয়েছে। তোমার মত ভেতো বাঙালীর জন্যে বেশ সুখবরই বটে!' টিপ্পনি কাটল আসিফ।

ওয়েইটার দু'জনের সামনে দুটো গ্লাস নামিয়ে রাখল।

সে চলে গেলে আসিফ খাওয়া থামিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'জানো, তোমার মত মেয়ে আজ পর্যন্ত আমার চোখে

পড়েনি।'

'কেন, আমার কি তিনটে হাত আছে? নাকি কপালে শিঙ গজিয়েছে?'

'তুমি নিজেও জানো না তুমি কে। এতগুলো বছর পরে তোমার দেখা পেলাম, ভাবলেই ভীষণ আফসোস হচ্ছে। সময়ের কি অর্থহীন অপচয়!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল আসিফ। 'মাঝে মাঝে ভয় হয়, ঘুম ভেঙে দেখব সবই স্বপ্ন। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, পৃথিবীর বুকে তোমার মত এমন একটা মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ এতদিন ধরে আমি তার কোন খবরই রাখিনি!'

'ব্যস্ ব্যস্, অনেক হয়েছে,' লাল হয়ে উঠেছে স্বাতী। সেটা ঢাকার জন্যে হালকা গলায় বলে উঠল, 'আর বেশি গ্যাস দিলে পৃথিবীর মাটি ছেড়ে আবার আকাশে উঠে যাব।'

'খুব দুষ্টুমি হচ্ছে, না?' না হেসে পারল না আসিফ।

খাওয়া শেষ করে দোতলায় গিয়ে নিজেদের ঘর খুঁজে নিল ওরা। ডাইভিঙের পর দু'জনেই ক্লান্ত। যে যার ঘরে গিয়ে কষে ঘুম দিল।

শেষ বিকেলে সম্পূর্ণ সতেজ শরীর আর মন নিয়ে স্বাতী বিছানা ছাড়ল। হাতমুখ ধুয়ে পোশাক বদলে পাটভাঙা এক সেট সালোয়ার কামিজ পরে নিল। মাথায় চিরুনী চালাতে চালাতে লাগোয়া ব্যালকনিতে আসতেই আসিফের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গোসল সেরে নিজের ঘরের ব্যালকনিতে চেয়ার পেতে বসে সমুদ্র দেখছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক আগেই ঘুম ভেঙেছে। স্বাতীকে দেখে হাত নাড়ল, উঁচু গলায় জানতে চাইল, 'বিচে হাঁটতে যাবে?'

'হ্যাঁ,' চেঁচিয়ে বলল স্বাতী, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।' দ্রুতহাতে চোখে কাজল আর ঠোঁটে হালকা করে একটু লিপস্টিক বুলিয়ে নিল। আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখটা দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

আসিফ করিডরেই ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রশংসার দৃষ্টিতে স্বাতীর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'স্যাণ্ডেল পরে গেলে কিন্তু পরে হাতে করে বয়ে বেড়াতে হবে।'

স্বাতী লক্ষ করল আসিফের পায়ে জুতো নেই। দরজা খুলে স্যাণ্ডেল জোড়া ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'আমি তৈরি।'

রোদ পুরোপুরি মরেনি, তবে তপ্ত বালু শীতল হতে শুরু করেছে। রৌদ্রস্নান-

পিয়াসীরা এখনও শুয়ে-বসে উপভোগ করছে দিনের শেষ উত্তাপটুকু। ভেজা বালুর উপর পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে সারি সারি ঢেউয়ের মিছিল। দিগন্তরেখার কাছাকাছি মাছ ধরা নৌকোগুলোকে ফুটকির মত দেখাচ্ছে।

'স্থানীয় লোকদের প্রধান জীবিকা কি?' জানতে চাইল স্বাতী।

'আজকাল ট্যুরিজমের উপরই বেঁচে আছে। তবে কিছুদিন আগে পর্যন্ত কাছিমের চাষই ছিল এদের প্রধান জীবিকা। এখানকার কাছিম আকারে যেমন বিশাল, খেতেও তেমনই সুস্বাদু।'

'তাহলে কাছিমের চাষ করা ছেড়ে দিল কেন এরা?'

'সাধে কি আর ছেড়েছে! ট্যুরিস্টরা এই কাছিমের সন্ধান পেয়ে বিশ্বব্যাপী এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে দিল। বিপুল হারে বাইরে রপ্তানী হতে শুরু করল এখানকার কাছিম, খুব শীঘ্রিই এদের সংখ্যা কমে এল। এখন গ্র্যাণ্ড কেইমেনের কয়েকটা কাছিমের ফার্ম ছাড়া দ্বীপের কোথাও এদেরকে দেখা যায় না। তবে এখনও কেইমেনের কাছিমের স্যুপের খ্যাতি আছে সারা দুনিয়ায়। চেখে দেখার ইচ্ছে থাকলে বলো, আজই আমার পরিচিত একটা রেস্টোরান্টে নিয়ে যাব।'

'ছি!' বাতাসে উড়তে থাকা চুলের রাশি সামলাতে সামলাতে নাক কুঁচকাল স্বাতী। 'তবে কাছিমের ফার্ম দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে, দু'জনে একসঙ্গেই যাব।'

স্নানার্থীদের ভিড় থেকে দূরে ঢেউয়ের কাছাকাছি এক খণ্ড পাথরে হেলান দিয়ে পাশাপাশি বসল ওরা।

লম্বা করে পা ছড়িয়ে দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্বাতী। 'আগে জানলে এখানেই রিজার্ভেশন করতাম।'

'কক্ষণও না,' আপত্তি জানাল আসিফ। 'তাহলে যে আমাদের পরিচয়ই হত না!' সাগরের বুকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ করেই বলে উঠল, 'সেই হিথরো থেকে তুমি আমার মগজের মধ্যে ঢুকে গিয়েছ। সারাপথ মন্ত্রমুগ্ধের মত তোমাকে দেখতে দেখতে এসেছি।'

'হিথরো থেকে!' বিস্ময়ে আরও বড় বড় হয়ে উঠেছে স্বাতীর পটলচেরা বিশাল চোখজোড়া। 'আমি তো ভেবেছি কেইমেন এয়ারপোর্টে ব্রিফকেস ফেলে দেবার আগে আমাকে তুমি লক্ষই করোনি।'

'স্টেডিয়াম ভর্তি লোকের মধ্যে লুকিয়ে থেকেও তুমি আমার চোখকে

ফাঁকি দিতে পারতে না। সত্যি করে বলো তো, বাংলাদেশের অগুন্তি প্রেমিক পুরুষের দৃষ্টি এড়িয়ে কেমন করে আজও তুমি কুমারী রয়ে গেছ? কারও প্রতি একটুও দয়া হয়নি?'

মাথা নিচু করে বালুর ভেতর আধডোবা বাদামী-সাদা ডোরাকাটা একটা ঝিনুক খুঁটতে লাগল স্বাতী। 'সেরকম কাউকে খুঁজে পাইনি।' তারপর চোখ তুলে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু এমন উপযুক্ত পাত্র হয়ে তুমিই বা কেন বিয়ে করোনি?'

হো হো করে হেসে উঠল আসিফ। 'আমাকে বিয়ে করবে কে? বিজ্ঞানী শুনলেই মেয়েরা ভাবে হাফ-পাগল। তার মধ্যে কিছুটা সত্যতাও আছে। মা চলে যাবার পর থেকে চাপাচাপি করারও কেউ নেই।'

বড়সড় একটা ঢেউ হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়তেই লাফিয়ে উঠে পিছু হটে গেল ওরা। কিন্তু ততক্ষণে দু'জনেই ভিজে একশা।

'তোমাকে একদম জলপরীর মত দেখাচ্ছে,' হাসতে হাসতে বলল আসিফ।

চুলের পানি ঝাড়তে ঝাড়তে চোখ পাকাল স্বাতী। 'জলপরীদের থাকে সোনালী চুল, নীল চোখ আর দুধে আলতা ত্বক। আমার সেসব কই?'

'তুমি তাহলে বাঙালী জলপরীদের দেখোনি। ওদের কালো চুলের ঢাল বেয়ে বয়ে যায় বর্ষার কূলছাপানো নদী, চোখের কালো তারায় রাত্রির রহস্য আর শ্যামল ত্বকে আছে শরতের স্নিগ্ধতা।'

'ভাল কথা মনে পড়েছে। আচ্ছা, বলো তো, সেদিন টিউলিপের তোড়াটা কার জন্যে কিনে এনেছিলে?'

'তুমি তা ভাল করেই জানো।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে কটেজ থেকে তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে।'

'তখনও আমার ধারণা ছিল বোধহয় তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকলেই তোমাকে ভুলে যেতে পারব। শহরে গিয়ে ফুলের দোকানে টিউলিপগুলো দেখেই তোমার পরনের হলুদ শাড়িটার কথা মনে পড়ে গেল। যখন হুঁশ ফিরল, দেখি টিউলিপের গোছাটা হাতে বাড়ির পথে রওনা হয়েছি।'

'কিন্তু আমাকে দিলে না যে!'

'সাহসে কুলায়নি। যদি ফিরিয়ে দাও!'

ভেজা কাপড়ে হোটেলের দিকে রওনা হলো ওরা। স্বাতীর বুকের ভেতরটা কানায় কানায় ভরে উঠেছে। সর্বাঙ্গে কিসের যেন অস্থিরতা, জ্বরের ঘোরের মত

অদ্ভুত এক ধরনের আচ্ছন্নতা অধিকার করে নিয়েছে শরীর-মন। কানে কানে কারা যেন বারবার বলে যাচ্ছে, 'এই তো ভালবাসা।'

মাত্র অল্প ক'টা দিনের ভেতর আসিফের এতটা কাছাকাছি চলে আসবে, স্বাতী কখনও তা স্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে কঠোর বাস্তবতার চোখ রাঙানী উপেক্ষা করে শুধু উপভোগ করে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে মায়াবী সময়টুকু। সম্ভাব্য সব আশঙ্কার কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে এই নতুন আবিষ্কারে। সব অবিশ্বাস সব অনিশ্চয়তা পড়ে থাক দূরে, এখন শুধু ভালবাসার সময়।

হোটেলের খোলা বারান্দায় সাগরের মুখোমুখি বসে আছে আসিফ আর স্বাতী, হাতে বরফ দেয়া লেমোনেডের গ্লাস। সন্ধ্যার বেগুনী আকাশ একাকার হয়ে গেছে সমাহিত সাগরে। নীড়ে ফিরে গেছে গাঙচিলেরা।

পিছন থেকে কেউ ডেকে উঠল, 'আসিফ।' চমকে উঠে পিছু ফিরতেই ওরা দেখল ড্যান মিটিমিটি হাসছে। 'বসতে পারি?'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' পাশের চেয়ারটা এগিয়ে দিল স্বাতী।

ওয়েইটারকে একটা রাম-পাঞ্চ দিতে বলে বসে পড়ল ড্যান। এ হোটেলের রাম-পাঞ্চের বেশ সুনাম আছে। রামের সঙ্গে লেবুর রস, চিনি আর নাটমেগ মিশিয়ে তৈরি করা হয় ড্রিঙ্কটা।

স্বাতীর মনে পড়ল ড্যানের বিকেলে মাছ ধরতে যাবার কথা ছিল। 'ক'টা মাছ ধরলেন?'

'একটাও না। তবে নাটালি যা সুন্দর নীল একটা মার্লিন ধরেছে, অত বড় মাছ আমিও বহুদিন ধরিনি।'

'হিউগোকে ঠিকভাবে নামিয়ে দিয়েছ তো?' জানতে চাইল আসিফ।

'যেখানে বলেছিলে ঠিক সেখানে নামিয়ে দিয়েছি। ব্যাটাকে ঝাড়ি দিয়ে বলেছি ঠিকমত কাজ না করলে লেন্স ভেঙে দেব।'

'একা একা গভীর সাগরে যদি বিপদে পড়ে?' উৎকণ্ঠিত হলো স্বাতী।

'ড্যানের দু'জন ক্রু চব্বিশ ঘণ্টা মনিটরের সামনে বসে আছে, হিউগোর প্রতিটা নড়াচড়া লক্ষ করছে। তাই সেদিক থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই,' ব্যাখ্যা করল আসিফ।

ওয়েইটারের আনা গ্লাসে চুমুক দিল ড্যান। 'চিন্তার কোন কারণ নেই,

হিউগো ভালই থাকবে।' স্বাতীর দিকে ফিরে বলল, 'কেইমেন গ্র্যাণ্ডে ফেরার আগে অবশ্যই একবার আমার বাড়িতে বেড়িয়ে যাবেন, নাটালি ব্লিশেষ করে বলে দিয়েছে।'

গল্পে গল্পে গড়িয়ে গেল সময়। বাতাসে পাকা ফল আর মৌসুমী ফুলের সুবাস। সুসজ্জিত ওয়েইটার বরফে ঢাকা কাটা ফল আর সেদ্ধ চিংড়ির বাটি হাতে টেবিলে টেবিলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লুকানো স্পীকারে ক্যালিপ্‌সো মিউজিকের মিষ্টি সুরেলা আবহ।

একসময় ড্যান আর আসিফ কাজের কথায় মগ্ন হয়ে পড়লে ভাবনার জগতে হারিয়ে গেল স্বাতী। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের পেশার ব্যাপারটা আসিফের কাছে এখনও গোপন রেখেছে সে। কেন, সে সম্বন্ধে নিজেরই স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। পরিচয় হবার আগে আসিফের উপর সাংবাদিকসুলভ গুপ্তচরবৃত্তি করার পরিকল্পনা করেছিল সে, সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু আসিফকে কি তা বুঝিয়ে বলা যাবে? জানতে পেলে আসিফ কি আর ওকে বিশ্বাস করতে পারবে? সময় যত গড়িয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা ততই জটিল হয়ে উঠছে। স্বাতী ঠিক করল, এখানকার ঝামেলা কেটে গেলে ঢাকায় ফিরেই আসিফকে সব খুলে বলবে। তখন আর অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসবে না। তার আগেই আসিফ জেনে যাবে স্বাতী পত্রিকার হয়ে ওর পিছনে গুপ্তচরগিরি করছে না। প্রথম থেকেই ওকে ব্যাপারটা না জানানো ভুল হয়ে গেছে।

চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল ড্যান, বলল, 'বাড়ি যাবার পথে একবার বোটে থেমে হিউগোর সিগন্যাল চেক করে যাব।'

'দরকার হলেই আমাকে এখানে ফোন কোরো। আপাতত বাইরে কোথাও যাচ্ছি না,' জানাল আসিফ।

একটু ইতস্তত করে আসিফের কাঁধে চাপড় দিল ড্যান। 'কোন চিন্তা নেই, আমি সবদিকে নজর রাখছি।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল ড্যান।

## নয়

ভাজা বাদামের কুচি ছড়ানো মাখনে সেদ্ধ করা গোলাপী স্যামন মাছ দিয়ে তৃপ্তিসহকারে ডিনার সারল আসিফ আর স্বাতী। ডাইনিং হলে তিল ধারণের জায়গা নেই। ঘরের ঠিক মাঝখানে স্টেজে স্থানীয় ব্যাণ্ডগ্রুপ অতিথিদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত, সুরেলা স্প্যানিশ সঙ্গীতের মূর্ছনা রক্তে দোলা জাগায়। হোটেলের মালিক মধ্যবয়স্কা এক ভদ্রমহিলা টেবিলে টেবিলে ঘুরে অতিথিদের খবরাখবর নিচ্ছেন।

হুইপ্‌ড্ ক্রিমে ঢাকা সুস্বাদু কিউই লাইম-পাই শেষ করে দু'জনে দু'কাপ এসপ্রেসো কফির অর্ডার দিল।

'বিদেশে এলে আমি প্রাণভরে খাই,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে স্বাতী বলল, 'বিশেষ করে মিষ্টি জিনিসগুলো এত ভাল লাগে! কিউই পাইটা কি চমৎকার ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ,' হাসল আসিফ। 'কিউই খেতে অনেকটা আমের মত, আমারও খুব পছন্দ। আমাদের দেশের কথা চিন্তা করো, দু'বেলা পেটে ভাতই জোটে না, আবার ফলমূল!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্বাতী। 'শুধু আমাদের দেশের কথা বলছ কেন, পৃথিবীর সব দেশেই গরীব মানুষের অবস্থা একই রকম। নিউ ইয়র্কের পাতাল-ট্রেনে যেসব পঙ্গু ভিক্ষুকদের দেখা যায়, আমাদের নিউমার্কেট ওভার ব্রিজের ভিক্ষুকদের চেয়ে ওদের অবস্থা কি ভিন্ন? অথচ খবরের কাগজে আমরা তো নিউ ইয়র্ক, লসএনজেলেস বা শিকাগোর লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুক আর গৃহহীনদের ছবি দেখতে পাই না! পৃথিবীটা বড় জঘন্য একটা জায়গা, যেখানে মানুষ শুধু রাজনীতির হাতের পুতুল। আর আমরা, সুবিধাবাদী শ্রেণীর মানুষেরা, চোখে ঠুলি এঁটে অজ্ঞ সেজে থাকি।'

'মিস্টার মাহমুদ,' দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল ওদের ওয়েইটার, 'লবিতে আপনার ফোন এসেছে।'

'মনে হয় ড্যান,' উঠে দাঁড়াল আসিফ। 'তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুণি আসছি।' চলে গেল আসিফ।

কফি শেষ করে মন দিয়ে গান শুনতে লাগল স্বাতী। হঠাৎ লক্ষ করল উল্টোদিকের টেবিলে বসা এক লোক ওর সারা শরীরে অশ্লীল দৃষ্টি বুলাচ্ছে, ঠোঁটের কোণে অর্থপূর্ণ হাসি। পিত্তি জ্বলে গেল, মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল স্বাতী। কিন্তু লোকটা যখন চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা ওর সামনে এসে দাঁড়াল, তখন আর এড়ানো গেল না।

'বসতে পারি?' অশ্লীল ভঙ্গিতে মিটিমিটি হাসছে লোকটা। পরনে ছাইরঙা দামী স্যুট, প্রিন্টেড সিল্ক টাই। চেহারা দেখে জাতীয়তা বোঝা মুশকিল, যতদূর মনে হয় স্থানীয় লোক। সবার আগে দৃষ্টি কেড়ে নেয় তুষারের মত শাদা এক মাথা লম্বা চুল, অথচ লোকটার বয়স চল্লিশ হবে কিনা সন্দেহ।

'না,' শক্ত গলায় বলল স্বাতী। 'অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলি না আমি।'

'আহা, রাগ করছেন কেন?' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল লোকটা, স্বাতীর গা ঘিনঘিন করে উঠল। 'আমার কোন বদ মতলব নেই, আপনার ভালর জন্যেই দুটো কথা বলতে এলাম।'

'এক্ষুণি এখান থেকে চলে না গেলে সিকিউরিটি ডাকব!'

তেলতেলে হাসিটা মুছে গিয়ে চেহারার ভাঁজে ভাঁজে নিষ্ঠুরতা ঝিলিক দিয়ে উঠেছে, টেবিলে দুহাত রেখে সামনে ঝুঁকল লোকটা। 'কেইমেন দ্বীপ ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি পারেন দেশে ফিরে যান। লাল গাড়িটার বাম্পার আর সাইকেলটার কি অবস্থা হয়েছিল মনে আছে তো?'

শিউরে উঠল স্বাতী, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ পেতে দিল না। প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে।

স্বাতীর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা, বলল, 'কথা না শুনলে এর পরের বার কিন্তু আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটবে।' পিছু ফিরে দরজার দিকে রওনা হলো সে।

ঠিক দরজার সামনে একজন ওয়েইটার লোকটার পথ রোধ করে দাঁড়াল, গম্ভীর মুখে বলল, 'আপনার রুম নাম্বারটা যেন কত? বিলটা রুমেই পাঠিয়ে

দেব।'

'আমি এই হোটেলে উঠিনি।' পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে ওয়েইটারের হাতে গুঁজে দিল সে। 'আশা করি এতেই হয়ে যাবে। আসি তাহলে? আমার আবার একটু তাড়া আছে।'

'কিন্তু এ তো অনেক টাকা,' অবাক হয়ে বলে উঠল ওয়েইটার। 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুণি টাকা ভাঙিয়ে আনছি।'

'না না, ওটা তোমার জন্যেই,' হেসে এক হাতে ওয়েইটারকে ঠেলে বেরিয়ে গেল সাদাচুলো লোকটা।

ডাইনিং হলে ভিড় ছিল বলে দরজার কাছের একটা টেবিলে বসতে হয়েছিল আসিফ আর স্বাতীকে, ফলে ওদের কথোপকথনের পুরোটাই পরিষ্কার শুনতে পেল স্বাতী। লোকটা বেরিয়ে যেতেই এক দৌড়ে ওয়েইটারের সামনে এসে দাঁড়াল সে। প্রশ্ন করল, 'ওই লোকটা কে? নাম জানা আছে?'

তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল ওয়েইটারের মুখে, 'জানা থাকলেও কিছুতেই বলতাম না। আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে একসঙ্গে এত টিপ্‌স্ দেয়নি।'

ওয়েইটারের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লবিতে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক খুঁজেও লোকটাকে কোথাও দেখতে পেল না স্বাতী। কে এই লোক? কেনই বা এমন উদ্ভট সব কথাবার্তা বলে গেল? কালো গাড়িটার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? ঝড়ের বেগে স্বাতীর মাথার ভেতর চিন্তা চলছে।

আসিফের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল ওর ঘরের রাতের অতিথিদের সঙ্গে কালো গাড়িটার সম্পর্ক আছে। কিন্তু এখন তাতে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। প্রথমত, আসিফের সঙ্গেই যদি ওদের লেনদেন, তাহলে ওরা স্বাতীর পিছনে লাগবে কেন? দ্বিতীয়ত, কালো গাড়িটা যখন ওর গাড়িকে ধাক্কা মারে, তখন তো আসিফের সঙ্গে ওর ভাল করে পরিচয়ই হয়নি। তাছাড়া লোকটা স্বাতীকে একা পাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওদের পাশের টেবিলেই বসেছিল সে, আসিফ নিশ্চয়ই তাকে দেখেছে। পরিচিত কেউ হলে নিশ্চয়ই আসিফ লোকটার সঙ্গে কথা বলত। যতদূর মনে হচ্ছে আসিফ নয়, ওদের লক্ষ্যবস্তু স্বাতী।

কিন্তু কেন? স্বাতী ওদের কি ক্ষতি করেছে?

বিদ্যুৎচমকের মত ওর মনে পড়ে গেল, ঢাকায় ওর শেষ কাজ ছিল বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য চোরাচালানের উপর একটা রিপোর্ট তৈরি করা। ঢাকার উঁচু সমাজের ক'জন রুইকাৎলার সঙ্গে চোরাচালান-চক্রের সম্পর্ক আবিষ্কার

করে ফেলার পরেই হেলালউদ্দীন খানের সঙ্গে স্বাতীর গ্যাঞ্জাম বাধে। যার ফলশ্রুতিতে এক মাসের ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছিল সে। সে ব্যাপারটার সঙ্গে গত ক'দিনের ঘটনাবলীর কোন সম্পর্ক নেই তো? থাইল্যাণ্ডের শক্তিশালী এক চোরাচালান-চক্রই ইদানীং বাংলাদেশে তৎপর হয়ে উঠেছে স্থানীয় রুইকাৎলাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এদের মুখোশ খুলে দেয়াই ছিল স্বাতীর মূল উদ্দেশ্য। বেশ কিছুদূর এগিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু কিছু বেনামী হুমকির কারণে শেষ মুহূর্তে হেলালউদ্দীন খান বেঁকে বসলেন। মাদক-ব্যবসায়ীরা কি ঢাকা থেকে স্বাতীকে অনুসরণ করে কেইমেনে এসেছে? কালো গাড়ির নাক-বোঁচা আরোহীরা থাই হতে পারে, তাহলেই দুইয়ে-দুইয়ে চার মিলে যায়। এই লোকটাকে হয়তো ওরাই পাঠিয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে ঘটনাটা আসিফের কাছে চেপে যাওয়াই ভাল।

চোখ তুলেই আসিফকে এগিয়ে আসতে দেখে চমকে গেল স্বাতী।

'কি ব্যাপার, তুমি লবিতে দাঁড়িয়ে আছ?' একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল আসিফ।

'আমি ভাবছিলাম,' ঢোক গিলল স্বাতী, 'তোমার এত দেরি হচ্ছে কেন।'

'ড্যানই ফোন করেছিল। হিউগোর পাঠানো কয়েকটা সিগন্যাল বুঝিয়ে দিতে হলো। তোমার কফি শেষ?'

'হ্যাঁ,' একটু ইতস্তত করে স্বাতী বলল, 'আমি ঘরে যাচ্ছি, খুব মাথা ধরেছে।'

'তাহলে আর দেরি কোরো না, ঘরে ফিরেই শুয়ে পড়ো। সকালে দেখা হবে।' একদৃষ্টে আসিফ চেয়ে রইল স্বাতীর অপসৃয়মান দেহের দিকে। স্বাতী জানে না আসিফ ওকে অপরিচিত এক লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। লবিতে অনেকগুলো ফোন দেখে বিভ্রান্ত হয়ে ওয়েইটারের খোঁজে আবার ডাইনিং হলে ফিরে গিয়েছিল আসিফ কোন লাইনে ওর ফোন এসেছে তা জানার জন্যে। ডাইনিং হলে ঢুকেই এক লোককে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে স্বাতীর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। আড়িপাতা আসিফের স্বভাব নয়, নিজের কাজে ফিরে গিয়েছিল সে। কিন্তু সেই থেকে প্রশ্নটা কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে—কে ওই লোক? স্বাতীর পরিচিত কোন লোক, হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেছে? কিন্তু তাহলে স্বাতী কিছু বলল না কেন? আবছা একটা সন্দেহ মনের ভেতর ক্যান্সারের মত বেড়ে উঠছে—স্বাতী কি সত্যিই শুধু বেড়াতে এসেছে; নাকি ওর অন্য কোন উদ্দেশ্য

রয়েছে? স্বাতী ওদের লোক নয় তো? তথ্য সংগ্রহের জন্যে স্বাতীকে ওর পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে ওরা? বিচিত্র কি!

ঈর্ষা আর রাগে নীল হয়ে উঠল আসিফ।

রাতে ভাল ঘুম হয়নি। সকালে বিছানা ছেড়েই গোসল সেরে নিল স্বাতী। বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখল আসিফের ঘরের দরজা বন্ধ। আসিফ এখনও ঘুমাচ্ছে। নাস্তা করার জন্যে টেরাসে চলে এল স্বাতী। প্লেট ভর্তি করে নিল কাটা আম, কমলা আর কিউইর টুকরো। সঙ্গে চা।

নাস্তা শেষ করে রিসেপশনে এল স্বাতী। হোটেলের মালিক ভদ্রমহিলা বসে আছেন ডেস্কে।

'আচ্ছা, এই হোটেলে কি সবসময়ই বাইরের লোকজন খেতে আসে?' জানতে চাইল স্বাতী।

'আশেপাশে যারা থাকে, তারা মাঝেমধ্যে আসে। সবাই আমাদের চেনা লোক। কেন জানতে চাইছেন?'

'গতকাল রাতে এক লোক খেতে এসেছিল, হালকা বাদামী স্যুট...সাদা চুল...'

'হ্যাঁ, বিলের টাকা নগদে মিটিয়েছে।'

'লোকটাকে আপনি চেনেন?'

'না, গতকালের আগে কখনও দেখিনি। ওয়েইটারকে মোটা বকশিশ দিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে। আপনি আপনার নাম আর রুম নাম্বার রেখে যান। ভদ্রলোক যদি আবার কখনও আসেন, তাহলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলব।'

'ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না।' মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাগরতীরে চলে এল। সকালের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে ধীরে ধীরে শরীরের অবসাদ কেটে যেতে শুরু করেছে।

সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি স্বাতী। দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়। লোকটা কেন এভাবে ওকে শাসিয়ে গেল? যত চিন্তা করছে ততই জটিল মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। এখন মনে হচ্ছে ঢাকার সঙ্গে এর কোন যোগ থাকতে পারে না। কারণ ওরা চাইছে স্বাতী ঢাকায় ফিরে যাক। অথচ স্বাতী ঢাকায় থাকলে ওদেরই অসুবিধা। ও যতদিন দেশের বাইরে ছুটি

কাটাচ্ছে ততদিন তো ওদের নিশ্চিন্ত থাকার কথা! তাহলে এই লোকগুলো কে?

এমনও তো হতে পারে কালো গাড়ির আরোহীরা কোন বেআইনী কাজে ব্যস্ত আছে, সেজন্যেই দুর্ঘটনার পর পুলিশ ডাকার ব্যাপারে নারাজ ছিল। কিন্তু স্বাতী যখন সত্যিই পুলিশে রিপোর্ট করল, তখন ওরা ভয় পেয়ে গেল। না জেনেই হয়তো স্বাতী সাপের লেজে পা দিয়ে বসেছে। পুলিশি তৎপরতার কারণে ওরা অসুবিধায় পড়ে গেছে, সেজন্যেই স্বাতীকে দ্বীপ থেকে তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগতভাবে স্বাতীর উপর ওদের কোন আক্রোশ নেই, ঘটনাচক্রেই পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠেছে তারা।

হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আর তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে গতরাতের ঘটনাটা আসিফকে না জানানো ভুল হয়ে গেছে। অবশ্য হুমকির ব্যাপারে স্বাতীর দুশ্চিন্তা হচ্ছে না। চাকরি জীবনে বহুবার এধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়েছে সে। ও ভালভাবেই জানে সত্যিই কারও ক্ষতি করার ইচ্ছে থাকলে আগে থেকে কেউ এভাবে ধমকি দেয় না। এসবই ফাঁকা আওয়াজ। তবে আসিফকে জানালে সে হয়তো লোকটার পরিচয় বের করে ফেলতে পারত। হাজার হোক কেইমেন দ্বীপ ওর চেনা জায়গা।

ফিরতি পথে হাঁটতে হাঁটতে স্বাতী সিদ্ধান্ত নিল, আসিফকে গতরাতের ঘটনাটা জানাতে হবে।

## দশ

লবিতেই আসিফের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। স্বাতীকে দেখে এগিয়ে এল সে। 'ঘুম থেকে উঠেছ কখন? ডেস্কের মহিলা বললেন বাইরে হাঁটতে গেছ।'

'হ্যাঁ, সাতটার আগেই উঠে পড়েছি। কি আর করব, তাই বীচে হাঁটছিলাম। কি সুন্দর জায়গাটা, তাই না?'

'আমার ইচ্ছে আছে এখানে একটা বাড়ি কিনব,' বলল আসিফ।

'বিদেশীরা ইচ্ছে করলেই এখানে সম্পত্তি কিনতে পারে? আইনগত কোন বিধিনিষেধ নেই?'

'না, এরা বড় সহজ সরল মানুষ। প্রকৃতিগত ভাবেই অতিথিপরায়ণ।'

সিঁড়ি বেয়ে দোতলার টেরাসে উঠে এল ওরা। স্বাতী নাস্তা করেছে শুনে নিজের জন্যে প্লেটে প্যানকেক তুলে নিল আসিফ, মেপ্‌ল্ সিরাপ ঢালতে ঢালতে বলল, 'আমার সঙ্গে এক কাপ কফি অন্তত খাও।'

হেসে দু'জনের জন্যে দু'কাপ কফি ঢালল স্বাতী। খোলা টেরাসে পাতা প্লাস্টিকের সাদা চেয়ারে এসে বসল, বিশাল একটা ছাতা ছায়া দিচ্ছে মাথার উপর। মোলায়েম ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

'আচ্ছা, সবসময় এমন রোদ ঝলমল করছে, অথচ সেরকম গরম লাগে না কেন, বলো তো?' অন্যমনস্ক ভাবে কফির কাপে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করল স্বাতী।

'এই দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে সব সময় ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায় কোনরকম বিরতি ছাড়া। এটাকে বলে "ট্রেড উইন্‌ড্‌স্," বাণিজ্য বায়ু। আমি হলে নাম দিতাম "পুবালী বায়ু," কারণ বাতাসটা সবসময় পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে বইছে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল স্বাতী। তারপর মেঝেতে চোখ রেখে ধীরে ধীরে বলল, 'গতরাতে ডাইনিং হলে একটা লোককে দেখেছিলে? মাথায় সাদা চুল...'

ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল আসিফ, শক্ত হয়ে উঠেছে ঠোঁটের দু'কোণ। 'উল্টোদিকের টেবিলে বসে যে তোমাকে গিলে খাচ্ছিল?'

অবাক হলো স্বাতী। 'আমি তো ভেবেছি তুমি লক্ষই করোনি।'

'লক্ষ না করে উপায় ছিল? ইচ্ছে হচ্ছিল এক ঘুষিতে ব্যাটার দাঁত ক'টা ফেলে দেই।' স্বাতীর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে ছুরি-কাঁটার সাহায্যে প্যানকেক কাটছে আসিফ।

'তুমি যখন ফোন ধরতে উঠে গেলে, লোকটা আমাদের টেবিলে এসেছিল।'

'জানি।' আসিফের সব মনোযোগ মেপ্‌ল্ সিরাপে ভিজানো প্যানকেকে।

বিস্ময়ে স্বাতীর চোখ কপালে উঠে গেছে, ঢোক গিলে কোনমতে বলল, 'জানো! কেমন করে জানো?'

'আমি ওকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। কোন লাইনে ফোন এসেছে জানার জন্যে ওয়েইটারের খোঁজে আবার ফিরে আসতে হয়েছিল, তখনই দেখলাম। স্বাতী, লোকটা কি তোমার পরিচিত?' আসিফের চোখে

সন্দেহ আর কষ্ট।

অনুশোচনায় কুঁকড়ে গেল স্বাতী। অপরাধীর মত বিপন্ন গলায় বলল, 'ওকে আমি জীবনেও কখনও দেখিনি, চেনা তো দূরের কথা।'

'তাহলে তার সাথে কথা বললে কেন? আর আমাকেই বা কেন কিছু বললে না?'

'আমি ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে কথা বলিনি, তুমি জানো। অশ্লীল ভাবভঙ্গি করছিল, তুমি রেগে যাবে বলেই তোমাকে বলিনি,' মিথ্যে বলতে গিয়ে স্বাতীর কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে গেল।

'খুন করব আমি ব্যাটাকে!' রাগে ফেটে পড়ল আসিফ, উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আস্তিন ধরে টেনে ওকে বসিয়ে দিল স্বাতী। 'মাথা গরম করে লাভ নেই। লোকটা এই হোটেলের গেস্ট নয়। হোটেলের মালিককে জিজ্ঞেস করেছি, ওরা চেনে না।'

'ড্যানকে লাগিয়ে দিলেই পরিচয় বের করে ফেলবে। লোকটার চেহারাটাই এমন, একবার দেখলে কেউ সহজে ভুলবে না।'

একটু ইতস্তত করে স্বাতী বলল, 'তোমাকে এখনও পুরো ঘটনাটা বলা হয়নি।' আসিফের প্রশ্নবোধক চোখে চোখ রেখে ম্লান হাসল। 'লোকটা আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছে।' ঘটনাটা খুলে বলল স্বাতী।

শুনতে শুনতে আসিফের উজ্জ্বল শ্যামলা মুখ লাল হয়ে উঠল। 'তাহলে তোমার সন্দেহই ঠিক, দুর্ঘটনা দুটোর মধ্যে সম্পর্ক আছে।' কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, 'এক্ষুণি রওনা হলে গ্র্যাণ্ড কেইমেনের ফ্লাইটটা ধরতে পারবে। আমি ফোনে ঢাকার ফ্লাইটে তোমার রিজার্ভেশন দিয়ে দিচ্ছি। রিচার্ড পামারকে ফোনে বলে দিচ্ছি তোমার মালপত্র গুছিয়ে রাখতে। আজই তুমি ঢাকায় ফিরে যাচ্ছ।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' মুখিয়ে উঠল স্বাতী। 'কে না কে দুটো কথা বলল আর আমি লেজ তুলে পালাব? কেন? পয়সা খরচ করে এখানে বেড়াতে আসিনি আমি? নিজের ব্যাপারে সবধরনের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আমার আছে। আমার যখন ইচ্ছে হবে তখনই দেশে ফিরব আমি।'

'আশ্চর্য! তোমার একটুও ভয় করছে না?'

'কাকে ভয় করব? দু'একটা গুণ্ডা-বদমাশকে?'

'তোমাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। তোমার সঙ্গে কথা বললে অবলা বাঙালী নারীর কথা ভুলে যেতে হয়।'

'হতাশ করার জন্যে সত্যিই খুব দুঃখিত,' শক্তমুখে বলল স্বাতী, 'কিন্তু এ মুহূর্তে লোকটার পরিচয় জানাটা খুব দরকার। তোমার কি মনে হয়, লোকটা কে হতে পারে?'

'কেমন করে বলি? কখনও তো দেখিনি।'

'আমিও চিনি না, তুমিও চেনো না—তাহলে সে কেন আমাকে দ্বীপ থেকে তাড়াবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে?'

'মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে তোমার কোন থিওরি আছে।'

'হ্যাঁ। আমার যতদূর মনে হয় এরা স্মাগলিং বা অন্য কোন ধরনের অপরাধ-চক্রের সঙ্গে জড়িত। তা না হলে দুর্ঘটনার পর আমি পুলিশ ডাকতে চাইলে ওরা কেন পালিয়ে যাবে? পুলিশ ওদের খোঁজাখুঁজি করছে বলে আমাকে তাড়াতে চাইছে। ভাবছে আমি না থাকলে পুলিশও ভুলে যাবে ব্যাপারটা।'

মাথা ঝাঁকাল আসিফ। 'হতে পারে। কিন্তু ওরা তোমার ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছে, তোমার ভয় লাগছে না?'

'না।' হাসল স্বাতী। 'ধরো, তুমি যদি কাউকে শায়েস্তা করতে চাও তাহলে কি করবে? আগেভাগে সাবধান করার জন্যে হুমকি দেবে, নাকি সোজা নাকের উপর ঘুষি বসিয়ে দেবে?'

'বুঝতে পারছি। তুমি বলতে চাইছ তোমার ক্ষতি করার ইচ্ছে থাকলে হুমকি দিয়ে ওরা সময় নষ্ট করত না।'

কফি শেষ করে নিচে নেমে এল ওরা। লবিতে দু'একটা সাজানো দোকান আছে, টুকিটাকি কেনাকাটার জন্যে তাদেরই একটাতে ঢুকল স্বাতী। আসিফ রওনা হলো টেলিফোন বুদের উদ্দেশে।

এ নারীর রহস্য এক জীবনে উন্মোচিত হবার নয়—নিজের মনেই তিক্ত হাসল আসিফ। অন্য যে-কোন মেয়ে হলে এ পরিস্থিতিতে ফিট লেগে যেত, অথচ স্বাতী তিলমাত্র ভয়ও পায়নি। স্বাতী যাই মনে করুক, আসিফের সন্দেহ হচ্ছে এটা সেই রাতের অতিথিদেরই কাজ, যারা দেশ থেকে ওর পিছু ধাওয়া করে আসছে। এখানেও সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখছে, স্বাতীর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা ওদের চোখ এড়ায়নি। স্বাতীকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য পরোক্ষে আসিফকে সাবধান করা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই! স্বাতীকে নয়, ওরা আসলে আসিফকেই ভয়

দেখাবার চেষ্টা করছে। ওরা বুঝে গেছে স্বাতীই আসিফের একমাত্র দুর্বলতা। তারমানে এখন থেকে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। বিশেষ করে স্বাতীকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করা যাবে না। এখন একমাত্র আশা, কোনভাবে যদি ওকে দেশে ফিরতে রাজি করানো যায়। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকতে স্বাতীর কোনরকম ক্ষতি হতে দেয়া যাবে না।

ব্যুটিক থেকে কেনাকাটা সেরে বেরুবার মুখে জানালায় সাজিয়ে রাখা একটা পোশাক স্বাতীর দৃষ্টি কেড়ে নিল। সাদা সিল্কের স্কার্ট, সঙ্গে শ্যাওলা সবুজ আর টম্যাটো-রঙ স্ট্রাইপওয়ালা একটা ব্লাউজ। ট্রায়াল-রুমে গিয়ে পরে দেখল চমৎকার ফিটিং। দাম মিটিয়ে কাগজের প্যাকেট হাতে বেরিয়ে আসতেই আসিফের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

'অ্যাত্তো কি কিনলে?' স্বাতীর হাতের বিশাল প্যাকেটটা দেখে কৃত্রিম বিস্ময়ে আঁৎকে ওঠার ভান করল আসিফ।

'একগাদা সেফটিপিন, একটা সানগ্লাস আর এক সেট ড্রেস। সঙ্গে আনা পোশাকগুলো সব ময়লা হয়ে গেছে, তাই এটা পছন্দ হতে কিনেই ফেললাম।' কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বলল স্বাতী। 'তা তোমার ফোনের কাজ শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, ড্যান বলল হিউগো ঠিকভাবেই কাজ করে যাচ্ছে, সিগন্যালে কোন ঘাপলা নেই। আর হ্যাঁ, নাটালি আজ সন্ধ্যায় আমাদের দু'জনকে দাওয়াত করেছে। আমি বলেছি তোমার সঙ্গে আলোচনা করে পরে টেলিফোনে জানাব আমরা যাব কিনা।'

খুশি হলো স্বাতী। 'ভালই হলো, বেড়াবার একটা জায়গা পাওয়া গেছে। নতুন ড্রেসটা কিনে ভালই করেছি, আমার কাপড়গুলোর যা অবস্থা—সেগুলো পরে কারও বাড়ি যাওয়া চলে না।' হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়ে যেতেই থমকে দাঁড়াল স্বাতী। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তোমার কি কোন কাজকর্ম নেই? বেশ নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছ!'

'একটা দিন, স্বাতী। শুধু একটা দিন,' কণ্ঠস্বরের আবেগ ঢেকে রাখার কোন চেষ্টা করল না আসিফ। 'তোমার কাছ থেকে মাত্র চব্বিশটা ঘণ্টা ভিক্ষা চাইছি।'

'আমার তো কোন অসুবিধা নেই, আমি এখানে বেড়াতেই এসেছি। কিন্তু

ভয় হচ্ছে আমার জন্যে তোমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে।'

'আগামীকাল থেকে আমাকে হিউগোর কাছাকাছি সাগরে থাকতে হবে। আজকের দিনটাই শুধু আমাদের।'

দ্বীপের অন্যপাশে নোঙর ফেলা ইয়াটটা ঢেউয়ের আঘাতে মৃদু মৃদু দুলছে। কেবিনের ভেতরের দেয়াল বার্নিশ করা দামী কাঠে মোড়া, একনজরেই বোঝা যায় ইয়াটের মালিক সৌখিন লোক।

ঝকঝকে ওক্ কাঠের টেবিলে ফাইলটা আছড়ে ফেললেন সামির ফারুকি। 'তোমার রিপোর্ট পড়ে শেষ করেছি,' প্রায় ধমকে উঠে প্রশ্নবোধক চোখে চেয়ে রইলেন সামনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে।

মাথা-ভর্তি সাদা চুলে হাত বুলিয়ে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে মুখ নিচু করল এসটেবান, বলল, 'সে যা যা তথ্য দিয়েছে, সবই নির্ভুল।'

'হ্যাঁ, কিন্তু মাথায় একটু ঘিলু থাকলেই বুঝতে পারতে সেসব তথ্যের কোন মূল্যই নেই,' ভেতরে ভেতরে ভড়কে গেছে এসটেবান, সেটা বুঝতে পেরে বিরক্ত হলেন তিনি। 'আসিফ মাহমুদের হাবভাব ভাল ঠেকছে না, বড্ড ধীরে এগুচ্ছে সে। ওর মনে কি আছে কে জানে!'

রসাল হাসি দেখা দিল এসটেবানের ঠোঁটের কোণে, তারিয়ে তারিয়ে বলল, 'আপাতত ডক্টর মাহমুদের হৃদয় জুড়ে বিচরণ করছে অপরূপ সুন্দরী এক রমণী।'

'ড্যাম্!' রাগে ফুঁসে উঠলেন সামির ফারুকি। 'পরিকল্পনা মাফিক কিছুই হচ্ছে না! এতক্ষণে সবকিছুই আমাদের হাতে চলে আসার কথা!'

'সবধরনের টেস্ট শেষ না হলে রোবটটার তো কোন মূল্যই নেই,' মনে করিয়ে দিল এসটেবান।

'ও নিশ্চয়ই কোন মতলব এঁটেছে। ওর কাজ শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কি কোন দরকার আছে?'

'ডক্টর মাহমুদকে ছাড়া...' শ্রাগ করল এসটেবান, 'আমরা কিছুই করতে পারব না। রোবটের অন্ধিসন্ধি একমাত্র তারই জানা আছে।'

'মাহমুদ বোকা নয়,' বললেন সামির ফারুকি। 'নিশ্চয়ই একটা টেপ তৈরি করেছে সে। ওকে হাতে রাখার জন্যে সেটা হস্তগত করতে হবে, তাহলে আর ঘাড়-ত্যাড়ামি করতে পারবে না সে।'

'আপনি কি বলেন?' আদেশের প্রতীক্ষায় উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করল এসটেবান।

'চাপ দাও।'

'ইতিমধ্যেই মেয়েটাকে ভয় দেখিয়েছি আমরা।'

'কে এই মেয়েটা? পরিচয় জানতে পেরেছ?'

'বাঙালী মেয়ে, বেড়াতে এসেছে—এটুকুই শুধু জানা গেছে।'

'এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে মেয়েটাকে কেন সে সঙ্গে করে এনেছে?' একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন সামির ফারুকি।

'মেয়েটাকে সে সঙ্গে করে আনেনি,' ব্যাখ্যা করল এসটেবান। 'একই কটেজে পাশাপাশি ঘর ভাড়া করেছে, সেভাবেই ওদের পরিচয়। জানাশোনাটা একটু বেশিই হয়ে গেছে আর কি,' দাঁত কেলিয়ে হাসল এসটেবান।

'মাহমুদকে চাপ দাও,' অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন সামির ফারুকি। 'মেয়েটার উপর থেকে ওর মনোযোগ সরিয়ে কাজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করো। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। আমার ক্লায়েন্টরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তুমি জানো কি করতে হবে।'

'ড্যান ম্যাথিসনের ব্যাপারে কি করব?'

'তুমি জানো কি করতে হবে,' ঠিক একইভাবে বললেন সামির ফারুকি।

মাথা নেড়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল এসটেবান, ঠোঁটের কোণে শীতল হাসি।

দিনটা বেশ ভালই কাটল। একটা স্পীডবোট ভাড়া করে দ্বীপের আশেপাশে ঘুরে বেড়াল আসিফ আর স্বাতী। দুপুরে হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে এল সাগরতীরে। বাচ্চাদের মত লাল কাঁকড়াদের তাড়া করে বেড়াল, রঙবেরঙের ঝিনুক কুড়িয়ে কোঁচড় ভরে তুলল—ঠিক যেন ছেলেবেলাটাই ফিরে এসেছে। হাসি-গল্পে চমৎকার কেটে গেল সময়।

বিকেলে তৈরি হয়ে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা, ড্যানের আসার সময় হয়ে গেছে। রাতে ওর বাড়িতেই খাবার কথা।

'তোমাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে,' না বলে পারল না আসিফ।

'ধন্যবাদ,' মিষ্টি করে হাসল স্বাতী। ও নিজেও জানে নতুন কেনা পোশাকটায় ওকে খুব মানিয়েছে।

'কয়েকদিনের জন্যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, ভাবতেই খুব কষ্ট

হচ্ছে। কাল নাহয় আমার সঙ্গে বোটেই চলো, বেড়ানোও হবে,' বলেই মনে মনে নিজের হাত কামড়াল আসিফ। ওই বিপদের মধ্যে স্বাতীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন মানেই হয় না।

'মাথা খারাপ!' আপত্তি জানাল স্বাতী। 'এমনিতেই তোমার কাজের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আগামীকাল সকালের ফ্লাইটেই গ্র্যাণ্ড কেইমেনে ফিরে যাব আমি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আসিফ। ধুলোর মেঘ তুলে এগিয়ে আসতে থাকা সাদা রঙের জীপটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এই যে, ড্যান এসে পড়েছে।'

ওদের সামনে জীপ থামিয়ে হাত নাড়ল ড্যান, চেঁচিয়ে বলল, 'উঠে পড়ো!'

ওদের নিয়ে জীপটা বড় রাস্তায় উঠতে আসিফের দিকে ফিরল ড্যান। 'আজ সকালে তুমি যে লোকটার খোঁজ করতে বলেছিলে, স্থানীয় লোকেরা তাকে চেনে না। কোথায় দেখেছ লোকটাকে? কেনই বা তার খোঁজ করছ?'

'স্বাতীকে বিরক্ত করছিল, হোটেলের ডাইনিং হলে,' ব্যাখ্যা করল আসিফ।

'বিরক্ত করছিল মানে?' অবাক হয়ে গেল ড্যান। 'বাজে প্রস্তাব···মানে, অশালীন কোন ব্যবহার?'

'বাদ দাও, তেমন কিছু না,' প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করল আসিফ।

ওর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে স্বাতীর দিকে চাইল ড্যান। অস্বস্তি বোধ করল স্বাতী। কৌতূহল আর বিস্ময় ছাড়াও কি যেন একটা আছে সে দৃষ্টিতে। অস্থিরতা? উৎকণ্ঠা?

মিনিট দশেক কেউ কোন কথা বলল না। নীরবতা ভাঙল ড্যানই। রাস্তার দিকে চোখ রেখে হালকা গলায় বলল, 'তোমাদের খুব বেশি খিদে পায়নি তো? খাবার আগে কিন্তু প্রার্থনা করতে হবে।'

'এখনও সূর্যই ডোবেনি, তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল স্বাতী।

'ওর কথা তুমি ধরতে পারোনি, স্বাতী,' ব্যাখ্যা করল আসিফ। 'প্রার্থনা করার অর্থ, নিজেদের খাবার আমাদের নিজেদেরই শিকার করতে হবে। হাড়কিপটের উদাহরণ হিসেবে ডিক্সনারিতে ড্যানের একটা ছবি ছাপিয়ে দেয়া

উচিত—ঠিক "হাড়কিপটে" শব্দটার পাশে।'

'মানে?' শিকারের কথা শুনে একটু ভড়কে গেল স্বাতী।

'মানে পকেটের পয়সা খরচ করে আমাদের আপ্যায়ন করবে না ব্যাটা হনুমানের নাতি, এ যাত্রা প্রকৃতির উপর দিয়েই সারবে।'

আসিফের পাঁজর লক্ষ্য করে কনুই চালাল ড্যান। 'এ শালার কোন কথা বিশ্বাস কোরো না, স্বাতী। বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে তো সব সময়ই খাওয়াদাওয়া করো, কিন্তু আজকের নেমন্তন্নর কথা তোমার আজীবন মনে থাকবে। আমরা লবস্টার ধরতে যাচ্ছি, সমুদ্রের তীরে বসেই রান্না করবে নাটালি।'

'লবস্টার?' অবাক হলো স্বাতী। 'এখানকার পানিতে লবস্টার আছে! যতদূর জানি লবস্টার তো শুধু ঠাণ্ডা পানিতেই জন্মায়।'

'এগুলো অন্য জাতের, ইওরোপিয়ান একটা প্রজাতি। তীরের কাছে একটা জায়গা চিনি, যেখানে হাঁড়ির ভাতের মত গিজগিজ করছে লবস্টারের ঝাঁক।'

জঙ্গলের মধ্যে খরগোশ বা বুনো মুরগীর পিছু ধাওয়া করে বেড়াতে হবে না ভেবে আশ্বস্ত হলো স্বাতী। তাছাড়া চড়ুইভাতির জন্যে এমন নিখুঁত আবহাওয়া, ছুটি কাটাবার জন্যে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে! চিন্তার কালো মেঘটা মন থেকে পুরোপুরি মুছে গেছে, নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্বাতী।

## এগারো

লাইলাক আর গোলাপ বাগানে ঘেরা কাঠের তৈরি একতলা সাদা একটা বাংলোর সামনে জীপ থামাল ড্যান। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল নাটালি। অপূর্ব সুন্দরী, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়া বাদামী চুল, সমুদ্রের মত নীল এক জোড়া চোখ। কম করেও সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, ভোগ বা

কসমোপলিটনের মডেলদের মত শরীরের গড়ন। এক নজরেই নাটালিকে ভাল লেগে গেল স্বাতীর।

এগিয়ে এসে স্বাতীর হাত ধরল নাটালি। সুরেলা মিষ্টি গলায় বলল, 'যাক, অবশেষে তোমার দেখা পেলাম। এ ক'দিন ড্যানের মুখে শুধু তোমার গল্পই শুনছি।'

'যদি জানতাম তুমি এমন সুন্দরী, তাহলে আরও আগেই তোমাকে দেখতে আসতাম,' হাসল স্বাতী।

'তোমার ওই চুল, ঘন পাপড়ি ঘেরা কালো চোখ আর এমন চমৎকার ত্বকের জন্যে আমি আমার সবকিছু বিলিয়ে দিতে রাজি আছি,' আন্তরিক গলায় বলল নাটালি। 'কিন্তু এমন সুন্দর একটা ড্রেস পরে এসেছ, লবস্টার ধরতে গেলে তো ময়লা হয়ে যাবে। এসো, তোমাকে ধোওয়া একটা ড্রেস দিচ্ছি, ওটা ময়লা হলে অসুবিধা নেই।' হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল ওকে নাটালি। আগুনের মত রূপ, অথচ নদীর মত শান্ত আর শীতল মহিলা।

সুন্দর করে সাজানো ঘরদোর। দামী ওক্ কাঠের আসবাবপত্র, অ্যান্টিকের মূল্যবান সংগ্রহ গৃহস্বামীর মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করছে। শোবার ঘরে নিয়ে এসে লিনেনের একটা প্রিন্টেড ফ্রক বের করে দিল নাটালি, স্বাতীর গায়ে সেটা ভালই ফিট করল। বেরিয়ে আসার মুহূর্তে কোণের একটা ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াল স্বাতী। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা বিছানা, তাতে মিকি মাউসের ছবিওয়ালা চাদর। দেয়ালে ফুলতোলা ওয়ালপেপার, ঘরের চারদিকে রঙবেরঙের খেলনা আর পুতুল।

'তোমাদের বাচ্চা আছে, তা তো জানতাম না!' বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না স্বাতী।

'তুমি ঠিকই জানো, আমাদের বাচ্চা নেই,' ম্লান হাসল নাটালি। 'বহুবছর ধরে সন্তানের প্রতীক্ষায় দিন গুনছি আমরা। যদি সত্যিই সে কোনদিন আসে, তাই ঘর সাজিয়ে রেখেছি।'

স্বাতী এতক্ষণে বুঝতে পারল, শান্ত-সমাহিত স্বভাব নয়, নাটালিকে সর্বক্ষণ ঘিরে ধরে আছে একরাশ বিষণ্ণতা। সমবেদনায় বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল। এ মহিলা কতদিন মন খুলে হাসেনি তা কে জানে!

'দেখো, খুব শীঘ্রিই এই ছোট্ট বিছানায় চাঁদের মত একটা শিশু হাত-পা

ছুঁড়ে খেলা করবে। বিধাতা কিছুতেই এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না।' নাটালির হাত ধরে চাপ দিল স্বাতী। 'অন্য আরও অনেক উপায়ই তো আছে। কখনও দত্তক নেবার কথা চিন্তা করেছ?'

'আমি অনেক বছর ধরেই ড্যানকে রাজি করাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ও কথাটা কানেই তুলতে চায় না।'

ড্যানের তাড়া শুনে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। জীপের পিছনে দরকারী মালপত্র তোলা হয়েছে, মায় থার্মাসে বরফ পর্যন্ত। নাটালি আর স্বাতী পিছনের সীটে, আসিফ ড্যানের পাশে উঠে বসল। সমুদ্রের তীর ধরে প্রায় পনেরো মিনিট চলার পর ব্রেক কষল ড্যান, 'এখান থেকেই বোটে উঠব আমরা।'

স্বাতী ভেবেছিল 'নাটালি'-কে দেখতে পাবে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক ছোট নীল রঙের ঝকঝকে নতুন একটা বোট রশি দিয়ে বাঁধা আছে ছোট্ট জেটিতে। মালপত্র সহ বোটে উঠে এল ওরা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই প্রবাল-ঝাড়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল, যেখানে অগুন্তি লবস্টার নিশ্চিন্তে বংশবিস্তার করে চলেছে।

তীরের কাছাকাছি নোঙর ফেলল ড্যান। ওদিকে আসিফ কাঁচের তলাওয়ালা একটা প্লাস্টিকের বাক্স রশি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে বোটের গায়ে। একটু লক্ষ করলেই স্বচ্ছ পানির নিচে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্থির হয়ে থাকা লবস্টারের ছায়া।

'ইশ্! একেকটা কি বিশাল!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল স্বাতী। 'বড়গুলো তো কম করেও দু'পাউণ্ড হবে!'

ওর হাতে আঁকশির মত দেখতে একটা লাঠি ধরিয়ে দিল ড্যান। 'উত্তর আমেরিকার উপকূলে শীতল জলে যে জাতের লবস্টার পাওয়া যায়, সেগুলো এর চেয়েও অনেক বড়। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করো, নাগালের মধ্যে পেলেই আঁকশিটা দিয়ে চেপে ধরে তুলে নিয়ে এসো। তারপর ওই বাক্সটায় ছেড়ে দাও।'

'এতই সহজ?' নেচে উঠল স্বাতী।

কাজের বেলায় অবশ্য ততটা সহজ হলো না। ছয়বার চেষ্টার পর সপ্তমবারে টকটকে লাল বিশাল একটা লবস্টার তুলে নিয়ে এল স্বাতী। হাততালি দিয়ে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল ড্যান, 'সাবাশ!' তারপরে চারজনে মিলে প্রতিযোগিতায়

নেমে পড়ল কে কয়টা তুলতে পারে। উচ্চগ্রামের হাসি আর চেঁচামেচিতে জীবন্ত হয়ে উঠল নিথর শান্ত প্রকৃতি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভরে উঠল প্লাস্টিকের বাক্সটা।

তীরের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। বোট থেকে নেমে আসিফ আর স্বাতী শুকনো কাঠ আর ডালপালা জোগাড় করতে লেগে গেল। ড্যান আর নাটালি বোট থেকে জিনিসপত্র নামাচ্ছে। প্লাস্টিকের বাক্সে কিলবিল করছে গোটা পনেরো লবস্টার। ঘাসে ঢাকা খোলামেলা একটা জায়গা বেছে নিয়ে গুছিয়ে বসল ওরা। শুকনো কাঠকুটোয় সহজেই আগুন ধরিয়ে ফেলল ড্যান, মিনিট তিনেকের মধ্যেই দাউদাউ করে লাফিয়ে উঠল আগুনের লকলকে শিখা। একটা বড় হাঁড়িতে সমুদ্রের জল ভরে আগুনের উপর চাপিয়ে দিল নাটালি। লবস্টারের মাংস যাতে নরম থাকে সেজন্যে লোনা জলে বেশ কিছুটা ভিনিগারও ঢেলে দিল সে। জল ফুটে উঠলে লবস্টারগুলো ঢেলে দিতে দিতে বলল, 'ঠিক বিশ মিনিট পরেই নামিয়ে ফেলতে হবে, নয়তো বেশি সেদ্ধ হয়ে যাবে।' অন্য একটা হাঁড়িতে খাবার জল ভরে গোটা দশেক ভুট্টা আগুনে চাপিয়ে দিল নাটালি।

ডুবন্ত সূর্যের লালিমায় আর আগুনের আঁচে লালচে দেখাচ্ছে নাটালির অপরূপ মুখটা। স্বাতীর চেয়ে কম করেও বছর দশেকের বড় হবে সে, অথচ চেহারায় অনাঘ্রাত কিশোরীর নিষ্পাপ সারল্য। স্বাতী লক্ষ করল, মাঝে মাঝেই স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছে ড্যান, দৃষ্টিতে গভীর ভালবাসা আর অনুরাগের ছায়া। কারও বুঝতে অসুবিধা হবে না, ওরা বড় সুখী। মনে মনে প্রাণভরে ওদের শুভ কামনা করল স্বাতী। এই ভালবাসার জন্যেই পৃথিবীটা আজও এত সুন্দর।

সময় মত লবস্টারগুলো নামিয়ে নিল নাটালি। লেজ ভেঙে ভেতরের নরম গোলাপী মাংস খুলে নিয়ে বড় একটা থালায় সাজিয়ে মাখন ছড়িয়ে দিল। সেদ্ধ ভুট্টার সঙ্গে লবস্টারের মাংস অমৃতের মত লাগছে, স্বাতীর মনে হলো সত্যিই এমন সুস্বাদু খাবার বহুদিন খায়নি।

'তোমার মাকে নিয়ে যেবার এসেছিলে, সেবারের কথা মনে আছে, আসিফ?' প্রশ্ন করল নাটালি।

'লবস্টার ধরার প্রতিযোগিতায় আমাদের সবাইকে টেক্কা দিয়েছিলেন উনি,' যোগ করল ড্যান।

ম্লান হাসল আসিফ, বলল, 'মা বড় ভালবেসে ফেলেছিলেন তোমাদের

দু'জনকে। ভাল না বেসে কি আর উপায় ছিল! যা খাতির করেছ! তোমাদের ঋণ এজীবনে আমি শোধ করতে পারব না।'

'বড় ভাল মানুষ ছিলেন তিনি,' ভারাক্রান্ত গলায় বলল নাটালি। 'আমাদেরই সৌভাগ্য, সেবা করার জন্যে কাছে পেয়েছিলাম তাঁকে। মায়ের জন্যে তুমি যা করেছ, তার কোন তুলনা হয় না। আমার যদি কখনও ছেলে হয়, তাহলে বিধাতার কাছে তোমার মতই একটা ছেলে চাইব আমি।'

হেসে উঠল ড্যান, আসিফের উদ্দেশ্যে বলল, 'দেখো, তোমার গুণাবলীর বর্ণনা দিয়ে স্বাতীকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছে। ঘটকালীর নেশায় পেয়েছে আমার বউকে।'

ড্যানের পিঠে কিল বসিয়ে দিল নাটালি। 'ঘটে বুদ্ধি থাকলে বুঝতে আমার অপেক্ষায় বসে থাকেনি ওরা। তাছাড়া আসিফের মত ছেলের জন্যে আবার ঘটকালীর দরকার হয় নাকি?'

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে বোটে করে জেটিতে ফিরে এল ওরা। ওখান থেকে জীপে করে ড্যানের বাড়িতে। পোশাক বদলে নিজের স্কার্ট আর ব্লাউজ পরে নিল স্বাতী।

বিদায় নেবার সময় স্বাতীকে জড়িয়ে ধরল নাটালি, ওর কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'ভারি সুন্দর মানিয়েছে তোমাদের দু'জনকে। এর পরের বার যখন কেইমেনে আসবে, সঙ্গে করে বিয়ের ছবির অ্যালবামটা নিয়ে এসো।'

ড্যান যখন ওদেরকে হোটেলে নামিয়ে দিল, তখন বেশ রাত। সারাদিনের হৈ-হল্লার পর ঘুমে স্বাতীর দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল ওরা। ওদের ঘর দুটো বারান্দার প্রায় শেষ প্রান্তে। মাঝামাঝি আসতেই থমকে দাঁড়াল স্বাতী। অন্যপ্রান্তে কর্মচারীরা যে সিঁড়িটা ব্যবহার করে, সেটা বেয়ে কেউ যেন ধুপধাপ করে নিচে নেমে গেল। বারান্দায় অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে, আবছা আঁধারে ভালমত দেখা গেল না। কিন্তু চোখের ঘুম কেটে গিয়ে স্বাতীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছে। হোটেলের কর্মচারী হলে এমন তাড়াহুড়ো করে নামতে যাবে কেন? চোর নয় তো?

'কি হলো?' স্বাতীকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল আসিফ।

'শ্-শ্-শ্!' ঠোঁটে তর্জনী ছুঁইয়ে ওকে চুপ করার ইঙ্গিত করল। পা টিপে

টিপে ওর ঘরের সামনে এসে ফিসফিস করে স্বাতী বলল, 'ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে! সন্ধ্যার অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা, আমি আলো জ্বালিয়ে যাইনি।'

'হয়তো ঘর পরিষ্কার করার সময় মেইড জ্বালিয়েছে, যাবার সময় নেভাতে ভুলে গেছে,' ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করল আসিফ।

স্বাতীর সন্দেহ ঘুচল না। দরজার সামনে থেকে সরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল, আসিফকেও ঠেলে সরিয়ে দিল।

'কি ছেলেমানুষী করছ?' মৃদু আপত্তি জানাল আসিফ।

হাত বাড়িয়ে আলগোছে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলে ফেলল স্বাতী, পা দিয়ে ঠ্যালা দিতেই হাট হয়ে খুলে গেল দরজাটা। সত্যিই ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। তবে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সাবধানে ঘরে ঢুকল ওরা।

জানালার পর্দা টেনে দেয়া, অথচ যাবার সময় স্বাতী গুটিয়ে রেখে গিয়েছিল। ড্রেসারের ড্রওরগুলো খোলা। বিছানার উপরে ছড়িয়ে আছে স্বাতীর লিপস্টিক, কমপ্যাক্ট, ক্রিমের কৌটো ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিসপত্র। বাথরুম, খাটের তলা, ব্যালকনি দেখে নিয়ে ওরা নিশ্চিত হলো, ঘরের ভেতর কেউ লুকিয়ে নেই।

'কেউ ঘরে ঢুকে আমার জিনিসপত্র সার্চ করেছে,' হতভম্ব আসিফের দিকে ফিরে বলল স্বাতী।

'কিন্তু কেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল আসিফ। 'ভাল করে খুঁজে দেখো কিছু খোয়া গেছে কিনা। ছিঁচকে চোরও তো হতে পারে।'

হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে পড়ে ম্যাট্রেসের তলা থেকে একটা কসমেটিক ব্যাগ বের করে ভাল করে ভেতরটা দেখে নিল স্বাতী। 'উঁহুঁ, চোরের কাজ নয়। ডলার, পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড, ট্র্যাভেলার্স চেক সবই ঠিকঠাক আছে।'

'সঙ্গে করে কোন গহনাগাটি এনেছিলে?'

'মাথা খারাপ! সোনার গয়না খুব কমই পরি আমি, সঙ্গে করে বিদেশে বয়ে আনার প্রশ্নই ওঠে না।'

'আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না,' মাথার চুলে আঙুল বুলাতে বুলাতে পায়চারি করতে শুরু করল আসিফ। 'ড্যানকে ফোন করে বলছি—আজ রাতেই বোটে করে তোমাকে গ্র্যাণ্ড কেইমেনে পৌঁছে দেবে ও। কটেজে না উঠে

হোটেলে উঠবে। সার্জেন্ট ববির সঙ্গে সকালের মধ্যেই যোগাযোগ করবে, সেই তোমার সিকিওরিটির ব্যবস্থা করে দেবে।'

'সিকিওরিটি!' হাত নেড়ে ওর কথা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করল স্বাতী, বলল, 'এত অস্থির হবার কি আছে? আমি তো এমনিতেই সকালে চলে যাচ্ছি। রাতে কি আর চোর ফিরে আসবে? তারচেয়ে নিচে গিয়ে ডেস্কে ঘটনাটা জানাই। কে জানে, হয়তো দেখা যাবে এখানে প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটে।'

বহু কষ্টে রাগ চেপে রেখে গম্ভীরকণ্ঠে আসিফ বলল, 'গতকালের ঘটনাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ, স্বাতী। আজকের ব্যাপারটা গতকালের জেরও হতে পারে।'

'আগে নিচে গিয়ে দেখি তো ওরা কি বলে। তাছাড়া ভয়ের কিছু নেই, যারাই করে থাকুক না কেন, আমার শারীরিক কোন ক্ষতি তারা করবে না।'

নিরুপায় হয়ে শ্রাগ করল আসিফ। এ মেয়েকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা।

'তুমি এক দৌড়ে তোমার ঘরটা দেখে এসো, সব ঠিকঠাক আছে কিনা। ইতিমধ্যে ঘরটাকে একটু মানুষ করে ফেলি আমি,' বলল স্বাতী।

বেরিয়ে যাবার মুখে ঘুরে দাঁড়াল আসিফ। 'ভেতর থেকে দরজাটা ভাল করে আটকে দাও। আমার গলা না শোনা পর্যন্ত দরজা খুলবে না, ঠিক আছে?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল স্বাতী, 'এবারে কে ছেলেমানুষী করছে?'

ঘরে ঢুকে আঁতিপাঁতি খুঁজেও সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না আসিফ। জিনিসপত্র যেখানে যেটা ছিল, সেখানেই আছে সব। এ ঘরে কেউ ঢোকেনি। আসিফ নিশ্চিত হয়ে গেল, স্বাতীকে ভড়কে দিয়ে ওই নাকবোঁচা দলটা ওকেই আসলে সাবধান করে দিতে চাইছে। স্বাতীর সঙ্গে মেলামেশাটা ওরা পছন্দ করছে না, ওরা চায় আসিফ উঠেপড়ে কাজে লেগে যাক।

নিজের জন্যে চিন্তা করছে না ও, যত চিন্তা ওই গোঁয়ার মেয়েটাকে নিয়ে। এখন মনে হচ্ছে, হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে, হেলাফেলা করা উচিত হয়নি। যা মনে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সংঘবদ্ধ আর শক্তিশালী ওই দলটা। সাদা-চুলো লোকটা নিশ্চয়ই স্থানীয়, ওরকম আরও ক'জন আছে কে জানে! এতবড় একটা দলের বিরোধিতা করে কতক্ষণ টিকে থাকা যাবে?

কাল সকালে স্বাতী নিরাপদে গ্র্যাণ্ড কেইমেনে পৌঁছলেই একটু নিশ্চিত

হওয়া যায়। ওখানে পুলিশ আছে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ওদেরই দায়িত্ব। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা জেনে গেলে পুলিশ আবার ওর গবেষণায় বাগড়া দেবে না তো? উপায় নেই, এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে, যেখানে স্বাতীর নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত।

এই মুহূর্তে গবেষণার কাজটা নির্বিঘ্নে শেষ করাটাই সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার। সময় মত রিপোর্টগুলো হাতে না পেলে কনট্রাক্টটা হাত ফসকে যেতে পারে। আর কনট্রাক্ট হাতছাড়া হবার অর্থ সারাজীবনের পরিশ্রম মাটি হয়ে যাওয়া। নাহ্, কাল সকালে স্বাতী ভালয় ভালয় গ্র্যাণ্ড কেইমেনে পৌঁছলে মাথা থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে হিউগোকে নিয়ে উঠেপড়ে লাগতে হবে, চুলোয় যাক বাকি দুনিয়া।

স্বাতীকে নিয়ে নিচে রিসেপশনে নেমে এল আসিফ। ঘটনা শুনে হোটেলের মালিক মহিলা আকাশ থেকে পড়লেন। এই হোটেলের কোন ঘরে আজ পর্যন্ত চুরি হয়নি। সব শুনে মহিলা রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। না, আশেপাশে অপরিচিত বা সন্দেহজনক কোন লোককে ঘুরঘুর করতে দেখেননি তিনি। স্বাতীর হাত ধরে বার বার ক্ষমা চাইলেন। তারপর স্বাতী যখন জানাল কোন কিছু চুরি যায়নি, তখন একটু ধাতস্থ হলেন তিনি। তবুও বললেন, 'ঘরে গিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখুন, কিছু হারিয়ে থাকলে আমার ইনস্যুরেন্স তার ক্ষতিপূরণ দেবে। ঘরটা পরিষ্কার করার জন্যে আমি এক্ষুণি একজন মেইড পাঠিয়ে দিচ্ছি।' পুলিশ ডাকতে চাইলে স্বাতী নিষেধ করল, এতরাতে ঝামেলা করে কোন লাভ নেই। সকালে রিপোর্ট করলেই চলবে।

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো ওরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল স্বাতী, বলল, 'দাঁড়াও, একটা কথা মনে পড়েছে।' লবি ধরে ডাইনিং হলের দিকে দ্রুতগতিতে হাঁটতে থাকল।

'কি হলো? কোথায় চললে?' একটু বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল আসিফ, স্বাতীর পিছু নিতে বাধ্য হলো।

'আরে, এসোই না!' ডাইনিং হলে ঢুকে কারও খোঁজে এদিকওদিক তাকাল স্বাতী। প্রায় খালি হলঘরের এক কোণে পাঁচ ছ'জন কর্মচারী জটলা করছে। হনহন করে স্বাতী সোজা ওদের কাছে গিয়ে বিশেষ একজন ওয়েইটারকে ডাকল, 'এই যে, তোমার সঙ্গে কথা আছে। একটু বাইরে আসবে?'

'আ...মি...,' ঢোক গিলল ওয়েইটার, সাদা-চুলো লোকটা একেই মোটা

টিপ্‌স্‌ দিয়েছিল। ...আমার হাতে অনেক কাজ...

'ঠিক আছে, রিচি,' পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'আমি এদিক সামলাচ্ছি। তুমি কথা শুনে এসো।'

এরপর আর আপত্তি করার কিছু থাকল না, স্বাতীর পিছু পিছু সুড়সুড় করে লবিতে বেরিয়ে এল রিচি।

কোন ভণিতা ছাড়াই সরাসরি প্রশ্ন করল স্বাতী, 'আজ রাতে তুমি কাউকে আমার ঘরের চাবি দিয়েছ? অথবা কোনভাবে কাউকে আমার ঘরে ঢুকতে সাহায্য করেছ?'

কথা বলার জন্যে মুখ খুলেও শেষ পর্যন্ত চুপ করে রইল আসিফ।

ওদিকে ঘাম দেখা দিয়েছে রিচির কপালে। নির্ভেজাল বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কক্ষনো না, ম্যা'ম! এ ধরনের কাজ আমি কখনোই করব না!'

তীক্ষ্ণ চোখে ওর আপাদমস্তক জরিপ করতে করতে স্বাতী বলল, 'কিন্তু কিছু একটা তো করেছ, তা তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি। যদি খুলে না বলো, তাহলে এক্ষুণি ডেস্কে তোমার নামে রিপোর্ট করছি আমি।'

'শুধু একজনের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি,' মাটিতে চোখ নামিয়ে মিনমিন করে বলল রিচি। 'বিশ্বাস করুন, আমি আর কিছু জানি না।'

'কে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিল?'

'গতকালের সেই ভদ্রলোক নয়।'

'কিন্তু তার পরিচিত কেউ, তাই না?' জোর দিয়ে বলল স্বাতী।

'হ্যাঁ, ওই ভদ্রলোকের বন্ধু বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে।'

আসিফ আর চুপ করে থাকতে পারল না, এক পা এগিয়ে এসে প্রায় ধমকে উঠল, 'কে ওই লোকটা? কি নাম?'

আস্তিন ধরে টেনে ওকে নিরস্ত করল স্বাতী। 'লোকটা তোমাকে কত টাকা দিয়েছে, রিচি?'

অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকাল ছেলেটা, 'অল্প কিছু...কয়েকটা তথ্যের বিনিময়ে...'

'কি তথ্য?'

'লোকটা বলল তার বন্ধু আপনার প্রেমে পড়ে গেছে, তাই আপনার সম্বন্ধে জানতে চায়। আমি শুধু তাকে আপনার নাম আর রুম নাম্বারটা জানিয়েছি, আর

কিছু না।'

'তুমি ওদেরকে চেনো? সত্যি কথা বলো, রিচি।'

'ন্‌...না! বিশ্বাস করুন, আমি চিনি না। তবে গতকাল রাতে ওই লোকটা যখন আমাকে টিপ্‌স্‌ দিল, তখন চার্লি—আর এক ওয়েইটার—বলল, লোকটা নাকি একটা ইয়াটে থাকে।'

'ইয়াটে! কি নাম ইয়াটটার?'

'চার্লির কাছে শুনেছি ওটার নাম "অরোরা"।' ছটফট করে উঠল রিচি, অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকে দয়া করে যেতে দিন। প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনও আপনার সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কথা বলব না।'

'চার্লি কোথায়?'

'গ্র্যাণ্ড কেইমেনে গেছে আজ সকালে, ক'দিনের জন্যে ছুটি নিয়েছে।'

'শোনো, পুরো ঘটনাটা তুমি তোমার মালিককে খুলে বলবে। উনি খুবই চিন্তায় আছেন...'

'ন্‌...না...' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল রিচি।

'ওই লোক আমার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র হাতিয়েছে। সকালে পুলিশ আসবে ইনভেস্টিগেশনের জন্যে। তুমি যদি নিজ থেকে তোমার মালিককে সব না জানাও, তাহলে নিশ্চিত থাকতে পারো আগামীকাল থেকে এ হোটেলে তুমি কাজ করছ না। আমি নিজে সেদিকটা দেখব।'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে শ্লথপায়ে ডেস্কের দিকে রওনা হলো রিচি।

আসিফ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে অবশেষে বলেই ফেলল, 'তোমাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। এভাবে জেরা করতে শিখলে কোথায়? পুলিশে ছিলে নাকি?'

হেসে উঠল স্বাতী। 'ছেলেবেলা থেকেই আমি মাসুদ রানা আর শার্লক হোমসের ভক্ত। সম্ভবত ওখান থেকেই এই জ্ঞানলাভ করেছি। মনে হচ্ছে রহস্যভেদীর ভূমিকায় খুব একটা খারাপ করব না, অন্তত জানতে তো পেরেছি কে ঘরে ঢুকেছিল।'

'স্বাতী, এটা ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার নয়। কাল গ্র্যাণ্ড কেইমেনে ফিরে তুমি হোটেলে উঠবে, লোকজনের ভিড়ে ভয় কম। সাবধানের মার নেই।'

'কটেজটা আমার খুব পছন্দ, ওখানেই থাকব আমি।'

হাল ছেড়ে দিল আসিফ, ওকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। 'কেইমেনে ক'দিন থাকবে ঠিক করেছ?'

'এখনও জানি না।'

'তোমার ঢাকার ঠিকানাটা আমাকে লিখে দেবে? আমি গ্র্যাণ্ড কেইমেনে ফেরার আগেই যদি তুমি ঢাকায় চলে যাও!'

'চিন্তা কোরো না, তুমি ফেরা পর্যন্ত আমি কেইমেনেই আছি।'

'আমি তোমাকে হারাতে চাই না, স্বাতী।' আসিফের দৃষ্টির গভীরে ভালবাসার কাঁপন, কণ্ঠস্বরে রুদ্ধ আবেগ।

ওর চোখে চোখ রেখে লাল হলো স্বাতী। আস্তে করে বলল, 'তোমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবার সাধ্য কি আমার আছে?'

আসিফের বাড়িয়ে দেয়া ভিজিটিং কার্ড দরজার গায়ে চেপে ধরে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দিল স্বাতী। আসিফকে ওর কলম ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'খুশি?'

'না,' ম্লান হাসল আসিফ। 'খুশি হব, যদি তুমি কথা দাও নিজের দিকে খেয়াল রাখবে।'

চোখ মুদে মাথা ঝাঁকাল স্বাতী। তারপর বিদায় নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। তালা বন্ধ করার শব্দ শোনার পর নিজের ঘরের উদ্দেশে রওনা হলো আসিফ।

## বারো

প্রতিদিন সকালে কেইমেন ব্র্যাক আর গ্র্যাণ্ড কেইমেনের মধ্যে ছোট্ট একটা প্লেন যাত্রীদের আনা-নেয়া করে। পরদিন সকালে সেটাতে করেই স্বাতী গ্র্যাণ্ড কেইমেনে ফিরে এল। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল কটেজে। বালুঢাকা এক চিলতে পথের দু'ধারে ল্যানটানার ঝোপ, পুষ্পিত গোলাপঝাড় আর রঙিন কটেজটা দেখামাত্র মনের গভীরে একরাশ প্রশান্তি

ছড়িয়ে পড়ল। মনে হলো যেন বহুদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছে।

প্লেনে সারাটা পথ শুধু আসিফের কথাই ভেবেছে স্বাতী। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে গত ক'দিনের টুকরো টুকরো স্মৃতি। মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারছে না আসিফের সম্মোহনী দৃষ্টির আকর্ষণ, সাহচর্যের পরম নির্ভরতা। বাথরুমের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি চোখ রাঙাল স্বাতী—বোকা মেয়ে, তুমি মরেছ!

হাতমুখ ধুয়ে শোবার ঘরে এসে ব্যাগ থেকে জামাকাপড় বের করে গোছাতে শুরু করল। ঠিক তক্ষুণি বাইরে কে যেন চিৎকার করে উঠল। নারীকণ্ঠের আর্তনাদ! এক দৌড়ে দরজা খুলে পর্চে চলে এল স্বাতী।

সাদা রঙের অ্যাপ্রন পরা মধ্যবয়েসী এক মহিলা দুর্বোধ্য স্থানীয় ভাষায় অনুপস্থিত কারও উদ্দেশ্যে শাপশাপান্ত করছে আর কপাল চাপড়াচ্ছে। মহিলার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল স্বাতী। 'শান্ত হোন! কি হয়েছে? এমন করছেন কেন?'

ঢোক গিলে আঙুল তুলে আসিফের ঘরের দরজাটা দেখাল সে, ইংরেজিতে বলল, 'ভেতরে গিয়ে নিজের চোখেই দেখুন।'

স্বাতীর বুক কেঁপে উঠল। এক ছুটে ভেজানো দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতেই বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল।

আসিফের ঘরের ভেতরে ছোটখাট ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে। বসার ঘরের সোফাটা উল্টে আছে, কুশনগুলো টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছে। চারদিক তুলোয় মাখামাখি। কাঁচের ল্যাম্পের ভাঙা টুকরো মেঝেয় গড়াচ্ছে। এমনকি ছাদের লাইট-হোলডার থেকে বাল্ব আর শেডও খুলে নেয়া হয়েছে। ঘরের একটা জিনিসও আস্ত নেই।

কোন চোরের কাজ নয়, স্বাতীর বুঝতে অসুবিধা হলো না, বিশেষ কোন জিনিসের খোঁজে দক্ষ হাতে কেউ ঘরটাকে সার্চ করেছে। শোবার ঘরের ম্যাট্রেস-বালিশ টুকরো টুকরো করে কাটা। ড্রওরগুলো মেঝেতে উপুড় হয়ে আছে। ক্লজিটের জিনিস-পত্র সব বাইরে স্তূপ করে রাখা। হিলডা! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্বাতী। ভাগ্যিস, হিলডাকে ওর ঘরে রেখে গিয়েছিল আসিফ! ঘরে ফিরে ক্লজিট খুলে দেখতে ভুলে গিয়েছিল স্বাতী, হিলডা ঠিক আছে তো?

মহিলার হাত ধরে নিজের ঘরে চলে এল স্বাতী, বলল, 'এক কাপ চা বানিয়ে খান, একটু ভাল লাগবে। রান্নাঘরে সবই মজুদ আছে। তারপর অফিসে

ফোন করে মিস্টার পামারকে ঘটনাটা জানান।'

'বিশ্বাস করুন, আমার কোন দোষ নেই,' মহিলার ভয় পুরোপুরি দূর হয়নি, এখনও একটু একটু কাঁপছে। 'গতকাল সকালেও ঘর পরিষ্কার করে গেছি, সবকিছু ঠিকই ছিল। যাবার সময় দরজা তালাবন্ধ করে গেছি। কিন্তু আজ এসে দেখলাম দরজাটা মুখে মুখে লাগানো, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। দ্বীপে এরকম চুরি-ডাকাতির ঘটনা খুব কমই ঘটে। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না!'

মেইডকে রান্নাঘরে বসিয়ে রেখে দৌড়ে এসে ক্লজিটের দরজা খুলল স্বাতী। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, হিলডা বেশ প্রশান্তমুখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু আসিফ হিলডাকে কেন স্বাতীর ঘরে রেখে গিয়েছিল? সে কি জানত হিলডার বিপদ হতে পারে? কিসের খোঁজে আসিফের ঘর লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে? হিলডা? না, ওরা আকারে অনেক ছোট কিছু খুঁজছিল। ড্রাগ? হীরে? ভাবতে গিয়ে অপরাধবোধে মিইয়ে গেল স্বাতী। কত সহজে আসিফকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে সে!

গাড়ির শব্দ শুনে বাইরে এল স্বাতী। রিচার্ড পামার গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'ওপাশের কটেজে এসেছিলাম কাজে, মনে হলো এখান থেকে কেউ চিৎকার করছিল?'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। মেইড চিৎকার করছিল। আসিফ মাহমুদের ঘরে সম্ভবত চুরি হয়েছে।'

'চুরি!' আর্তনাদ করে উঠল পামার। 'মাহমুদ সাহেব কোথায়?'

'সাগরে,' জানাল স্বাতী।

'আপনার ঘর ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয় ছেলেপিলেদের কাণ্ড! গতবছর কলেজের কিছু পাজি ছেলে খালি একটা কটেজে ঢুকে সারা রাত পার্টি করেছে। বছরের এসময়টায় কলেজ ছুটি থাকে তো, তাই মাথায় শয়তানী চাপে।' ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করে পামারের চোখ কপালে উঠল। পুলিশে ফোন করার পর স্বাতীর কাছে জানতে চাইল, 'মাহমুদ সাহেবকে খবর দেয়া যায় না?'

'না। দু'একদিনের মধ্যে দ্বীপে ফেরারও কোন সম্ভাবনা নেই।'

'ভাল কথা, আপনি ছিলেন কোথায়? গত দু'দিন ধরে আপনাকে ডিনারের

দাওয়াত দেবার জন্যে খুঁজছি!'

'আসিফের সঙ্গে কেইমেন ব্র্যাকে গিয়েছিলাম। এই একটু আগেই ফিরেছি।'

'ও, তাহলে এই ব্যাপার!' গালে হাত দিয়ে স্বাতীর আপাদমস্তকে রসালো দৃষ্টি বুলাল পামার। 'ও ব্যাটা আমার আগেই আপনাকে পটিয়ে ফেলেছে!'

মিনিট দশেকের মধ্যেই সার্জেন্ট চলে এল। ঘরে ঢুকে আঁতকে উঠল, 'চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতায় আজ পর্যন্ত এরকম কিছু দেখিনি!'

'কত বছরের অভিজ্ঞতা? এক বছর?' ব্যঙ্গ করল পামার। 'রাতের আগেই অপরাধীদের ধরা চাই কিন্তু!'

'ইয়েস, বস্!' কৃত্রিম স্যালুট ঠুকে হাসল ববি। 'যদি রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় হয়।'

'আপনারা দুই ভাঁড় এখানে ভাঁড়ামি করুন, আমি দেখি মেইড কি করছে,' বলে নিজের ঘরের উদ্দেশে রওনা হলো স্বাতী।

'অন্য কোথাও যাবেন না কিন্তু, আপনার সঙ্গে কথা আছে,' পিছু ডাকল ববি।

'হায় আল্লাহ্! ববি,' গর্জন করে উঠল পামার, 'মিস চৌধুরীকে সন্দেহ করছ না তো তুমি? আমি সাক্ষী দিতে পারি এ ক'দিন উনি গ্র্যাণ্ড কেইমেনে ছিলেনই না।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ববি আর স্বাতী। 'সার্জেন্ট আমার সঙ্গে অন্য ব্যাপারে কথা বলতে চায়,' পামারকে আশ্বস্ত করল স্বাতী। হাসতে পেরে ভালই লাগছে, কেটে গেছে মনের কোণে জমে ওঠা মেঘটুকু। 'এখানকার কাজ হয়ে গেলে আমাকে জানাবেন। আসিফের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে হবে। মেইড তো সেগুলো আলাদা করে চিনতে পারবে না,' যাবার আগে বলল স্বাতী।

তিন ঘণ্টা পর ববি স্বাতীর ঘরে এল। লাঞ্চের জন্যে বেশ কিছু স্যাণ্ডউইচ আর সালাদ বানিয়েছে স্বাতী। খাবার টেবিলে মুখোমুখি বসে খেতে খেতে কাজের কথা শুরু করল ববি। 'আমার যতদূর মনে হয়, ডক্টর মাহমুদের আগে যে লোক ওই কটেজে ছিল, সে কিছু লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল।'

নীরবে খেতে থাকল স্বাতী, কিছু বলল না।

'হয়তো কিছু লুকিয়ে রাখার জন্যেই এখানে এসেছিল, এখন সময় হতে এসে নিয়ে গেছে। ড্রাগ বা চোরাই টাকা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।'

'ওরাই যদি কিছু লুকিয়ে রেখে গিয়ে থাকে, তাহলে পুরো ঘরসুদ্ধ ওলটপালট করার কি দরকার ছিল? লুকানোর জায়গাটা তো ওদের চেনার কথা।'

একটু চুপ করে থেকে ববি বলল, 'সে লোক হয়তো নিজে আসেনি, অন্য কাউকে পাঠিয়েছে। দেখি, পামারের কাছ থেকে ওর খদ্দেরদের লিস্টটা নিতে হবে।' ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেল ববি। 'যে ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম—বাগানবাড়িটার মালিকের পরিচয় উদ্ধার করেছি। এক আরব শেখ ওটার মালিক, মাঝে মাঝে পরিবার নিয়ে এসে থাকে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা বড় কড়া, কিডন্যাপারের ভয়ে এরা তটস্থ থাকে।'

'কালো গাড়িতে যারা ছিল, তারা কিছুতেই আরব হতে পারে না।'

'আমি জানি। আরব শেখ এখন এখানে নেই। সে যে কয়মাস দেশে থাকে, সে কয়মাস বাড়িটা ভাড়া দেয়া থাকে। সম্পত্তিটা বিক্রি করে দিতে চাইছে শেখ। তবে বর্তমান ভাড়াটের পরিচয় উদ্ধার করতে পারিনি আমি এখনও।'

'তার মানে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সে তিমিরেই আছি,' হতাশকণ্ঠে বলল স্বাতী। তারপর কেইমেন ব্র্যাকের ঘটনাগুলোও খুলে বলল একে একে। সাদা-চুলো লোকটার চেহারার বর্ণনা দিল।

'অবাক কাণ্ড!' চিন্তিত ভঙ্গিতে ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছল ববি। 'আপনাকে ভয় দেখিয়ে কার কি লাভ!'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন।'

'এখানে একা একা থাকতে অসুবিধা হলে বলুন, আমার বোনকে ফোন করে দিই। বেশ বড় বাড়িতে থাকে সে, অতিথি হিসেবে আপনাকে পেলে খুশিই হবে।'

'না না, একা থাকতে আমার ভয় করবে না। তবুও বলার জন্যে ধন্যবাদ। আপনি কি ভাবছেন আজকের ব্যাপারটার সঙ্গে আগের ঘটনাগুলোর যোগ আছে?'

'হতে পারে আপনার ঘর ভেবে ভুল করে ডক্টর মাহমুদের ঘরে ঢুকে পড়েছে

গেল। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। মন্দ লোকেরা এধরনের ভুল করে না।'

দিনের বাকি সময়টা আসিফের জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলতে তুলতেই কেটে গেল। বেলা মেইডও যথেষ্ট সাহায্য করেছে ঘরটা পরিষ্কার করে তুলতে। বাথরুমে আফটার শেভ, কোলন আর পারফিউমের শিশিগুলো ভেঙে রেখে গেছে ওরা। এমনকি টুথপেস্টটাকেও কেটে ভেতরের পেস্টটুকু টিপে টিপে বেসিনে ঢেলে দিয়েছে। নিশ্চয়ই খুব ছোট কিছু একটা খুঁজেছে। কিন্তু পেয়েছে কি? ববির অনুমানও সত্যি হতে পারে, ঘটনাটার সঙ্গে হয়তো আসিফের কোন সম্পর্কই নেই। খোদা, তাই যেন হয়।

কোন ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল পরের ক'টা দিন। সমুদ্রে সাঁতার কেটে, গল্পের বই পড়ে, ঘুমিয়ে আর রান্না করে আলস্যে সময় কেটে গেল। এর মধ্যে বাজার করার জন্যে একদিন শহরে গিয়ে দোকানের শো-কেসে ভারি সুন্দর ঝিনুকের কাজ করা সোনার একটা টাই-পিন দেখে আসিফের জন্যে কিনে ফেলল। যত সময় কাটছে, ততই ওকে এক নজর দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে স্বাতী। এক একটা দিন এক একটা বছরের মত লম্বা মনে হচ্ছে। ভবিষ্যতের স্বপ্নমাখা কল্পনার রঙিন জাল বুনতে শুরু করেছে স্বাতী, আসিফের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে দেহমন।

## তেরো

গাড়ির শব্দ শুনে জানালা দিয়ে উঁকি দিল স্বাতী। পরিচিত লাল ডাইনাস্টি—আসিফ! উত্তেজনায় একটা হার্টবিট মিস করল, অবশ হয়ে এসেছে হাত-পা। লম্বা করে শ্বাস নিয়ে এক দৌড়ে বাইরে চলে এল স্বাতী।

হাতের ব্যাগটা সিঁড়িতে ছুঁড়ে ফেলে মুখোমুখি দাঁড়াল আসিফ, আলতো

করে স্বাতীর চুলের অরণ্যে হাত ছোঁয়াল। 'কেমন ছিলে, স্বাতী? উঃ! কতদিন তোমাকে দেখি না!'

আবেশে দু'চোখ বুজে এল, ফিসফিস করে স্বাতী বলল, 'মাত্র চারদিন। তোমার কাজ শেষ হয়েছে তো?'

'স্বাতী স্বাতী স্বাতী!' বিড়বিড় করে বারবার ওর নামটা উচ্চারণ করল আসিফ। 'তুমি কি জাদু জানো? এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে ভুলে থাকতে পারিনি!' তারপর হঠাৎ করে কিছু মনে পড়ে যেতে লাফিয়ে উঠল, 'ওহ্ হো! একদম ভুলে গেছি···একটু দাঁড়াও তো, এক্ষুণি আসছি।' গাড়ির দিকে দৌড়াল আসিফ। বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। উস্কখুস্ক চুলে চিরুনি পড়েনি, রোদে পুড়ে তামাটে দেখাচ্ছে মুখ আর হাতের ত্বক, সর্বাঙ্গে অবসাদের চিহ্ন—বড় মায়া হলো স্বাতীর। দেখেই বোঝা যাচ্ছে গত ক'দিন একটুও অবসর পায়নি বেচারা।

বাদামী কাগজে মোড়া বড়সড় একটা প্যাকেট বের করে নিল আসিফ গাড়ির ট্রাঙ্ক থেকে। হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি আজ আমার অতিথি, দুপুরের নিমন্ত্রণ রইল।' তারপর প্যাকেটের ভেতরে হাত গলিয়ে সতেজ ভায়োলেটের একটা তোড়া বের করে স্বাতীর হাতে তুলে দিল। বলল, 'আর এটা আমার সম্রাজ্ঞীর জন্যে।'

চোখ বুজে ফুলের অরণ্যে মুখ ডুবাল স্বাতী, অস্ফুটে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'ও হ্যাঁ, হিলডা কেমন আছে?'

চমকে উঠল স্বাতী। নিজের উপরে রাগ হলো। প্রথমেই আসিফকে সেদিনের ব্যাপারটা জানানো উচিত ছিল। অথচ ওকে দেখামাত্রই জাগতিক সবকিছু বেমালুম ভুলে গেছে সে। 'হিলডা ভালই আছে···ক্লজিটে···কিন্তু···'

আসিফ ততক্ষণে হিলডার খোঁজে ভেতরে রওনা হয়েছে। উদ্বিগ্নকণ্ঠে জানতে চাইল, 'কি হয়েছে, স্বাতী? সবকিছু ঠিক আছে তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরো ঘটনাটা খুলে বলল স্বাতী। 'আমরা যতটুকু পেরেছি পরিষ্কার করেছি। রিচার্ড পামার দেয়ালগুলো রঙ করিয়ে নতুন ফার্নিচার দিয়েছে। জামাকাপড় যে ক'টা আস্ত ছিল সেগুলো লনড্রি থেকে ধুইয়ে এনেছি।'

গুম হয়ে শুনল আসিফ। স্বাতীর কথা শেষ হলে শুধু বলল, 'এতই খারাপ অবস্থা!'

'ইনভেস্টিগেশনের জন্যে ববি কিছু ছবি তুলেছিল, গতকাল সেগুলো দিয়ে

গেছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।'

আসিফ যখন ছবিগুলো দেখছে, স্বাতী তখন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে ওর প্রতিক্রিয়া। অবিশ্বাস, দুঃখ কিংবা আঘাত পাবার কোনরকম লক্ষণ দেখা গেল না। বরঞ্চ রাগে অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল আসিফের রোদে পোড়া চেহারা, প্রতিশোধের ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে দু'চোখে। শিউরে উঠল স্বাতী—আসিফ জানে এর জন্যে কারা দায়ী!

দু'হাতে মুখ ঘষল আসিফ। 'তোমার উপর দিয়ে নিশ্চয়ই খুব ধকল গেছে, আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।'

'ও কিছু না। পামারের দলবলই সব করেছে। কিন্তু তোমার ঘরে তো কোন কাগজপত্র দেখলাম না!'

'কিসের কাগজপত্র?' তীক্ষ্ণচোখে তাকাল আসিফ।

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল স্বাতী। 'সেই যে এয়ারপোর্টে ব্রিফকেস থেকে পড়ে গিয়েছিল!'

'ওহ্! হিউগোর ডেটা!' একটু ইতস্তত করল আসিফ। 'ওগুলো ড্যানের জাহাজে নিরাপদেই আছে। কিন্তু হঠাৎ জেরা করতে শুরু করেছ কেন? মনে হচ্ছে কিছু একটা চিন্তা করছ?'

'ববি বলছিল এটা সাধারণ চুরি-ডাকাতির ঘটনা নয়। ওরা প্রফেশনাল লোক, বিশেষ কিছু একটা খুঁজছিল।'

'তো?' একদৃষ্টে চেয়ে আছে আসিফ।

'লুকানোর মত তোমার কি কিছু আছে?'

'কার নেই?' একটু হাসার চেষ্টা করল আসিফ।

'অন্য কারও কথা হচ্ছে না, তোমার কথা হচ্ছে।'

'তোমাকে তো বলেছি অনেকেই আমার গবেষণার ব্যাপারে আগ্রহী।'

'আর সেজন্যে ওরা তোমার টুথপেস্টের টিউব কাটবে!'

রাগে আসিফের দু'চোখ জ্বলে উঠল। 'কি বলতে চাও সরাসরি বলো!'

'তুমি কি বেআইনী কিছু করছ?' শান্তভাবেই প্রশ্ন করল স্বাতী।

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আসিফ, রাগে অপমানে নীল হয়ে উঠেছে। বাকশক্তি ফিরে পেয়ে দু'পা এগিয়ে এল। 'আশ্চর্য! আমার প্রতি তোমার এই ধারণা! তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলাই ভুল হয়েছে তোমার!'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল আসিফ।

নিজের ঘরে এসে গুম হয়ে বসে রইল, শেষ পর্যন্ত স্বাতীও ওকে ভুল বুঝল! আর কিছু না, ওকে ক্রিমিনাল ভেবে নিল? যাকে ঘিরে এত আশা, এত স্বপ্ন—সেই কিনা এভাবে আঘাত করল! ধীরে ধীরে রাগ কমে আসতে চিন্তাশক্তিও পরিষ্কার হতে শুরু করল। স্বাতী এমন কিছু অপরাধ করেনি। ও নিজেই প্রথম থেকে মিথ্যে বলেছে, সন্দেহ করার পুরোপুরি অধিকার স্বাতীর রয়েছে । স্বাতী বুদ্ধিমতী মেয়ে, রহস্যময় ঘটনাগুলোর সঙ্গে ওর যোগাযোগ আবিষ্কার করা স্বাতীর পক্ষে খুব একটা কঠিন হয়নি। প্রথম থেকে সবকিছু খুলে না বলাটা বোকামি হয়েছে। তারচেয়েও বড় বোকামি হয়েছে স্বাতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া, এখন স্বাতীর মাথার উপরও ঝুলছে বিপদের খাঁড়া। সব বিপদ থেকে ওকে রক্ষা করতে হবে, এ মুহূর্তে এটাই সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় টেপের খোঁজেই ঘরটা তোলপাড় করা হয়েছে। তার মানে আসিফকে আর বিশ্বাস করছে না ওরা। উঠে দাঁড়াল আসিফ, স্বাতীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

আসিফ বেরিয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে রইল স্বাতী। আসিফ এভাবে রেগে উঠবে তা ও কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ একটু আগেই কিনা প্রেমে গদগদ করছিল। আশ্চর্য! বিনা নোটিসে হঠাৎ হঠাৎ এমন অভদ্র ব্যবহার করার অর্থটা কি? একটু চিন্তা করতেই স্বাতী বুঝতে পারল কোথায় ওর ভুল হয়েছে। এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, খবরটা শুনেই তো আসিফের মুষড়ে পড়ার কথা। এসময় সবাই প্রিয়জনের কাছ থেকে সহানুভূতি আশা করে। অথচ তার বদলে স্বাতী কিনা উল্টে ওকেই দোষারোপ করতে শুরু করেছে! ছি! নিজেকে বড় ছোট মনে হতে লাগল।

বাদামী কাগজে মোড়া প্যাকেটটা খাবার টেবিলে রেখে গেছে আসিফ, পাশেই ভায়োলেটের গুচ্ছটা। পরম আদরে ফুলগুলোর কোমল পাপড়িতে হাত বুলাল স্বাতী। তারপর বাদামী কাগজ ছিঁড়ে বের করে আনল কার্ডবোর্ডের শক্ত একটা বাক্স। ঢাকনাটা খুলতেই সুগন্ধে জিভে পানি চলে এল। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মোড়া তিন রকমের কাবাব, মোগলাই পরোটা আর নান রুটি। প্লাস্টিকের পাত্রে কিছুটা পায়েস পর্যন্ত আছে। স্বাতীর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল।

একদিন কথায় কথায় স্বাতী বলেছিল ওর প্রিয় খাবার কাবাব আর মোগলাই পরোটা, আসিফ সেকথা মনে রেখে দিয়েছে। কিন্তু এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে এতসব জোগাড় করল কোত্থেকে?

অনুশোচনায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে। ওকে একটু খুশি করার জন্যে না জানি কত ঝামেলা পুইয়েছে বেচারা, অথচ ঘরে পা দিতে না দিতে স্বাতী ওকে জেরা করতে শুরু করেছে! নাহ্, এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। এক্ষুণি হাতজোড় করে আসিফের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

ঘুরে দাঁড়াতেই আসিফের মুখোমুখি হয়ে গেল। অপ্রস্তুত হয়ে হাসল স্বাতী, 'আমি এক্ষুণি তোমার ঘরে যাচ্ছিলাম ক্ষমা চাওয়ার জন্যে।'

'না, আমারই দোষ হয়েছে,' কাঁচুমাচু হয়ে বলল আসিফ। 'তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার কোন অধিকার আমার নেই। যত ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পারো তুমি, আমি একটুও রাগ করব না।'

'না, আসিফ। আমার কোন প্রশ্ন নেই। ববি বলছিল আগের কোন গেস্ট হয়তো কিছু লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। সেরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। ওই কটেজটা তোমার না হয়ে আমারও হতে পারত।'

ভারি সুন্দর করে হাসল আসিফ। 'সত্যি করে বলো তো, ওই খাবারের বাক্সটা দেখেই কি তোমার মন গলে গেছে?'

'অস্বীকার করার কোন উপায় নেই,' হেসে উঠল স্বাতী। 'কিন্তু এতসব যোগাড় করলে কোত্থেকে?'

'ক'দিন ধরেই খবর নিচ্ছিলাম এখানকার কোন হোটেলে পাকিস্তানী বা ভারতীয় শেফ আছে। অবশেষে পেয়েও গেলাম। হিলটনেই আছে দু'জন। গতকাল অর্ডার দিয়ে রেখেছিলাম। সকালে গ্র্যাণ্ড কেইমেনে নেমেই হিলটনে চলে গিয়েছিলাম, বাক্সটা তুলে নিয়ে সোজা এখানে। তুমি খুশি হয়েছ তো?'

'আমার জন্যে কেউ কখনও এতটা করেনি,' অস্ফুটে বলল স্বাতী। দু'চোখের পাতা ভিজে এল। দ্রুত সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে টেবিলে প্লেট-গ্লাস সাজাতে লাগল। 'দেরি করে লাভ কি? শুরু করে দিলেই হয়।'

## চোদ্দ

খাবার পরে দু'কাপ কফি বানাল স্বাতী। কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'তোমার প্রিয় নারীকে তুমি উপেক্ষা করছ, আসিফ।'

'কেমন করে? সে তো আমার পাশেই আছে।'

'ভাগ্যিস, হিলডা অতদূর থেকে তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে না।'

'ভাল কথা মনে করেছ, ওর খবর নেয়া দরকার।' হিলডার খোঁজে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল আসিফ।

এঁটো থালাবাসন সিঙ্কে রেখে মিনিট দু'য়েক পর স্বাতীও ওকে অনুসরণ করল। সামনে ঝুঁকে হিলডার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট ক্যাসেট বের করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে দেখল আসিফকে।

'ওর মগজ চুরি করছ নাকি?' পরিহাস ছলে জানতে চাইল স্বাতী।

'আরে, না!'

'হিলডাকে কিভাবে অ্যাকটিভেট করতে হয়, আমাকে শিখিয়ে দেবে?' পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়ল স্বাতী।

ওর আগ্রহে খুশি হলো আসিফ। 'প্রথমেই কোডগুলো মুখস্থ করে নিতে হবে।' কী-বোর্ডের বোতামে আঙুল চালাতে চালাতে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল কোনটার কি কাজ। হিলডার সারা গায়ে আলো জ্বলে উঠতে বলল, 'হ্যালো, হিলডা।'

'হাই, আসিফ,' কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে প্রতিসম্ভাষণ জানাল হিলডা। 'সর্বশেষ যোগাযোগের পর অতিবাহিত সময় ঃ ছয় দিন, পাঁচ ঘণ্টা, ত্রিশ মিনিট, পনেরো সেকেণ্ড।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল স্বাতী। 'নিজের চোখে দেখার পরেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়! এতকিছু করার জন্যে কিভাবে ওকে প্রোগ্রাম করেছ?'

'এমন কিছু জটিল ব্যাপার নয়, উপযুক্ত ট্রেনিঙ পেলে তুমিও করতে পারবে। অবশ্য এতদূর আসতে হিলডাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কলেজের বিজ্ঞানমেলায় যোগ দেবার জন্যেই প্রথমে হিলডাকে তৈরি করেছিলাম। অবশ্য তখন পুরো ব্যাপারটাই ছিল ফাঁকিবাজি। একটা রিমোট-কনট্রোল্ড্ খেলনা, যার ভেতরে লুকানো ছিল একটা মাইক। তারপর ধীরে ধীরে কমপিউটার সম্পর্কে জানতে থাকলাম আর হিলডাকে একটু একটু করে গড়ে তুলতে লাগলাম।' বলতে বলতে রোবটটার দিকে ফিরল আসিফ, 'হিলডা, স্বাতী তোমার বন্ধু হতে চায়।'

'বন্ধু,' রিপিট করল হিলডা, 'বয়স্য। দোস্ত। ইয়ার। ফ্রেণ্ড। আমি। অ্যামিগো। আরও পাঁচটি ভাষায় ''বন্ধু''-র সমার্থক শব্দ জানতে চাইলে ''এন্টার'' বোতামে চাপ দাও।'

'নেগেটিভ,' বলল আসিফ।

'মনে হয় ও আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে,' ঠোঁট টিপে হাসল স্বাতী। 'দেখি, বরফ গলাতে পারি কিনা। আচ্ছা, হিলডা, আসিফ সকালে কি করে?'

মৃদু গুঞ্জন তুলে হিলডার বুকে কয়েকটা লাল-নীল বাল্ব মিটমিট করে জ্বলে উঠল। 'আসিফ মাহমুদের প্রাতঃকালীন দিনপঞ্জী। সকাল সাতটা ঃ ঘুম-ভাঙানী ডাক। গাত্রোত্থান না করলে আর একবার ঘুম-ভাঙানী ডাক। সকাল সাড়ে সাতটা ঃ বিছানায় কফি পরিবেশন। শায়িত দেহে জোরে ঝাঁকুনি। জোরপূর্বক হাতে কফির কাপ সমর্পণ। পরবর্তী বর্ণনা অনুরোধ সাপেক্ষ।'

'উহ্!...ওর কোন তুলনা হয় না!' হাসতে হাসতে স্বাতীর দমবন্ধ হয়ে এল।

হাসছে আসিফও। 'ওকে হাঁটাই?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' উৎসাহে সোজা হয়ে বসল স্বাতী।

'হিলডা, তিন ফুট সামনে এগিয়ে ডান দিকে এক পাক ঘুরে আবার আগের জায়গায় ফিরে যাও।'

অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করল হিলডা। খুশিতে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে উঠল স্বাতী।

'ধন্যবাদ,' বলল হিলডা।

স্বাতীর উদ্দেশ্যে চোখ টিপল আসিফ। 'মনে হচ্ছে ও তোমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে।'

'আর কি কি করতে পারে ও?'

'চিটাগাঙের বাড়িতে অনেক কিছুই করতে পারে। দাঁড়াও, তোমাকে দেখাই কিভাবে প্রোগ্রামগুলো অ্যাকটিভেট করতে হয়।' বিশেষ কয়েকটা বোতামে চাপ দিতেই মনিটরে নাম্বার দেয়া প্রোগ্রামের নাম সহ মেন্যু ভেসে উঠল। 'যে প্রোগ্রামটা চাও, তার পাশে লেখা নাম্বারটা চাপ দিলেই সেটা অ্যাকটিভেট হয়ে যাবে।'

পড়তে শুরু করল স্বাতী, 'ল্যাঙ্গোয়েজ সাবরুটিন, রিলেশনাল এক্সপ্রেশন, মেমরি ম্যাপ, সিকোয়েনশিয়াল ফাইল...ও বাবা! এসব কি?...বুঝতে পারছি না তো কিছুই...আরে, এই তো একটা পরিচিত শব্দ পেয়েছি। অ্যালার্ম সিস্টেম। এটা কি?'

'ওটা হিলডার প্রিয় কাজ। সাধারণত বাড়ির বাইরে যাবার সময় প্রোগ্রামটা অ্যাকটিভেট করে যাই, চুরি-ডাকাতি ঠেকানোই এর উদ্দেশ্য। বিনানুমতিতে তখন কেউ ঘরে ঢুকতে চাইলে হিলডা হামলে পড়ে। প্রথমে সে আগন্তুকের আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার জানতে চায়, সেটা না পেলে তীক্ষ্ণ সুরে অ্যালার্ম বাজিয়ে দিয়ে চিৎকার করতে থাকে, "এক্ষুনি বেরিয়ে যাও! এক্ষুনি বেরিয়ে যাও! নাহলে গুলি করা হবে।" অবশ্য গুলি করার ব্যাপারটা ভাঁওতাবাজি। একদিন আমার এক বন্ধুকে বাসার চাবি দিয়ে একটা জিনিস নিয়ে আসতে পাঠিয়েছিলাম, হিলডার অতর্কিত আক্রমণে তার হার্টফেল করার যোগাড় হয়েছিল। অবশ্য আমারই ভুল হয়েছিল, ওকে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'এই আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা কি?'

'একটা বিশেষ সংখ্যা, ওটা হিলডাকে বললেই অ্যালার্ম সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায়। তোমাকেও জানিয়ে দেব, যাতে কোন ঝামেলায় না পড়ো।'

'আমি কিন্তু সত্যিই তোমার গুণমুগ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছি,' পিছনে হেলান দিয়ে মৃদু হাসল স্বাতী, চোখে গাঢ় শ্রদ্ধা।

'সেই প্রথমদিন থেকে তো তোমাকে মুগ্ধ করার চেষ্টাই করে যাচ্ছি। তাহলে সফল হয়েছি শেষ পর্যন্ত!'

আসিফ ফিরেছে শুনে বিকেলে সার্জেন্ট ববি দেখা করতে এল। জানাল, অপরাধীদের ধরার ব্যাপারে কিছুই করতে পারেনি সে। তবে স্থানীয় লোকদের

কাজ নয় এটা নিশ্চিত। আসিফের কাছ থেকেও নতুন কোন তথ্য না পেয়ে একটু দমে গেল। তবে হিলডাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ববি।

যাবার সময় আসিফের হ্যাণ্ডশেক করে বলল, 'যদি কখনও হিলডার উপর থেকে মন উঠে যায়, আমাকে একটা খবর দেবেন। আমি ওকে দত্তক নেব।'

'ঠিক আছে, মনে থাকবে,' হাসল আসিফ। 'কষ্ট দেবার জন্যে দুঃখিত। আমাদের মত এমন ঝামেলার ট্যুরিস্ট বোধহয় আপনি কস্মিনকালেও দেখেননি।'

'কি যে বলেন! একবার এক আমেরিকান বুড়ি রিপোর্ট করল তার কুকুরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। দু'দিন ধরে সারা দ্বীপ তোলপাড় করে ফেলার পর জানা গেল বুড়ির কোন কুকুরই ছিল না। বুঝুন!'

তিনজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে।

ববি চলে যাবার পর চিন্তিত ভঙ্গিতে স্বাতীর দিকে তাকাল আসিফ। 'আমার মনে হয় হিলডা তোমার ঘরে থাকলেই ভাল হবে। বলা যায় না, তোমার ঘরেও ওরা আক্রমণ চালাতে পারে। আর কিছু না হোক হিলডাকে দেখলে ওদের পিলে চমকে যাবে। তাছাড়া বাইরে যাবার সময় ওর অ্যালার্ম সিস্টেমটা অ্যাক্টিভেট করে দিয়ে যাব এখন থেকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন জানাল স্বাতী।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পর্চে আসিফের গাড়িটা দেখতে পেল না। এত সকালে গেল কোথায়? শহর থেকে কেনা টাই-পিনটা যত্ন করে র‍্যাপ করল, ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিল ঠিক সময়ের অপেক্ষায়।

এক কাপ কফি বানিয়ে হিলডাকে নিয়ে পড়ল স্বাতী, দেখতে চায় গতকাল আসিফ যা শিখিয়েছিল তা মনে আছে কিনা। ঠিক দু'মিনিটের মাথায় জ্যান্ত হয়ে উঠল হিলডা। খুশিতে লাফিয়ে উঠল স্বাতী, 'এসো, আমার সঙ্গে বারান্দায় চলো। গল্প করতে করতে চা খাওয়া যাবে।'

দরজা খুলে ধরতে হিলডা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এল বারান্দায়। বাধ্য মেয়ের মত দাঁড়াল স্বাতীর চেয়ারের ঠিক পাশে। কয়েকটা বোতাম চাপ দিয়েও যখন কাজ হলো না, অধৈর্য হলো স্বাতী, 'কি ব্যাপার! মেন্যু আসছে না কেন!'

'একসঙ্গে শিফট আর সি-টেন চাপ দাও,' বলে উঠল হিলডা।

'ইশ্! তোমার কোন তুলনা হয় না!' স্ক্রীনে মেন্যু ভেসে উঠতে বিস্ময় আর আনন্দে হিলডাকে জড়িয়ে ধরল স্বাতী। 'এখন আমরা দুই বন্ধুতে মিলে আড্ডা মারব, কেমন?'

মেন্যুর নির্দেশ অনুযায়ী প্রশ্ন করার জন্যে এম-ফোর চাপ দিল স্বাতী। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, হিলডা, আসিফ আমার সম্বন্ধে কি বলে?' অকারণেই লাল হয়ে উঠল স্বাতী।

'অবান্তর প্রশ্ন।'

'তুমি আমাকে হিংসে করছ, তাই না?'

'আবারও বলছি, অবান্তর প্রশ্ন। নতুন করে প্রশ্ন করো।'

'ধ্যাৎ! তোমার মাথায় ঘিলু বলতে কিচ্ছু নেই। তারচেয়ে এসো, আমরা তাস খেলি। কি খেলবে? পোকার না ব্ল্যাকজ্যাক?'

'খেলার আগে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চেক করে নাও।'

হাসতে হাসতেই স্বাতী গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। হয়তো আসিফ ফিরেছে। কিন্তু সামনে না থেমে গাড়িটা কটেজের পেছনে চলে এল। প্রচণ্ডগতিতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। মুখ তুলে পরিচিত কালো রঙের গাড়িটাকে দানবের মত এগিয়ে আসতে দেখে লাফিয়ে চিৎকার করে উঠল স্বাতী। ফুলের বাগান মাড়িয়ে বারান্দার ঠিক নিচে আচমকা থেমে পড়ল গাড়িটা, দু'দিকে দরজা খুলে দু'জন লোক নেমে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে আসছে।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে দেরি করে ফেলল স্বাতী। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে হিলডাকে আড়াল করতে চাইল, ঠিক যেভাবে মা শিশুকে বিপদ থেকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু ষণ্ডামার্কা লোক দু'জন সহজেই দু'দিক থেকে হাত মুচড়ে ধরে কাঠের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল ওকে। শক্ত করে চেপে ধরে রাখল মেঝের সঙ্গে। ওদিকে আরও দু'জন লোক নেমে এসে হিলডাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে দৌড় দিল।

হিলডা কাতরস্বরে চিৎকার করছে, 'বাচাও! বাঁচাও!' ঠিক যেন কোন শিশুর আর্তনাদ!

হিলডা আর চারজন লোক সহ গাড়িটা যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবেই উধাও হয়ে গেল। পিছু পিছু দৌড়েও কোন লাভ হলো না।

হাঁপাতে হাঁপাতে কটেজে ফিরে এল স্বাতী। ফোন তুলে দ্রুত ডায়াল করল পুলিশ স্টেশনের নাম্বারে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা ডিসপ্যাচারের গলা শোনা গেল।

'তাড়াতাড়ি করুন···আমি সার্জেন বরির সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল স্বাতী, 'আমার নাম স্বাতী চৌধুরী।'

'সার্জেন্ট তো পেট্রোল কারে আছে, ঠিক কি ধরনের সাহায্য দরকার আপনার?'

'একটা কিডন্যাপ হয়েছে,' ঢোক গিলল স্বাতী।

'দাঁড়ান,' উত্তেজিত শোনাল মহিলার কণ্ঠস্বর। 'আমি এক্ষুণি সার্জেন্টকে রেডিওতে যোগাযোগ করছি।' ত্রিশ সেকেণ্ড পর মহিলা লাইনে ফিরে এলেন, 'কাকে এবং কোত্থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?'

'দশ নাম্বার সানিসাইড রিয়ালটি থেকে হিলডা নামের একজনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। সার্জেন্ট তাকে চেনেন।'

বিশ সেকেণ্ড পর আবার মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল, 'সার্জেন্ট জানতে চাইছে কিডন্যাপারদের পরিচয় জানেন কিনা।'

'ওকে বলুন পুরানো সেই কালো গাড়িটায় করে চারজন লোক এসেছিল···বাগানবাড়ির চারপাশটা ভাল করে যেন একবার দেখে আসে···ওকে বললেই বুঝবে।'

একটু বিস্ময়মাখা কণ্ঠে মহিলা বললেন, 'সার্জেন্ট আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই যোগাযোগ করবে।'

'ধন্যবাদ,' বলে ফোন নামিয়ে রাখল স্বাতী।

বাইরে গাড়ি থামার শব্দ পেয়ে একছুটে পর্চে বেরিয়ে এল। আসিফ। স্বাতীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আসিফ বুঝল খারাপ কিছু ঘটেছে। দৌড়ে এসে ওর দু'কাঁধ আঁকড়ে ধরল, 'কি হয়েছে, স্বাতী? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'হিলডা!' ফুঁপিয়ে উঠল স্বাতী, 'কারা যেন ওকে কিডন্যাপ করেছে!'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আসিফ, 'কি বলছ?'

'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, আসিফ। আমি কিছু করতে পারিনি। আমি জানি ওকে তুমি কতটা ভালবাস,' হু হু করে কেঁদে ফেলল স্বাতী।

মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিল আসিফ। 'বোকা মেয়ে, আমি হিলডার জন্যে চিন্তা

করছি না। আমার নিজের উপর রাগ হচ্ছে তোমাকে একা রেখে গিয়েছিলাম বলে। হিলডা না হয়ে তুমিও কিডন্যাপ্‌ড্‌ হতে পারতে, সেটা ভেবেছ?'

'কিন্তু ওরা তো হিলডাকেই নিয়ে গেল! আমার দোষেই এমন হলো···কেন যে ওকে বারান্দায় নিয়ে গেলাম! তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে তো?'

'হিলডাকে ওরা চুরি করতে পারেনি, স্বাতী। শুধু ওর খোলসটা চুরি করেছে। ওর মস্তিষ্কটা আবার পুনর্গঠন করা যাবে, ওটা তেমন কঠিন কিছু না। বুঝতে পেরেছ? তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই, ওরা যা চেয়েছিল তা পায়নি।'

'তার মানে তুমি জানো কারা কিডন্যাপ করেছে,' চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল স্বাতী।

'আঁচ করা কঠিন কিছু না। সেই রাতের অতিথিদের কাণ্ড বলেই মনে হচ্ছে। আমাকে ভয় দেখাচ্ছে ওরা।'

'কিন্তু আমি যে হিলডার আর্তনাদ এখনও শুনতে পাচ্ছি! উঁহ্‌! ও আমার সাহায্য চাইছিল, কিন্তু আমি কিছুই করতে পারিনি!'

মিনিট দশেকের মধ্যেই ববি চলে এল। বাগানবাড়ি চক্কর দিয়েও সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায়নি, গেটের সামনে বা বালিতে গাড়ির চাকার দাগ নেই। 'আমার মনে হয় ওরা ডকের দিকে গেছে। আমি এক্ষুণি থানায়···'

'দয়া করে আর ঝামেলা বাড়াবেন না,' হঠাৎ করেই আসিফ বলে উঠল। 'এমনিতেই আপনাকে অনেক জ্বালিয়েছি আমরা। আমার মনে হয় ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভাল।'

'কিন্তু এটাই তো আমার চাকরি,' অবাক হলো ববি।

'প্লীজ, একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আমি আর ঝামেলা বাড়াতে চাই না।'

'ঠিক আছে, আপনার রোবট, আপনি বুঝবেন।' শ্রাগ করে বেরিয়ে গেল ববি।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো স্বাতীর। আসিফের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবাক কণ্ঠে বলল, 'ব্যাপার কি, আসিফ? হঠাৎ কি হলো তোমার?'

'এভাবে বার বার পুলিশকে হয়রানি করতে একদম ভাল লাগছে না!' দু'পাশে হাত ছড়িয়ে বিরক্তির ভঙ্গি করল আসিফ। 'তার চেয়ে চলো আমরা নিজেরাই দ্বীপের আনাচে-কানাচে অনুসন্ধান চালাই।'

একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়ে নিল স্বাতী। আসিফের সিদ্ধান্ত মন থেকে মেনে নিতে পারছে না।

দুপুর দুটো পর্যন্ত সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গা চষে ফেলল ওরা। কিন্তু কালো গাড়িটার পাত্তা পাওয়া গেল না। খাবার রুচি না থাকা সত্ত্বেও আসিফের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে একটা রেস্টোরান্টে থেমে অল্প কিছু মুখে দিতে হলো।

'মুখ গোমড়া করে আছ কেন, মেয়ে? একটু হাসো তো দেখি!' রুটিতে মাখন লাগিয়ে স্বাতীর প্লেটে তুলে দিল আসিফ।

'ধ্যাৎ, ফাজলামি কোরো না তো!' আধখাওয়া মুরগীর ফ্রাইসহ প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে দিল স্বাতী। 'হিলডার কান্না এখনও আমার কানে বাজছে!'

'আরে, বলেছি তো আর একটা হিলডা বানিয়ে দেব।'

'তোমার জীবনের সব মেয়েদের জন্যেই কি তোমার এইরকম মায়া?'

'না, শুধু যাদের একাধিক মগজ রয়েছে, তাদের জন্যে।'

ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল স্বাতীর শুকনো ঠোঁটে, 'উহ্! বাঁচালে! তাহলে আর আমার ভয় নেই।'

কটেজে ফিরে ওরা দেখল ববি ওদের জন্যে পর্চে অপেক্ষা করছে। দৌড়ে এল সে, 'এই যে এসে গেছেন, ভাল খবর আছে। এই কিছুক্ষণ আগে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে থানায় ফোন করে বলেছে ওরা অদ্ভুত একটা মেশিন কুড়িয়ে পেয়েছে সৈকতে।'

আসিফের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বাতী মনে মনে ভাবল, এতক্ষণ ধরে নির্লিপ্তের অভিনয় করতে না জানি বেচারার কত কষ্ট হয়েছে! আসিফ জানতে চাইল, 'ওরা এখন কোথায়?'

'আমার গাড়িতে উঠে পড়ুন আপনারা, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।'

'আপনার জরুরী কোন কাজ পড়ে নেই তো?'

'হ্যাঁ, জরুরী কাজে যাই আর আমার চাকরিজীবনের একমাত্র আসল-কিডন্যাপিং কেসের সমাপনী দৃশ্যটা মিস করি!'

হাইওয়ে ধরে সমুদ্রের ধারে নির্জন একটা জায়গায় চলে এল ওরা। আশেপাশে জঙ্গুলে জলাভূমি, লোকজন দেখা যাচ্ছে না।

হাইওয়ে ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে এল ওরা। ববি বলল, 'মনে হচ্ছে বোট নিয়ে কেউ কিডন্যাপারদের জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিল। হয় অন্য কোন

দ্বীপে চলে গেছে না হয় কোন জাহাজ বা ইয়াটে।'

'অরোরা,' অস্ফুটে বলে উঠল স্বাতী। 'আপনাকে ইয়াটটার কথা বলেছিলাম, মনে আছে? চার্লি—মানে যে ইয়াটটা চেনে, সেই ওয়েইটারটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় না?'

'ভাল কথা মনে করেছেন। আজই খবর নিয়ে দেখব সে এখনও গ্র্যাণ্ড কেইমেনে আছে কিনা,' বলতে বলতে আড়চোখে আসিফের দিকে তাকাল ববি, 'অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

আসিফ শ্রাগ করল, 'যা ভাল মনে করেন।'

দশ-বারো বছর বয়সের সাত-আটজন বাচ্চা ছেলে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ববি গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে গেল। 'তোমরাই থানায় ফোন করেছিলে?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আঙুল তুলে একটা ঝোপের দিকে ইঙ্গিত করল ওরা। ছেলেদের পিছু পিছু ঝোপের কাছে চলে এল ওরা তিনজন। ডালপালা সরাতেই দেখা গেল উল্টে পড়ে আছে হিলডা। কাদায় মাখামাখি, ছেঁড়া তার ঝুলছে শরীরের এখানে ওখানে, বেশ কয়েকটা বাল্ব ভেঙে গেছে। 'আমরা এটা পেয়েছি, তারপর পুলিশে ফোন করেছি রাস্তার ওপারের একটা দোকান থেকে,' ছেলেদের দলের সর্দার জানাল।

'দারুণ কাজের ছেলে তোমরা!' ওর পিঠ চাপড়ে দিল আসিফ। পকেট থেকে ওয়ালেট বের করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'সবাই মিলেই খেলা করছিলে এখানে?'

'না, আমরা দু'জন ওকে দেখেছি প্রথমে। ওরা সবাই পরে এসেছে।' একটু ইতস্তত করে কিশোর বলল, 'আমরা রোবটটা রেখে দেই? ওটা তো নষ্ট হয়ে গেছে।'

মাথা নাড়ল আসিফ, 'দুঃখিত। তোমাদের রোবট তোমাদের নিজেদেরই তৈরি করতে হবে।' প্রত্যেকের হাতে আলাদা করে কিছু ডলার দিয়ে বলল, 'যদি উৎসাহ থাকে, তাহলে এই টাকা দিয়ে দোকান থেকে রোবট-কিট্ কিনে এনে নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবে।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' খুশিতে লাফিয়ে উঠল ছেলেরা।

পরম যত্নে হিলডাকে তুলে নিয়ে ধুলোবালি ঝাড়তে থাকল আসিফ। 'ঠিক

না পেয়েছিলাম। ওর ভেতরের জিনিসপত্র খুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই, ওকে যে তৈরি করেছে একমাত্র সে-ই বুঝবে কোন জিনিসটা কি কাজ করে। অন্য লোকের কাছে তার কোন দাম নেই।'

'কেন লোকগুলো হিলডাকে তুলে নিয়ে এল?' জানতে চাইল স্বাতী।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আসিফ। অবশেষে বলল, 'কে জানে! হয়তো কেউ বাতিলপত্র রোবট তৈরি করতে চায়, হিলডাকে পেলে সে কাজটা সহজ হত।'

'তুমি যাদেরকে সন্দেহ করছিলে ওরাই কি করেছে?'

'কারা?' আসিফের মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। ববির দিকে ফিরে বলল, 'সার্জেন্ট, আমি চাই ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যাক। হিলডাকে তো পেয়েই গেলাম, আর ঝামেলার দরকার নেই।'

ববি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না।

## পনেরো

পরদিন সকালে স্বাতীর কিচেন-টেবলে বসে নাস্তা করছিল দু'জনে, তখনই ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরার জন্যে দৌড়ে লিভিংরুমে চলে এল স্বাতী।

'স্বাতী, কেমন আছিস রে?' ওপাশ থেকে রুহীর গলা ভেসে এল। 'সেই যে ফোন করবি বললি, আর তো করলি না!'

স্বাতীর মনে পড়ে গেল রুহীকে বলেছিল চাচাকে বলে আসিফের সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিতে। তারপর বেমালুম ভুলে গেছে সে পুরো ব্যাপারটা। 'তাড়াহুড়ো তো কিছু ছিল না...তা তোরা কেমন আছিস?'

'শোন, আগে কাজের কথা বলি। ওই আসিফ মাহমুদের কাছ থেকে দূরে থাক...বাবা তোকে দেশে ফিরে আসতে বলেছে...'

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল, ঢোক গিলল স্বাতী। 'কি বলছিস এসব আবোলতাবোল!'

'বারে, তুই-ই তো বলেছিলি বাবা যাতে চেক করে দেখে আসিফ মাহমুদের নামে কোন পুলিশ ফাইল আছে কিনা।'

স্বাতীর দমবন্ধ হয়ে এল। 'তাতে কি হয়েছে?'

'আরে, আসিফ মাহমুদ তো বিদেশী গুপ্তচর! খবর নিতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে গেল।'

স্বাতীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। ধপ করে সোফায় বসে পড়ে নিচু গলায় কোনমতে বলল, 'কি বলছিস এসব!'

'শোন, বাবা সব খবর নিয়েছে। আসিফ মাহমুদের যে কারখানাটা আছে···কি যেন নামটা···ও হ্যাঁ, পলিটেক ইণ্ডাসট্রিজ, তার সঙ্গে বাংলাদেশ নেভীর একটা চুক্তি হয়েছে বছর তিনেক আগে। বাংলাদেশ নেভীর টপ সিক্রেট কয়েকটা প্রজেক্টের ভার নিয়েছে ওরা। বাজারে জোর গুজব আসিফ মাহমুদ সেসব তথ্য বিদেশী কোন রাষ্ট্রের কাছে পাচার করে দিচ্ছে। তাছাড়া আরও জানা গেছে সে নাকি সাংঘাতিক কোন সামরিক মারণাস্ত্র আবিষ্কারের শেষ পর্যায়ে আছে। চিন্তা করতে পারিস ওটা যদি কোন শত্রু দেশের হাতে পড়ে, তাহলে বাংলাদেশের কতটা ক্ষতি হবে?'

'কোন প্রমাণ আছে এসবের? তুই তো একটু আগেই বললি সবই গুজব,' প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে স্বাতী।

'কি জানি ছাই! বাবা তো খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রমাণ না থাকলে কি আর কেউ অভিযোগ তুলত? শোন, বাবা কেইমেনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন···'

'কি! চাচা এখানে আসছেন?' তারমানে পানি অনেকদূর গড়িয়েছে! শঙ্কায় নীল হয়ে গেল স্বাতী, কি হচ্ছে এসব! 'ক'টার ফ্লাইটে আসছেন? কবে?'

'তোকে ওসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। বাবা বলেছে তুই যেন আজই কেইমেন ছেড়ে দেশে রওনা হয়ে যাস।'

'কিন্তু আসছেন কখন? থাকবেনই বা কোথায়?'

'আগামীকাল পৌঁছবে। হলিডে ইনে তিনশো এক নাম্বার রুম রিজার্ভ করা হয়েছে। বাবা তোর নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। তুই যত তাড়াতাড়ি

নয়ন কেইমেন ছেড়ে চলে যা।'

কপাল টিপে ধরে সোফায় এলিয়ে পড়ল স্বাতী। অস্ফুটে বলল, 'আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। হঠাৎ এই মুহূর্তে আসিফের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ ওঠার কারণ কি?'

'গত ক'সপ্তা ধরেই চট্টগ্রামে ওর গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ করে গাঢাকা দিতেই সবাই নিশ্চিত হয়ে যায়। কোন অপরাধ না করলে সে পালাবেই বা কেন? হয়তো টের পেয়ে গিয়েছিল নেভী ওর ওপর নজর রাখছে। তুই না জানালে তো কেউ জানতেও পারত না কোথায় আছে সে।' রুহীর প্রতিটা কথা শেলের মত আঘাত করছে স্বাতীর হৃদয়ে। বেদনায় নীল হয়ে গেছে, রীতিমত অসুস্থ বোধ করছে। স্বাতীকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রসঙ্গ পাল্টাল রুহী, 'অ্যাই, শোন, তুই সব চিন্তা বাদ দিয়ে ঢাকায় চলে আয়। তোর বসের সঙ্গে সব মিটমাট করে নে। কতদিন আর অভিমান করে থাকবি?'

'অভিমান তো একটু হবেই,' প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে স্বাতী, মাথার ভেতর ঝড়ের গতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে সদ্য শোনা তথ্যগুলো। 'তুই তো ভাল করেই জানিস হেলালউদ্দীন আহমেদ আমার জীবনের কতটুকু।'

'তাই বলে দেশ ছেড়ে চলে যাবি?'

'আরে, কেইমেনের ব্যাপারটা তো সাময়িক, সবার জীবনেই একটু-আধটু বৈচিত্র্যের দরকার হয়,' বলতে বলতে মুখ তুলতেই চমকে উঠল স্বাতী। ওর দৃষ্টি দেখে কখন যেন আসিফ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তাড়াহুড়ো করে রিসিভার নামিয়ে রাখল স্বাতী। তীব্র অপরাধবোধ আর আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছে সারা শরীর—কতক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আসিফ? কতটুকু শুনেছে? প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছে একছুটে এঘর থেকে বেরিয়ে যেতে, কেইমেন ছেড়ে বহুদূরে কোথাও চলে যেতে।

আসিফ এক পাও নড়েনি। একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে। দৃষ্টিতে বিস্ময় আর চাপা রাগ ঠিকরে পড়ছে। শিউরে উঠল স্বাতী।

আসিফই নীরবতা ভাঙল, 'আমি ইচ্ছে করে আড়ি পাতিনি।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল স্বাতী, অস্ফুটে কোনমতে বলল, 'তাতে এখন আর কিছু যায় আসে না।'

'কিচ্ছু যায় আসে না?' হঠাৎ করে রাগে ফেটে পড়ল আসিফ। 'কিচ্ছু যায়

আসে না! উহ্! এত শীতল তুমি!' দু'হাতে চুলের অরণ্যে চিরুনি চালাতে চালাতে দ্রুতপায়ে ঘরময় পায়চারি শুরু করল সে। 'আমি জানতাম অত ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মাইনি। তপস্যা না করেই তোমার মত একজনের ভালবাসা পাব, তা আশা করাও যে অন্যায়! তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর জোর খাটানোর কোন অধিকার আমার নেই। কিন্তু, স্বাতী,' ঝপ্ করে স্বাতীর সামনে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে বেদনাভরা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল আসিফ, 'আমি সাময়িক? স্বাতী, আমি তোমার জীবনের সাময়িক একটা অধ্যায়? তুমি আমাকে নেহায়েৎ সাময়িক ভেবে নিয়েছ?'

রাগ-ভয় সব কেটে গিয়ে স্বাতীর বড়বড় কালো চোখের তারায় এখন শুধুই বিস্ময়। কি বলছে এসব আসিফ? পাগলের মত স্বাতী মনে করার চেষ্টা করছে রুহীকে ঠিক কি কি বলেছিল সে। আসিফ আর ওর মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক নিয়ে তো কোন কথা হয়নি! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, হেলালউদ্দীন আহমেদের সম্বন্ধে কথা বলছিল ওরা···কেইমেনে ছুটি কাটানো···সাময়িক বৈচিত্র্য···

'আসিফ, তুমি কি ভেবেছ ফোনে তোমাকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম?'

'তবে?'

গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্বাতী। আসিফ ওদের কথোপকথনের শেষের অংশটুকুই শুধু শুনেছে, প্রথমটুকু শুনে থাকলেও বুঝতে পারেনি।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্বাতী। বলল, 'তুমি ভুল বুঝেছ, আসিফ। তোমাকে নিয়ে কোন কথা হয়নি। আমার বান্ধবী রুহী ফোন করেছিল,' দ্রুত গল্প বানাতে শুরু করল সে, 'ব্যবসা সম্পর্কিত দু'একটা দুঃসংবাদ শুনে একটু মুষড়ে পড়েছিলাম।'

দুরন্ত শিশুর মত ঘাড় বাঁকিয়ে আসিফ প্রশ্ন করল, 'কি দুঃসংবাদ?'

ইতিমধ্যেই গল্পটা দাঁড় করিয়ে ফেলেছে স্বাতী। 'আমার এক কর্মচারী···রুহীর ধারণা সে দু'হাতে চুরি করছে। কিন্তু আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। এতদিনের বিশ্বাসী লোক হেলালউদ্দীন, এক কথায় কিভাবে তাকে ছাড়িয়ে দিই!'

বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল আসিফ, তারপর অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে একটু হাসার চেষ্টা করল। 'নিজেকে বোকার মত লাগছে! আমি দুঃখিত, স্বাতী। কোনকিছু না জেনে এভাবে তোমাকে আক্রমণ করা একেবারেই উচিত হয়নি।

যদি কোন সাহায্যের দরকার হয়, আমাকে বলতে পারো।'

'না, ধন্যবাদ, আসিফ। ব্যাপারটা আমি নিজেই সামলে নেব। শুধু চিন্তা করার জন্যে কিছু সময় দরকার। আমি কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই।'

'তুমি বড্ড বেশি চিন্তা করছ। আমাকে খুলে বলো তো প্রথম থেকে কি হয়েছে। আমারও তো ব্যবসা আছে, তোমাকে সাহায্যও করতে পারি,' জোর করল আসিফ।

চেষ্টা করেও রাগ চেপে রাখতে পারল না স্বাতী। 'আমি তোমার সাহায্য চাই না।' পায়ে স্যানডেল গলিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলাতে ঝুলাতে শক্ত গলায় বলল, 'আমি একটু শহরে যাচ্ছি। বেকারিগুলোর কোন একটাতে বসে এক কাপ কফি খাব।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

'বললাম তো, না! আমি একটু একা থাকতে চাই।'

'কিন্তু পরপর এতকিছু ঘটে গেল, তোমাকে একা ছাড়তে যে ভরসা পাচ্ছি না।'

'আমি ছোট খুকীটি নই, আসিফ। চিন্তা কোরো না।'

সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে চলে এল স্বাতী। বালুতে পা রেখেই নিজেকে আর সামলাতে পারল না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। প্রচণ্ড ইচ্ছে করছে এক ছুটে আসিফের বুকে গিয়ে আছড়ে পড়তে। চুলোয় যাক বাস্তবতার লম্বা চওড়া আদর্শ, স্বাতী যে ওকে ভালবেসেছে!

স্বাতী জানে পর্চে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে আসিফ, তাই একবারও পিছু ফিরে দেখল না। আলগোছে চোখের জল মুছে সাইকেলে চেপে বসল।

অবর্ণনীয় ক্রোধ আর পাহাড় প্রমাণ হতাশা কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। মাত্র দশটা দিন—এর মধ্যেই ওর জীবনে এত কিছু ঘটে গেল! প্রথমে হেলালউদ্দীন আহমেদের কাছ থেকে পাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাত। তারপর কেইমেনে বেড়াতে এসে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক যুবকের প্রেমে পড়া! এই মুহূর্তে সেকথা মনে করে নিজেকে ধিক্কার দিল স্বাতী। কেমন করে এমন বোকামি করল সে!

অথচ আসিফকে অন্য সবার চাইতে কত আলাদা মনে হয়েছিল! মনে হয়েছিল এই সেই স্বপ্নের রাজকুমার, যার জন্যে এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল সে। ওর সত্যিকারের পরিচয় জানতে পেরে স্বাতীর অর্ধেকটা সত্তা যেন মরে গেছে। শেষ পর্যন্ত এইভাবে প্রতারিত হতে হলো! না, এত সহজে ভেঙে পড়বে

না, এত তাড়াতাড়ি হার মানবে না স্বাতী।

জর্জ টাউনে পৌঁছে একটা টেলিফোন বুদে ঢুকল। প্রায় বিশ মিনিট চেষ্টার পর ঢাকা টাইম্‌সের লাইন পেল, আরও ত্রিশ সেকেণ্ড পর হেলালউদ্দীন আহমেদ এলেন লাইনে।

'স্যার,' কোন ভূমিকা করল না স্বাতী, 'আমি আপনাকে জানাতে চাই, আপনি ভুল করেছিলেন।'

'কি ব্যাপার, স্বাতী?' একটু থমকে গেলেন তিনি।

'আপনি আমার কাজে বাধা দিয়েছিলেন। আপনার কাছ থেকে তা আশা করিনি আমি। আপনি আমার গুরুর মত। তবে এই মুহূর্তে শুধু এটুকুই আপনাকে বলতে চাই, আমি একজন সাংবাদিক। কোন বাধাই আমাকে আমার কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।'

'কিন্তু, স্বাতী, এখন এসব কথা কেন? তুমি তো ছুটিতে আছ...'

'সাংবাদিকের কোন ছুটি নেই, স্যার। আমি...'

'জানি, স্বাতী, তোমার পেশায় তুমি একনিষ্ঠ... একটু হাসলেন হেলালউদ্দীন আহমেদ, 'যা করেছি তোমার ভালর জন্যেই করেছি। টেলিফোনে অত কথা বলা যায় না। চাইলে আগামীকালই জয়েন করতে পারো, তারপর না হয় সব বুঝিয়ে বলব।'

স্বাতীর চোখজোড়া ভিজে উঠল। ফোন নামিয়ে রেখে একটু হালকা বোধ হচ্ছে। রাগটা ঝাড়ার দরকার ছিল। হারানো মনোবলটুকু ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসছে।

একটা বেকারিতে ঢুকে জেলি-ডোনাট আর এক কাপ কফি নিয়ে বসল স্বাতী। মাথাটা ঠাণ্ডা করা দরকার। আসিফের ব্যাপারেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না যে আসিফ এক ভণ্ড প্রতারক। দূরে সরে যেতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে চমকে উঠল স্বাতী। কোণের একটা টেবিলে চাপা-নাক, কুঁতকুঁতে চোখ, ছোটখাট একটা লোক বসে আছে। পরনে সস্তা ঢলঢলে ছাইরঙা স্যুট। কোন সন্দেহ নেই এ-ই সেই কালো গাড়ির ড্রাইভার!

নির্বাক হয়ে বসে রইল স্বাতী, কি করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছে না। লোকটা কি ওকে অনুসরণ করছে? নাকি ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেছে? অবশ্য লোকটার মনোযোগ অন্যদিকে, স্বাতীকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

দেখলেও চিনতে পারেনি হয়তো।

দাম মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল স্বাতী, লোকটা একবারও ফিরে তাকাল না। ফুটপাতে মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল স্বাতী। বেশিক্ষণ লাগল না, মিনিট দশেক পরেই বেরিয়ে এল লোকটা। স্বাতী ওর পিছু নিল। ফুটপাত লোকে লোকারণ্য, অনুসরণ করতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

একটা দোকানের শো-কেসের সামনে লোকটা দাঁড়িয়ে যেতেই বিনা নোটিসে থমকে দাঁড়াতে হলো স্বাতীকেও। পিছনের এক মহিলা হুড়মুড় করে এসে ধাক্কা খেলো ওর পিঠে, হাতের জিনিসপত্র ছিত্রিছান হয়ে পড়ল ফুটপাতে। ক্ষমা চেয়ে দ্রুতহাতে প্যাকেটগুলো তুলে দিল স্বাতী, আশেপাশের লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলো বলে অকারণেই নিজের উপর বিরক্ত হলো। সবখানেই ঝামেলা! ওদিকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার পর লোকটাকে আর আগের জায়গায় দেখা গেল না। যাহ্! হারিয়ে গেল?

ঠিক শেষ মুহূর্তে ছাইরঙা স্যুটটার কিয়দংশ একটা দোকানের ভেতর ঢুকে যেতে দেখল স্বাতী। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল, দোকানে ঢোকার আগে দেয়ালে হেলান দিয়ে একটু জিরিয়ে নিল। উত্তেজনায় বুকের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে হৃৎপিণ্ডটা, রক্তে অভিযানের নেশা। জেগে উঠেছে স্বাতীর সাংবাদিক সত্তা।

বাইরে থেকে কাঁচের দরজা দিয়ে দোকানের ভিতরে উঁকি দিল। ট্যুরিস্টের ভিড়ে তিল ধারণের উপায় নেই। নিশ্চিন্তে ভিতরে ঢুকে পড়ল স্বাতী। ছাইরঙা স্যুট ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে তাকে অনুসরণ করতে লাগল স্বাতী, শেলফে সাজিয়ে রাখা রকমারি পণ্য নেড়েচেড়ে দেখছে। স্কটিশ উলের তৈরি তুলোর মত নরম পোশাক, ফরাসী সৌরভ, সুইস চকোলেটের বাক্স আর বোহেমিয়ান রঙিন কাঁচের তৈজসপত্র নিমেষেই দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

দোকানের একজন কর্মচারী এগিয়ে এল, 'হাতে-তৈরি জিনিসগুলো আজ আমরা অর্ধেক দামে বিক্রি করছি। আপনার কিছু পছন্দ হয়েছে?'

মাথা নাড়ল স্বাতী, লোকটা অন্য এক সম্ভাব্য-খরিদ্দারের দিকে এগিয়ে যেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওদিকে নাক-বোঁচা এক বাক্স চকোলেট কিনে কাউন্টারে দাম মেটাচ্ছে। চকোলেটের বাক্স পলিথিনের ব্যাগে ভরে দোকান থেকে সে বেরিয়ে যেতে স্বাতী পিছু নিল। দ্রুতগতিতে হাঁটছে লোকটা, যেন তাড়া আছে। তাল মিলাতে রীতিমত হিমশিম খেতে হচ্ছে স্বাতীকে। দুই ব্লক

পরে আর একটা দোকানে ঢুকল লোকটা। যতদূর মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাচ্ছে, সেজন্যেই বাড়ির লোকজনের জন্যে কেনাকাটা করছে। একটু ইতস্তত করে দোকানে ঢুকল স্বাতী, লোকটা এখন পর্যন্ত যখন কিছু সন্দেহ করেনি তখন নিশ্চিন্তেই কাছাকাছি থাকা যায়। তাছাড়া দোকানের ভেতরে গাদাগাদি ভিড়, গাঢাকা দেওয়া কোন সমস্যাই নয়।

ঝিনুকের তৈরি একটা টেবিল-ল্যাম্প দরাদরি করছে লোকটা, পেলিক্যানের আকৃতিতে তৈরি—ঠোঁটের ডগায় ঝুলছে বাল্ব, এদিকে দোকানের বিক্রেতা এসে দাঁড়িয়েছে স্বাতীর পাশে, 'এটা আপনাকে প্যাকেট করে দিই?'

নাক-বোঁচাকে চোখ তুলে এদিকে তাকাতে দেখে চমকে পিছনে ঘুরে গেল স্বাতী, অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'হ্যাঁ···দাম কত?'

স্বাতী যে জিনিসটার সামনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ খুঁটিয়ে দেখার ভান করছিল, বিক্রেতা হাত বাড়িয়ে শেলফ থেকে সেটা নামিয়ে আনল। বিস্মিত স্বাতী বুঝতে পারল, হাঙরের আকৃতিতে মাটি দিয়ে বানানো বীভৎস একটা অ্যাশট্রে কিনে ফেলেছে ও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, কারও বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ড্রইংরুমে প্লাস্টিকের আপেল গাছ কিংবা পিতলের রুচিহীন ফুলদানী সাজানো দেখে আর কোনদিন হাসাহাসি করবে না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে গেল স্বাতী। নাক-বোঁচা শপিং করতে পারে! যে কোন গৃহবধুকে হারিয়ে দিতে পারবে এ কাজে। তবে এই আধ ঘণ্টার মধ্যে লোকটাকে ভাল করে দেখে নিল সে। চিবুকে গভীর একটা কাটা দাগ, ডান চোখটা বাঁ চোখের চেয়ে ছোট। কেনাকাটার ধরন থেকেও কিছু তথ্য জানা গেল। ঝিনুকের ল্যাম্প ছাড়াও গোলাপী-বেগুনী রঙের এক সেট স্কার্ট-ব্লাউজ, দুটো পুতুল, আর একটা প্লাস্টিকের হেলিকপ্টার কিনেছে। তার মানে লোকটা বিবাহিত, দুই মেয়ে আর এক ছেলের বাবা।

বাজার এলাকা ছেড়ে ব্যাটা এবার সাগরের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। একটা ট্র্যাশক্যান দেখতে পেয়ে হাতের অ্যাশট্রের প্যাকেটটা আলগোছে ফেলে দিল স্বাতী। এদিকের রাস্তাটা ফাঁকা বলে অনেকটা পিছিয়ে আসতে হয়েছে যাতে নাক-বোঁচা ওকে দেখতে না পায়। তবে যতদূর মনে হচ্ছে জাহাজঘাটার দিকে যাচ্ছে। 'অরোরা'র কথা মনে করে স্বাতীর উত্তেজনা বেড়ে গেল।

দামী সব ইয়াট সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে জেটিতে। ক্যামেরা হাতে ট্যুরিস্টের ঝাঁক কলকল করছে কাঠের পাটাতন বিছানো ঘাটে। বাদাম, পপকর্ন

আর আইসক্রিমের গাড়ি ঠেলছে ক্লাউনের পোশাক পরা ফেরিওয়ালারা। এই ভিড়ের মধ্যে নাক-বোঁচাকে হারিয়ে ফেলল স্বাতী।

এই গ্যাঞ্জামের মধ্যে দৌড়ানোর চেষ্টা করা বৃথা, দু'হাতে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে দ্রুতগতিতে হাঁটার চেষ্টা করল, উৎসুক চোখে খুঁজতে লাগল এদিক-ওদিক। নাহ্! কোথাও দেখা যাচ্ছে না পরিচিত ছাইরঙা স্যুটটা। কোন ইয়াটে উঠে পড়েছে কি?

বিনা নোটিসে প্রায় ছ'ফুট লম্বা এক দাড়িওয়ালা লোক ওর পথ আটকে দাঁড়াল, পরনে নোংরা জিন্স প্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি। হলুদ দাঁত বের করে হাসল, এক হাতে স্বাতীর কাঁধ আঁকড়ে ধরল। বলল, 'এত তাড়া কিসের, সুন্দরী?'

ভয় পেল স্বাতী। তবে সেটা বাইরে প্রকাশ পেল না। ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে এগুলো। পিছন থেকে দাড়িওয়ালা আর তার সঙ্গীরা জোরে হেসে উঠল। আড়চোখে স্বাতী দেখল, দলটা ওর পিছু নিয়েছে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একি ঝামেলা! এদিকে নাক-বোঁচাও কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে।

নিচ থেকে কেউ ওকে ডাকল, 'কাউকে খুঁজছেন?'

জেটি থেকে সমুদ্র প্রায় বিশ ফুট নিচে, সে কারণে ইয়াটগুলোও সব নিচে। স্বাতী ঝুঁকে দেখল, সাদা শর্ট্স আর পোলো টি-শার্ট পরা এক লোক হাসি মুখে ওর দিকে চেয়ে আছে। নিশ্চয়ই ধনী কোন আমেরিকান, সমুদ্রবিহারে বেরিয়েছে।

'হ্যাঁ,' হাসল স্বাতী। গলা উঁচু করে জানতে চাইল, 'কিছুক্ষণ আগে মঙ্গোলিয়ান চেহারার কোন লোককে এদিকের কোন বোটে উঠতে দেখেছেন?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল লোকটা। 'না, মনে পড়ছে না। তবে ইচ্ছে করলে আমার বোটে এসে দেখতে পারেন, এখান থেকে ওদিকের সব বোটই পরিষ্কার দেখা যায়।' এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা, 'আমার নাম রিক ডোমার।'

ওদিকে বদমাশগুলো কাছে ঘনিয়ে এসেছে, ভিলেনী হাসি আর অশ্লীল দু'একটা মন্তব্য শুনতে পেল স্বাতী। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হলো। ভদ্রলোকের বাড়িয়ে ধরা হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে বোটে নেমে পড়ল। হেসে বলল, 'ধন্যবাদ।

আমি স্বাতী···স্বাতী চৌধুরী।'

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কব্জিতে সোনার ব্যাণ্ডে দামী রোলেক্স ঘড়ি, গলায় মোটা সোনার চেন। ঠোঁটে অমায়িক হাসি, 'ডেকের শেষ প্রান্তে গেলে সবগুলো বোটই দেখতে পাবেন।'

এগিয়ে গেল স্বাতী। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। ঘাড়ের পিছনে শিরশিরে অনুভূতি, ভদ্রলোক পিছন থেকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। এভাবে অপরিচিত এক বোটে উঠে পড়া বোকামি হয়েছে, বুঝতে পারল স্বাতী। তাছাড়া ভদ্রলোকের ইংরেজি উচ্চারণে মোটেই আমেরিকান ছাপ নেই। প্রথম দর্শনে শ্বেতাঙ্গ মনে হলেও আসলে তা নয়। ভুল হয়ে গেছে। বড় করে শ্বাস টানল স্বাতী, যে করেই হোক মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ডেকের রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়াল, যাতে জেটির ট্যুরিস্টদের দেখা যায়। যে-কোন মুহূর্তে জলে ঝাঁপ দেবার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিল।

'কি হলো, খুঁজে পেলেন?'

'নাহ্! কোথায় যে গেল!' এক হাতে রেলিং চেপে ধরল স্বাতী।

পিছন থেকে কেউ ওর কাঁধে হাত রাখল। ভীষণ চমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে গেল স্বাতী। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। শক্ত একটা হাত পিছন থেকে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরেছে, অন্য হাতটা নাকে চেপে ধরেছে ভেজা একখণ্ড কাপড়। মিষ্টি গন্ধটা পরিচিত। তীরবিদ্ধ পাখির মত ছটফট করতে লাগল স্বাতী, কিন্তু এক চুলও নড়তে পারল না। ধীরে ধীরে দু'চোখে আঁধার নেমে এল। জ্ঞান হারিয়ে ডেকে গড়িয়ে পড়ল সে।

## ষোলো

অস্থিরভাবে কটেজের সামনে পায়চারি করছে আসিফ। স্বাতীকে এভাবে একা একা যেতে দেয়া উচিত হয়নি। কিন্তু কিইবা করার ছিল! যা গোঁয়ার মেয়ে!

তাছাড়া কেনই বা হঠাৎ করে এমন ঘাবড়ে গেল মেয়েটা? বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে কোন কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে স্বাতী এভাবে ভেঙে পড়তে পারে।

অবশ্য দোষ ওর নিজেরই। ঘরে ঢোকার আগে জানান দেয়া উচিত ছিল। স্বাতী হয়তো ভেবেছে ও আড়ি পেতেছিল। কি করে এখন ওকে বোঝানো যায় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত? স্বাতী যে অতক্ষণ ধরে ফোনে কথা বলবে তাই বা কে জানত? ও শুধু স্বাতীকে খুঁজতে এসেছিল।

কি নিষ্প্রাণ আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল স্বাতীকে! কেন? ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু নয়, ফোনে এমন কোন কিছু জেনেছে যা ওকে আসিফের কাছেও মিথ্যে বলতে বাধ্য করেছে। শেষ পর্যন্ত তাহলে স্বাতীও মিথ্যে বলতে শুরু করেছে। কিন্তু কেন?

এভাবে ছটফট করার কোন মানে হয় না। স্বাতীকে সরাসরি প্রশ্ন করা উচিত। তাহলে আর ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকবে না। কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল আসিফ, স্বাতী এতক্ষণে বেকারিতে পৌঁছে গেছে। গাড়ির দিকে এগুতে যেতেই ঘরের ভেতর তার স্বরে বেজে উঠল ফোন।

দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরল আসিফ। সার্জেন্ট ববি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চার্লিকে জেরা করতে যাচ্ছে সে, আসিফ আর স্বাতী যেন পুলিশ স্টেশনে চলে আসে। স্বাতীর অনুপস্থিতির কথা জানিয়ে আসিফ বলল, ও একাই যাচ্ছে। মনটা খুঁতখুঁত করছে, চার্লির বকবক শোনার চেয়ে স্বাতীর সঙ্গে কথা বলাটা বেশি দরকার। কিন্তু কি আর করা যাবে!

ববি আসিফের জন্যে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিল। আসিফ পৌঁছতে ওকে সঙ্গে করে রিসেপশন রুমে নিয়ে এল। চার্লিকে বসিয়ে রাখা হয়েছে একটা সোফায়। ওকে দেখে একটু অবাক হলো আসিফ, চল্লিশের কাছাকাছি হবে লোকটার বয়স। এই বয়সের ওয়েইটার কমই দেখা যায়। ইঙ্গিতে আসিফকে বসতে বলে ববি সরাসরি চার্লিকে প্রশ্ন করল, 'এবারে বলো দেখি "অরোরা" আর তার মালিক সম্বন্ধে কি জানো।'

'আমি কোন অপরাধ করিনি,' ভয়ে সাদা হয়ে গেছে চার্লির চেহারা। ঘামে চকচক করছে মাথার ছোট্ট গোলাপী টাক।

'তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয়নি,' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল

সার্জেন্ট।

'আমি শুধু কয়েকবার "অরোরায়" কিছু মাছ সাপ্লাই দিয়েছি। আমার বাবা আর ভাইদের মাছের কারবার আছে।'

'ইয়াটে উঠেছিলে তো?'

'হ্যাঁ, কয়েকবার। গ্যালির নিচে পর্যন্ত গিয়েছি। ইয়াটটা দামী, বড়লোকদের যেমন থাকে আর কি। ডাইনিং হলটা বিশাল, বড়সড় পার্টি দেয়া যায়।'

'মালিকের নাম কি?'

শ্রাগ করল চার্লি। 'কেমন করে বলব?'

'কোন দেশী?'

'ঠিক বলতে পারব না। কিছু লোক দেখতে চাইনিজদের মত। শ্বেতাঙ্গও আছে।'

'রিচিকে যে সাদা-চুলো লোকটা বকশিশ দিয়েছিল, সে কি ওদের বস্?' এবারে আসিফ কথা বলে উঠল।

মুখ ঘুরিয়ে ওকে কিছুক্ষণ দেখল চার্লি, তারপর বলল, 'ওই লোকটাই আমাকে মাছের দাম দেয়। তবে সে নয়, আমার ধারণা ওদের বস্ অন্য একজন। অনেক লম্বা, সুপুরুষ চেহারা। রাজা-বাদশাদের মত পোশাক পরে থাকে।'

'নাম জানো?'

একটু ভেবে নিল চার্লি, বলল, 'ঠিক মনে পড়ছে না, তবে "ফারাও" বা এরকম কোন নাম ধরে ডাকছিল লোকটাকে ওরা। লোকটা অনেকগুলো ভাষায় কথা বলতে পারে। তবে শ্বেতাঙ্গ নয়, হিসপানিক হতে পারে। অন্য কারও সঙ্গে ওর তুলনা হয় না। মনে হয় সবাই ওকে ভয় পায়।'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে থাকল আসিফ। নতুন তথ্য। নাক-বোঁচাদের সঙ্গে এ ধরনের একজন লোক কি করছে? নাহ্, স্বাতীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবার পর এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে।

আরও খানিকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর কেইমেন ব্র্যাকে ফেরার ভাড়া দিয়ে চার্লিকে বিদায় করে দিল সার্জেন্ট। 'কিছু বুঝতে পারলেন?' আসিফকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে জানতে চাইল সে।

'স্বাতীর সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। তবে সাহায্যের জন্যে

অসংখ্য ধন্যবাদ।' হ্যাণ্ডশেক করে বিদায় নিল আসিফ।

সোজা চলে এল শহরের কেন্দ্রে। অনেক কষ্টে একটা পার্কিং খুঁজে পেয়ে গাড়িটা পার্ক করল। তারপর সারবাঁধা বেকারিগুলোয় ঢুঁ মারতে লাগল। কিন্তু না, স্বাতী কোথাও নেই।

কটেজে ফিরেও স্বাতীকে দেখতে না পেয়ে একটু চিন্তিত হলো। গেল কোথায় মেয়েটা? তারপর ভাবল, হয়তো দোকানপাটে ঘোরাঘুরি করছে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে খোঁজেনি বলে অনুশোচনা হলো।

•

খুব ধীরে ধীরে স্বাতীর চেতনা ফিরে এল। প্রথমে মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে। ছেঁড়া ছেঁড়া সব স্মৃতি···যার কোন অর্থ নেই। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা, পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। সচেতনতার স্তরে পৌঁছবার আগেই বারবার তলিয়ে গেল সীমাহীন অন্ধকারে।

আসিফ···হ্যাঁ, পুরোপুরি চেতনা ফিরে পাবার পর প্রথমেই আসিফের কথা মনে পড়ল। কোথায় আসিফ? শক্ত করে যদি ও জড়িয়ে ধরে থাকত, সব ব্যথা দূর হয়ে যেত।

আসিফ! না! তা আর হয় না। আসিফ যে বিশ্বাসঘাতক! মিথ্যেবাদী! হঠাৎ করেই একে একে সবকিছু মনে পড়ে যেতে থাকল আর সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ব্যথাও যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। না, আসিফের কথা চিন্তা করার সময় নেই, অনেক জরুরী কাজ পড়ে আছে। জোর করে অনেক কষ্টে চোখ খুলল স্বাতী। সূর্যের আলো চোখে আঘাত করতেই ককিয়ে উঠে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। গা গুলিয়ে উঠল, টনটন করছে মাথার ভেতরটা। চোখ বন্ধ করার আগেই পলিশ করা কাঠের মেঝে আর গোল পোর্টহোলটা চোখে পড়েছে। ছোট একটা ঘর, একটু একটু দুলছে। মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন···

ইয়াট! ইয়াটের ভেতরে রয়েছে সে। চকিতে সবকিছু মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল নিজের বোকামির কথা। সমস্ত শক্তি একত্র করে কোনমতে উঠে বসল স্বাতী। ইয়াটটা চলছে, তীর ছেড়ে নিশ্চয়ই সমুদ্রের অনেকটা ভেতরে চলে এসেছে। কেন ওকে এভাবে কিডন্যাপ করা হলো? কারা এরা?

মখমলের চাদর বিছানো মেহগনি কাঠের তৈরি দামী একটা খাটে বসে আছে স্বাতী। উল্টোদিকেই বিল্ট-ইন্ ড্রেসিং টেবল্। পলিশ করা এক সেট

বেতের সোফা আর বুক-কেস। সাধারণ কোন ইয়াট নয়, এই ইয়াটের মালিক ধনী এবং সৌখিন।

পোর্ট হোল গলে একরাশ সূর্যের আলো লুটিয়ে পড়েছে ঘরময়। তারমানে খুব বেশিক্ষণ অচেতন অবস্থায় থাকতে হয়নি ওকে। নাকি এরমধ্যেই পুরো চব্বিশটা ঘণ্টা কেটে গেছে! বাঁ হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল স্বাতী, না, তারিখ পরিবর্তন হয়নি। তার মানে গ্র্যাণ্ড কেইমেনের আশেপাশেই কোথাও আছে ইয়াটটা, খুব বেশি দূরে সরে যেতে পারেনি।

সাবধানে এক পা মেঝেতে নামাল স্বাতী। গা গুলিয়ে বমি পাচ্ছে, মাথা ঘুরছে বনবন করে। এক হাতে বেতের সোফার কিনারা আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। স্বচ্ছ পুঁতির মত বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল ওর কপাল জুড়ে, মুখের ভেতর বিচ্ছিরি তেতো স্বাদ।

ঠিক সময়মত এক কোণে বাথরুমের দরজাটা চোখে পড়ল। ছুটে গিয়ে কমোডের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হড়হড় করে বমি করে ফেলল স্বাতী। বমি করাতে অনেকটা সুস্থ বোধ করল। হাতমুখ ধুয়ে সোজা বিছানায় আশ্রয় নিল। প্রচণ্ড দুর্বল লাগছে।

প্রায় একঘণ্টা পর আবার উঠল স্বাতী। অনেকটা ভাল বোধ করছে এখন। বাথরুমে গিয়ে হালকা বেগুনীরঙা নরম একটা তোয়ালে র‍্যাক থেকে তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে নিল। তারপর সেটা দিয়ে মুখ-হাত মুছল। তোয়ালেটা চিপে আলগা পানিটুকু ফেলে দিয়ে লম্বা করে ভাঁজ করল। সেটা কপালে জড়িয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল স্বাতী। এখান থেকে পালাতে হবে। প্রথম সুযোগেই।

প্রায় আধঘণ্টা পর দরজায় শব্দ হলো। তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করল স্বাতী। দু'জোড়া পায়ের শব্দ বিছানার পাশে এসে থামল। 'জ্ঞান ফেরেনি এখনও,' মন্তব্য করল একজন। ভরাট পুরুষালী কণ্ঠ।

'ভান করছে,' অন্যজন বলে উঠল। কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল করল-না স্বাতী, তারপরেও নিশ্চিত হবার জন্যে চোখ খুলল। সেই নাক-বোঁচা লোকটা! 'তার মানে তুমি সত্যিই ভড়ং ধরেছ!' বোঁচার চোখে স্পষ্ট রাগ।

কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো স্বাতী, সমা তেজে বলল, 'আমাকে কেন এখানে আটকে রাখা হয়েছে?'

কোন উত্তর না দিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল বোঁচা-নাক। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চমকে উঠল স্বাতী। সামির ফারুকি! এই লোক এখানে কি করছে? ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছে স্বাতী, কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করল যাতে চেহারায় তা না ফুটে উঠে। সামির ফারুকিকে উপমহাদেশের অন্ধকার জগতের মুকুটহীন সম্রাট বলা চলে। হেন দুষ্কর্ম নেই যা তার অসাধ্য। জন্মসূত্রে পাকিস্তানী, তবে পুরো এশিয়া জুড়ে তার সাম্রাজ্য। উপমহাদেশের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। প্রভুত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। পাকিস্তান এবং ভারতের কয়েকটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই লোকের সরাসরি যোগাযোগের গুজব এখনও বাজারে চালু। বলা বাহুল্য, আজ পর্যন্ত আইন ওর নাগাল পায়নি। সামির ফারুকি কেইমেনে কেন?

'আশা করি এখানে আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না, মিস চৌধুরী,' পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল ফারুকী। বয়স চল্লিশের ওধারে। দমবন্ধ করা ব্যক্তিত্ব, দারুণ সুপুরুষ। স্বাতীর মনে পড়ল গত বছর এশিয়ান নিউজ উইক সামির ফারুকির উপর প্রচ্ছদ কাহিনী ছেপেছিল।

'নাহ্! অসুবিধা আর কি!' ব্যঙ্গের সুরে বলল স্বাতী। 'ড্রাগ দিয়ে আমাকে অজ্ঞান করা হয়েছে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছে। এক বিন্দু পানি পর্যন্ত খেতে দেয়া হয়নি। চমৎকার আতিথেয়তা বটে!'

ফারুকির চোখে কৌতুক উপচে পড়ছে, সাদা-কালো গোঁফের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। 'আমার অতিথিরা সাধারণত কোন অভিযোগ করে না। আপনি বরং একটু বিশ্রাম নিন, আমি দেখছি কি করা যায়।'

ছোট্ট ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসার পর সঙ্গীর দিকে ফিরল ফারুকি। 'গোধার মত কাজ করেছ তোমরা! মেয়েটাকে কেন শুধু শুধু আটকে রেখেছ? ভেবেছ এতেই ঘাবড়ে গিয়ে মাহমুদ তোমাদের কথামত চলবে? বোকার দল!'

হাত কচলাল নাক-বোঁচা। 'মাহমুদ মেয়েটাকে ভালবাসে।'

'তার মানে এই নয় যে মেয়েটার জন্যে সব তথ্য দিয়ে দেবে সে। তোমরা যে কতটা গর্দভ, তা জানতাম না!'

'কাজ না হলে না হয় একটু মজা-টজা করার পর মেয়েটাকে দ্বীপে ছেড়ে দিয়ে আসা যাবে। কি করব, সুযোগটা হঠাৎ করেই হাতে এসে গেল, আপনার অনুমতি নেবার সময় পাইনি।'

'গর্দভ!' বিড়বিড় করে উঠল ফারুকি। 'এখন আর মেয়েটাকে ছেড়ে দেবার কোন উপায় নেই। তবে মনে রাখবে, এখন থেকে তোমাদের নোংরা নাকগুলো আর এর মধ্যে গলাবে না। যে কাজের জন্যে তোমরা আমাকে পয়সা দিচ্ছ, সেটা একা আমাকেই করতে দাও।'

দুপুর গড়িয়ে গেল। দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে উঠেছে আসিফ। কোথায় গেল স্বাতী? অস্থির হয়ে আবার শহরে এল। একটু খুঁজতেই বেকারিগুলোর পাশের স্ট্যাণ্ডে রাখা স্বাতীর সাইকেলটা পেয়ে গেল। তবে বেকারির কর্মচারীদের কেউই স্বাতীকে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। আসিফ মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেল স্বাতী বিপদে পড়েছে। কিন্তু কোন প্রমাণ ছাড়া তো সার্জেন্টের কাছে যাওয়া যাবে না। পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় স্বাতীকে খুঁজতে লাগল আসিফ।

একবার হঠাৎ মনে হলো, স্বাতী ওর উপর রাগ করে দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়নি তো! না, তা কেমন করে হয়! ভাড়া করা সাইকেলটা এভাবে রাস্তায় ফেলে যাবে না স্বাতী কখনোই। তাছাড়া ওর সব জিনিসপত্র তো কটেজেই পড়ে আছে। তবুও একবার এয়ারপোর্টে গেল আসিফ। আজকের কোন প্যাসেঞ্জার লিস্টেই স্বাতীর নাম নেই। ডায়ানও জানাল স্বাতীকে সে দেখেনি।

অবশেষে একসময় কটেজে ফিরল আসিফ। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। সারাদিন কিছুই মুখে দেয়নি, খাবার কথা মনেই আসেনি। প্রথমেই ছুটে গেল স্বাতীর ঘরে। না, স্বাতী ফেরেনি। হলুদ শাড়িটা তেমনি হ্যাঙারে ঝুলছে। ড্রেসিং টেবিলের উপর একজোড়া কানের দুল, লিপস্টিক আর চিরুনি। একবার, শুধু একটা বার স্বাতীকে দেখার জন্যে বুকটা হু-হু করে উঠল।

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল আসিফ। এখন মন খারাপ করার সময় নয়। একে একে ড্রয়ারগুলো ঘেঁটে দেখল, তেমন কিছুই নেই। ক্যানভাসের সাইড ব্যাগটাও খালি। কিন্তু ভ্যানিটি ব্যাগটা গেল কোথায়?

নিজের ঘরে ফিরে সোফায় শুয়ে পড়ল আসিফ। মনে হচ্ছে যেন জীবনীশক্তির কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। স্বাতী রাগ করে চলে গিয়েছিল বলেই কি এতটা কষ্ট হচ্ছে? কেন বার বার মনে হচ্ছে স্বাতী ইচ্ছে করেই দূরে সরে গেছে?

ফোন বেজে উঠতেই স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল আসিফ। স্বাতী? দৌড়ে

গিয়ে রিসিভার তুলে নিল, 'হ্যালো!'

নিচু পুরুষালী কণ্ঠে কেউ বলল, 'ডক্টর মাহমুদ, স্বাতী এখন আমাদের হাতে।'

দম বন্ধ হয়ে এল, মনে হলো কেউ যেন জোরে পেটে ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে। 'স্বাতী কোথায়? কে আপনারা?'

'আপনার বন্ধু। গত-সপ্তায় আপনার কটেজে পরিচয় হয়েছে, মনে নেই?'

'ইউ বাস্টার্ড!' চিৎকার করে উঠল আসিফ। 'কি চাও তোমরা?'

'তথ্য। ডায়াগ্রাম সহ চার্টটা দিয়ে দিলেই মেয়েটাকে ফেরত পাবেন।'

দ্রুতগতিতে চিন্তা চলছে মাথার ভেতর। 'কেমন করে জানব স্বাতী সত্যিই তোমাদের হাতে আছে?'

'আপনি তা ভাল করেই জানেন।'

'স্বাতীর গুরুত্ব আমার কাছে অনেকখানি, সেটা নতুন করে বলার দরকার নেই,' একটু হাসার চেষ্টা করল আসিফ। 'তবে আমাকে একটু সময় দিতে হবে।' একটা রাত। শুধু আজকের রাতটা ওর দরকার!

'কতটা সময় দরকার আপনার? মিস চৌধুরী আঘাত পেয়েছেন, বেশ দুর্বল হয়ে গেছেন।'

আশঙ্কায় গলা বুজে গেল, দ্রুত নিজেকে সামলে নিল আসিফ। 'বিশ্বাস করি না। স্বাতী কোথায়? ওকে কথা বলতে দাও।'

'সেটা সম্ভব নয়।'

'তাহলে সকালে আবার ফোন কোরো।'

'তাস এখন আমাদের হাতে, আমরাই বলব কখন কি করতে হবে।'

'না,' শক্ত গলায় বলল আসিফ। 'তোমরা যা চাও, পৃথিবীতে একমাত্র আমার কাছেই তা আছে। তাই তাস এখনও আমারই হাতে রয়ে গেছে। আর শোনো, তোমাদের বস্‌কে বলো যদি স্বাতীর এতটুকু ক্ষতি হয় তবে গুণে গুণে তার মাশুল দিতে হবে। আগামীকাল সকাল ঠিক দশটায় ফোন করবে।' সমস্ত ইচ্ছেশক্তি জড়ো করে রিসিভারটা ক্রেড্‌লে আছড়ে ফেলল আসিফ, স্বাতীর সঙ্গে সূক্ষ্ম যোগাযোগের সূত্রটা ছিঁড়ে গেল।

একটু সামলে নিয়ে ড্যানের বাড়ির নাম্বার ঘুরাল। নাটালি ফোন ধরতে বলল, 'নাটালি, আমি আসিফ। হাতে একদম সময় নেই। ড্যানকে বলো যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব জর্জ টাউনের ডকে চলে যেতে। আমি ওখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করব। খুব জরুরী ব্যাপার। দেখা হলে সব বলব।'

কথা শেষ করে কেইমেন ব্র্যাকের হোটেলে ফোন করল আসিফ। রিসেপশনিস্ট ফোন ধরতে হোটেলের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। মহিলা লাইনে আসতে বলল, 'আমাকে হয়তো চিনতে পারবেন, আমার নাম আসিফ মাহমুদ। ক'দিন আগে আপনার হোটেলে ছিলাম। আপনার কি মনে আছে এক মহিলার ঘরে চোর ঢুকেছিল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন, কি ব্যাপার?' উদ্বিগ্ন শোনাল মহিলার গলা।

'চার্লি নামে এক ওয়েটার আছে, তার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই। অবশ্য যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে।'

'কিন্তু সে তো পুলিশকে সবই খুলে বলেছে।'

'এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, ম্যাডাম। আমার বান্ধবীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এটা আমার জীবনমরণের প্রশ্ন।'

'হায় আল্লাহ্!' আঁতকে উঠলেন মহিলা। 'আমি বুঝতে পারিনি···এক্ষুণি ডেকে পাঠাচ্ছি ওকে!'

'আমি এক্ষুণি রওনা হচ্ছি। ততক্ষণ ওকে আটকে রাখুন।'

সামির ফারুকি আর তার সঙ্গী বেরিয়ে যেতে বজ্রাহতের মত বিছানায় বসে রইল স্বাতী। না চাইতেই ওর সাংবাদিক জীবনের সবচেয়ে বড় স্টোরিটা এসে গেছে হাতের মুঠোয়। সামির ফারুকি যখন এর মধ্যে জড়িত, তখন বিশাল কোন ব্যাপার না হয়েই যায় না। যতদূর মনে হচ্ছে সামির ফারুকি ওর পেশা সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। কিন্তু এর মধ্যে আসিফের ভূমিকা কি? রুহীর দেয়া তথ্য যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে আসিফ এই অপরাধ চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। নাক বোঁচা গ্রুপের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে তা বুঝতে বুদ্ধি লাগে না। রুহীর সঙ্গে ওর কথোপকথন শুনে ফেলেছিল আসিফ, বুঝে ফেলেছিল স্বাতী জেনে গেছে সব। সেজন্যেই কি ওকে আটকে রাখা হয়েছে? কটেজ থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয়ই আসিফ এদেরকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল। তারপর সযত্নে ফাঁদ পাতা হয়েছে আর স্বাতী বোকার মত তাতে পা দিয়েছে।

দরজায় নক করল কেউ। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে ড্রেসিং টেব্‌লের উপর রাখা ক্রিস্টালের মূর্তিটা তুলে নিল স্বাতী। বাঁ হাতে মূর্তিটা পিঠের কাছে লুকিয়ে রেখে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল। উঁচু গলায় বলল, 'কাম ইন।'

ট্রে হাতে সাদা জ্যাকেট পরা স্টুয়ার্ড এসে ঢুকল। ট্রেটা টেব্‌লে নামিয়ে রেখে ভদ্রভাবে জানাল, মিস্টার ফারুকি শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন মিস চৌধুরী যেন খাবারটুকু উপভোগ করেন।

খাবার নয়, স্বাতীর দৃষ্টি কেড়ে নিল ট্রে-র এক কোণে রাখা রক্তলাল একটা তাজা গোলাপ।

## সতেরো

গোলাপের নিচে ছোট্ট একটা চিরকুট। এক হাতে তুলে নিয়ে পড়ল স্বাতী ঃ 'রাত আটটায় ডিনারে আপনার সঙ্গ কামনা করছি। সামির।'

ঢাকনা তুলে দেখল, একটা ডিশে বিরিয়ানি, সঙ্গে মুরগীর রোস্ট। ছোট্ট একটা বাটিতে কাস্টার্ড। টি-পটে চা। ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে, চেঁছেপুছে সবই খেয়ে ফেলল স্বাতী।

আটটা বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে স্টুয়ার্ড ওকে নিতে এল। ইতিমধ্যেই বাথরুমে গিয়ে গোসল সেরে নিয়েছে স্বাতী। মাথাটা এখনও একটু ধরে আছে, তবে হারানো শক্তি পুরোটাই ফিরে পেয়েছে। ডাইনিং হলের দরজায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ফারুকি। পরনে দামী ইভনিং জ্যাকেট, সঙ্গে স্ট্রাইপ দেয়া ম্যাচিং প্যান্ট। একমাথা কাঁচা-পাকা কোঁকড়া চুল, গভীর এক জোড়া চোখ। কম করেও ছ'ফিট লম্বা। এই অসম্ভব সুপুরুষ মানুষটির দিকে তাকিয়ে স্বাতী ভাবল, কিসের অভাবে এই লোক বিপথে এসেছে? সাফল্য তো এ লোকের কাছে মুঠোয় থাকার কথা, কেন তাকে আইনের বাইরে যেতে হলো?

সামিরের সঙ্গে চেয়ার টেনে ধরে স্বাতীকে বসাল ফারুকি। নিজে বসল ঠিক

উল্টোদিকের চেয়ারে। ক্রিস্টালের গ্লাসে নিজেই শ্যাম্পেন ঢেলে দিল। স্বাতী মাথা নেড়ে নিষেধ করাতে ইঙ্গিতে স্টুয়ার্ডকে কোমল পানীয় আনার নির্দেশ দিল।

'আমার ইয়াট পছন্দ হয়েছে আপনার?' অমায়িক ভাবে জানতে চাইল ফারুকি।

'দারুণ।' স্টুয়ার্ডের পরিবেশন করা ফলের রসের গ্লাসে চুমুক দিল স্বাতী। 'আপনি কি সব সময় ইয়াটেই থাকেন?'

'না। এটা আমার বিশ্রামের জায়গা।' হাসল সে। 'তা আপনি কেইমেনে কেন এসেছেন?'

'এমনি। বেড়াতে।'

'বাড়ি কোথায়?'

'ঢাকা। বাংলাদেশ।'

'হুঁ। আমি বেশ ক'বার ঢাকায় গেছি। তবে ঘুরে দেখার সময় হয়নি। আশা করি পরের বার আপনি আমাকে ঢাকা ঘুরিয়ে দেখাবেন।'

একে একে খাবার আসতে শুরু করল। ব্রয়েল্ড্ মাছ, রোস্ট-বিফ আর বেলজিয়ান সালাদ। সঙ্গে আলু ভাজা আর বেশ ক'রকম ব্রেড। খেতে খেতে নানা ধরনের আলাপ হলো, সাধারণত খাবার টেবলে যেধরনের কথাবার্তা হয় তার চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। খাবার শেষে স্টুয়ার্ড যখন পনির আর কাটা ফলের পাত্র পরিবেশন করে গেল, স্বাতী ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসল, 'আমাকে নিয়ে কি করবেন কিছু ভেবেছেন?'

মৃদু হাসল ফারুকী। 'সেটা নির্ভর করছে ডক্টর মাহমুদের উপর।'

অসুস্থ বোধ করল স্বাতী। তার মানে এই কিডন্যাপিঙের পিছনে সত্যিই আসিফের হাত আছে! আগে থেকে জানা থাকলেও তার জন্যে কষ্ট কম হলো না। অস্ফুটে শুধু বলে উঠল, 'তাহলে এর জন্যে আসিফই দায়ী!'

'অবশ্যই। ডক্টর মাহমুদের হাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। আমরা আশা করছি আপনার বিনিময়ে সেগুলো হাতে পাব আমরা।'

একটু যেন আশার আলো দেখা দিল। আসিফকে কি এরা ব্ল্যাকমেইল করছে? সাবধানে প্রশ্ন করল, 'কি ধরনের তথ্য?'

'রোবট সম্পর্কিত।'

'ওই রোবটগুলো?' হাসার চেষ্টা করল স্বাতী। 'ওগুলো তো খেলনার মত!'

'আপনার-আমার কাছে হয়তো খেলনা, কিন্তু কারও কারও কাছে সেগুলো অমূল্য।'

'কিন্তু এর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি? আপনার সঙ্গী ওই দক্ষিণ-এশিয়ান লোকগুলোই বা কে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ফারুকি। 'আপনাকে এর মধ্যে জড়াবার কোনরকম ইচ্ছে আমাদের ছিল না। বার বার সাবধান করা সত্ত্বেও কেন দ্বীপে রয়ে গেলেন?'

'আপনার সঙ্গের ওই লোকটা কি ইচ্ছে করেই আমার গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছিল? বাইক সহ আমাকে ফেলে দিয়েছিল?'

'চ্যাঙের কথা বলছেন তো? আরে না, ওসব নেহায়েত দুর্ঘটনা। ও ব্যাটা গাড়িই চালাতে জানে না।'

'কেইমেন ব্র্যাকের হোটেলে সাদা-চুলো লোকটাকে আপনিই পাঠিয়েছিলেন?'

'ও আপনার উপর নজর রাখছিল। আপনি সর্বক্ষণ ডক্টর মাহমুদের সঙ্গে লেগে রয়েছেন বলে আপনাকে ভয় দেখিয়ে খসিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আপনি হঠাৎ চ্যাঙকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন কেন?'

স্বাতী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, 'ওর কাছে আমি টাকা পাই যে! একশো ডলার। আমার গাড়ির ক্ষতিপূরণ। টাকা না দিয়েই পালিয়েছিল।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করল ফারুকি। 'মাত্র একশো ডলার? এর জন্যে জানের ঝুঁকি নিলেন?'

'একশো ডলার আপনার কাছে নগণ্য হতে পারে, আমার কাছে অনেক।' রাগী ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল স্বাতী। 'ওই গাড়িতে যে লোকগুলো ছিল, ওরা কারা, বলুন তো?'

'আমার মনে হয়না জেনে আপনার কোন লাভ হবে।' ফাঁদে পা দিল না ফারুকি। ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছে উঠে দাঁড়াল, 'চলুন, ডেকে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসি।'

ডেকে গেলে সাগরে ইয়াটের অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যাবে,

এই ভেবে আপত্তি করল না স্বাতী। কিন্তু ডেকে এসে তেমন কোন লাভ হলো না, শুধু বোঝা গেল তীর থেকে বহুদূরে কোথাও আছে ওরা। অনেক দূরে দূরে দু'একটা বোটের আলো, এছাড়া পুরো পৃথিবী আঁধারে ডুবে আছে। স্বাতী চিন্তা করার চেষ্টা করল আসিফ এই মুহূর্তে কি করছে। যতদূর মনে হচ্ছে কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে ওর কোন হাত নেই। কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এই লোকগুলোর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? কিছু একটা সম্পর্ক আছে তা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কোন কারণে আসিফ শেষ মুহূর্তে এদের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে। কেন?

'আবহাওয়া-বার্তায় বলেছে বড় ধরনের একটা ঝড় হবে।' আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল ফারুকি, অথচ দেখুন, এই মুহূর্তে চারিদিকটা কি চমৎকার দেখাচ্ছে! কে বলবে ঝড় আসছে?'

'জীবনটাই এরকম,' বিড়বিড় করে বলল স্বাতী। 'আজ সকালেই দিনটা কেমন চমৎকার ভাবে শুরু হয়েছিল। আর এখন আমি মাঝসাগরে বন্দী!' আড়চোখে তাকাল ফারুকির দিকে, 'আচ্ছা, কেইমেন থেকে কতদূরে আছি আমরা?'

'অনেক অনেক মাইল দূরে। পালাবার কোন পথ নেই,' হো হো করে হেসে উঠল সে।

'মাথা খারাপ! ভালমত সাঁতারই জানি না! আচ্ছা, আসিফ কি জানে আমাকে আপনারা আটকে রেখেছেন?'

সিঁড়ির দিকে রওনা হলো ফারুকি, 'ঘরে যাবার সময় হয়ে গেছে। কোন চিন্তা করবেন না, আসিফকে সব জানানো হয়েছে। আগামীকালই আশা করি দ্বীপে ফিরে যেতে পারবেন।'

সঙ্গে করে স্বাতীকে ওর ঘরে পৌঁছে দিল ফারুকি। একটু ইতস্তত করে স্বাতী বলল, 'দয়া করে দরজায় তালা লাগাবেন না। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।'

জোরে হেসে ফেলল ফারুকি। 'ঠিক আছে। সাঁতার কেটেও যখন পালাবার কোন উপায় নেই, তখন তালা না লাগালেও কোন অসুবিধা হবে না।' বিদায় নিয়ে চলে গেল সে।

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্বাতী। ঠিকই বলেছে

ফারুকি, পালাবার কোন উপায় নেই। কিন্তু তারপরেও চেষ্টা করতে হবে। এই গুণ্ডাদলকে বিশ্বাস করার কোন মানে হয় না। আসিফ ওদের কথা শুনলেও স্বাতীকে এত সহজে ছেড়ে দেবে না ওরা। ঘড়ি দেখল স্বাতী। মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরমধ্যে নিশ্চয়ই এরা ঘুমিয়ে পড়বে। কাছেধারে কোন বোট দেখলেই পানিতে ঝাঁপ দিতে হবে, এছাড়া কোন উপায় নেই। যদি শেষ পর্যন্ত বোটটা না ধরতে পারে? শিউরে উঠল স্বাতী। না, যে করেই হোক পালাতে হবে। তৈরি হয়ে নেয়া দরকার।

ক্লজিটগুলো ঘাঁটতে প্রচুর মেয়েলী পোশাক পাওয়া গেল। বোঝাই যাচ্ছে সামির ফারুকির ইয়াটে প্রায়শই মহিলা অতিথিরা রাত কাটান। লাল রঙের একটা বিকিনি বের করে পরে নিল স্বাতী। তার উপরে চাপাল ওর নিজের মার্কিনের ঢোলা শার্ট আর স্ল্যাক্স। ঘড়িতে অ্যালার্ম সেট করল রাত দুটোয়, ততক্ষণে নিশ্চয়ই সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুম এসে গেল তা নিজেই টের পেল না।

হঠাৎ করেই ঘুমটা ভেঙে গেল। অ্যালার্মের শব্দে নয়, অন্য কোন কারণে ঘুম ভেঙেছে। ঘড়ি দেখল স্বাতী, রাত ঠিক বারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। স্বাতী ভাবতে চেষ্টা করল ঘুমটা কেন ভেঙেছে। ঠিক তখনই ঠুক ঠুক শব্দ হলো। চমকে উঠে বসল স্বাতী, পোর্টহোলের দিক থেকে শব্দটা এসেছে। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে বলে পোর্টহোলের কাঁচের ওধারে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এক ছুটে পোর্টহোলের পাশে চলে এল স্বাতী।

কালো রঙের আবছা একটা ছায়া! আসিফ! ওয়েট স্যুট আর ডাইভিং হুড পরে আছে বলে চেহারা চেনার কোন উপায় নেই। অথচ আশ্চর্য, চিনতে স্বাতীর একটুও দেরি হলো না!

পোর্টহোলটা ভারী কাঁচে ঢাকা, কথা বললে কিছুই শোনা যাবে না। স্বাতী ইশারায় মাথার উপরের ডেকটা দেখাল, ওখানেই আসিফের সঙ্গে দেখা করবে। মাথাদের ভঙ্গিতে দু'পাশে মাথা ঝাঁকাল আসিফ। না, স্বাতীকে এ ঘরেই অপেক্ষা করতে হবে। হতাশ হলো স্বাতী, তবে রাজি হলো। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল আসিফ।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিল স্বাতী। সন্তর্পণে দরজাটা খুলল। আসিফের নিরাপদ লক্ষ্যের দুর্বার আকর্ষণে এক পা রাখল করিডরে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পা-

টা ফিরিয়ে আনল মাথার উপরে পায়ের শব্দ হতেই। পাহারাদার। তারমানে ইয়াটের সবাই ঘুমায়নি, অন্তত একজন জেগে আছে ওকে পাহারা দেবার জন্যে। আসিফ! ধরা পড়ে যাবে আসিফ!

অস্থির হয়ে খালি পায়ে করিডরে বেরিয়ে এল স্বাতী। দু'পাশের দরজাগুলো বন্ধ। স্বাতী জানে অন্তত দুটো ঘরে লোক আছে, সন্ধ্যায় শব্দ শুনেছে। তবে এই মুহূর্তে চারিদিকে নীরবতা বিরাজ করছে। পায়ে পায়ে করিডরের শেষপ্রান্তে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল স্বাতী। ঠিক মাথার উপর পায়ের শব্দ শোনা যেতেই ঝপ্ করে বসে পড়ল। ভয়ে শ্বাস নিতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

না, লোকটা নিচে নামল না। পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। স্বাতী উঠতে যাবে, ঠিক তক্ষুণি মৃদু ধস্তাধস্তির শব্দ পেল। পরমুহূর্তেই ভোঁতা শব্দ তুলে ভারী কিছু আছড়ে পড়ল ডেকে।

আসিফ! শিউরে উঠল স্বাতী। বিপদের কথা ভুলে গিয়ে দুই লাফে ডেকে উঠে এল। ফকফকে জোছনায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক, কিন্তু ডেকে কেউ নেই। উত্তেজনায় স্বাতীর গলা শুকিয়ে গেছে। খুঁজতে খুঁজতে ডেকের অন্য পাশে চলে এল, এঞ্জিনরুমের ছায়া পড়ে অন্ধকার হয়ে আছে এদিকটা। 'এই যে, এখানে!' নিচু স্বরে পিছন থেকে ডাকল আসিফ।

প্রচণ্ড চমকে উঠে টলে পড়ে যাচ্ছিল স্বাতী, পিছন থেকে আসিফ দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। হুড খুলে ফেলেছে আসিফ, পিঠের সঙ্গে বাঁধা অক্সিজেন ট্যাঙ্কটাও নেই। স্বাতী কিছু বলার আগেই আসিফ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'শ্-শ্-শ্! তোমার জন্যে ডাইভিঙ ইক্যুইপমেন্ট নিয়ে এসেছি। সাঁতার কাটতে পারবে তো?'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল স্বাতী। আসিফ দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে ওর পরনের পোশাকের দিকে তাকাতে স্বাতী সচেতন হলো। এই পোশাক পরে সাঁতার কাটার প্রশ্নই ওঠে না। একটু ইতস্তত করে দ্রুত হাতে শার্ট আর স্ল্যাক্সটা খুলে ফেলল স্বাতী। ভাগ্যিস, আগেই বিকিনিটা পরে নিয়েছিল ভেতরে। প্রথমে বিস্ময় তারপর কৌতুক উপচে পড়ল আসিফের দু'চোখে, তবে কোন মন্তব্য করল না। স্বাতীকে রেলিঙের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে নিচের দিকে ইঙ্গিত করল। স্বাতী ঝুঁকে দেখল, ইয়াটের গায়ে একটা আঙটার সঙ্গে বাঁধা রশির মাথায় ঝুলছে একগাদা ডাইভিঙ ইক্যুইপমেন্ট।

আসিফ ফিসফিস করে বলল, 'আগে আমি নিচে নামছি। আমি তৈরি হবার পর তুমি নামবে, ঠিক আছে?'

রেলিঙ টপকে নিঃশব্দে সাগরে নেমে গেল আসিফ। নিচু হয়ে বসে চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখল স্বাতী, ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় হৃৎপিণ্ডটা বুকের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম করছে। ঠিক দু'মিনিট পর আসিফ ডাকল, 'এসো!'

রেলিঙ টপকে কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল স্বাতী, তারপর আস্তে করে পিছলে নেমে পড়ল জলে। আসিফ ওকে ধরে ফেলল, দ্রুতহাতে ডাইভিঙ ইক্যুইপমেন্ট পরাতে লাগল। এতবড় ভারী একটা বোঝা বয়ে আনতে আসিফকে কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে, তা আঁচ করতে স্বাতীর দু'চোখ জলে ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিল, এখন চোখের জল ফেলার সময় নয়। অক্সিজেন ট্যাঙ্কটা পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হলো আসিফ, বলল, 'নেহায়েত দরকার না পড়লে এটা ব্যবহার করো না, কেমন? আমার ঠিক পিছনে থাকবে।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

উত্তর না দিয়ে ডুব দিল আসিফ। মাস্কটা কপাল থেকে নামিয়ে ওকে অনুসরণ করল স্বাতী। স্বচ্ছ উষ্ণ জল, সামনে আসিফকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট মিনোলাইক মাছের একটা ঝাঁক ওদের সঙ্গ নিয়েছে। উজ্জ্বল কমলা রঙের একজোড়া মাছ বিশাল কাফেলাটা দেখে থমকে দাঁড়াল।

'অরোরার' সঙ্গে দূরত্বটা যতই বাড়ছে ততই স্বাতীর ভয় কমে আসছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে সামির ফারুকির চেয়ে আসিফ অনেক বেশি নিরাপদ। আর যাই হোক, আসিফ ওর কোন ক্ষতি করবে না, এটুকু বিশ্বাস স্বাতীর আছে। তবে ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না, সেটাও সত্যি।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর, স্বাতী যখন ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, আসিফ উপর দিকে উঠতে শুরু করল। ওরা পৌঁছে গেছে। আর কোন বিপদ নেই।

ভুশ করে ভেসে উঠল স্বাতী। 'নাটালির' প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ড্যানকে দেখে দু'চোখ ভিজে এল। দু'হাতে স্বাতীকে টেনে তুলল ড্যান, আবেগে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে।

'ড্যান...আমি ভেবেছিলাম আর কখনও দেখা হবে না!' চোখের জল মুছল

স্বাতী। পায়ে এক ফোঁটা শক্তিও অবশিষ্ট নেই। টলে পড়ে যাচ্ছে বলে শক্ত করে ধরে রাখল ড্যান।

'তোমার জন্যে চিন্তায় মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছিল আমাদের,' এক হাতে স্বাতীর অক্সিজেন ট্যাঙ্ক খুলে নিচ্ছে ড্যান। 'তুমি ভাল আছ তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে খুঁজে পেলেন কি করে?'

'সেসব কথা পরে হবে,' গম্ভীর ভাবে বলল আসিফ। পিঠ থেকে অক্সিজেন ট্যাঙ্কটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল। 'ড্যান, স্বাতী ক্লান্ত। ওর ঘুমের ব্যবস্থা করো।'

বড় সাদা একটা তোয়ালে জড়িয়ে স্বাতীকে প্রায় বয়ে নিয়ে চলল ড্যান। এতক্ষণ জলে থাকার পর হঠাৎ করেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে। কোনরকমে স্বাতী বলল, 'ওরা যদি পিছু ধাওয়া করে!'

'পাগল!' হেসে উড়িয়ে দিল ড্যান সম্ভাবনাটা। স্বাতী আগে যে ঘরটায় কাপড় বদলেছিল, সেই একই ঘরে নিয়ে এল ওকে ড্যান। এক প্রস্থ শুকনো কাপড় দিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে কফি নিয়ে আসছি, ততক্ষণে ভেজা কাপড়টা বদলে ফেলো।'

'ধন্যবাদ,' অনেক কষ্টে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল স্বাতী। কিন্তু সমস্ত হৃদয় জুড়ে একটাই প্রশ্ন, আসিফ ওকে এড়িয়ে চলছে কেন?

ড্যান যখন কফির কাপ হাতে ঘরে ঢুকল, স্বাতী তখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন।

ড্যান ডেকে ফিরে এলে আসিফ জিজ্ঞেস করল, 'স্বাতী, ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ, ঘুমে কাদা। "অরোরায়" কি কি ঘটেছে কিছু বলেছে?'

মাথা নাড়ল আসিফ, 'না, কথা বলার সময় হয়নি। ড্যান, গ্র্যাণ্ড কেইমেনে চলো। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'কি?' অবাক হয়ে গেল ড্যান। ভুরু কুঁচকে বলল, 'গ্র্যাণ্ড কেইমেন! আশ্চর্য! তুমি ভুলে গেছ হিউগোর শেষ টেস্টের রেজাল্টটা এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। শুধু শুধু এখন কেইমেনে যাবার কোন মানেই হয় না।'

রাগে আসিফের দু'চোখ জ্বলে উঠল। 'যা বলছি তাই করো, ড্যান। স্বাতীকে নিরাপদে প্লেনে তুলে না দেয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।' কথা না বাড়িয়ে স্বাতীর ঘরে চলে এল আসিফ। মাথার নিচে হাত দিয়ে আগোছাল ভঙ্গিতে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা, ঠিক বাচ্চা একটা মেয়ের মত দেখাচ্ছে। মমতায়

আর্দ্র হয়ে উঠল আসিফের বুকের ভেতরটা। কি নিষ্পাপ আর কোমল দেখাচ্ছে ওকে! বড় ইচ্ছে করল বালিশের উপর ছড়িয়ে পড়া চুলের অরণ্যে একবার হাত বুলায়। হাত বাড়িয়েও শেষ মুহূর্তে টেনে নিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে।

## আঠারো

বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল স্বাতীর। হাতমুখ ধুয়ে ডেকে উঠে এল। মেঘলা আকাশ, জোর বাতাস বইছে। মনে পড়ল সামির ফারুকি ঝড়ের কথা বলছিল। হুইল-হাউসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ড্যান আর আসিফ। বিছানার চাদরটা ভাল করে শরীরে জড়িয়ে নিল। 'এই যে,' ডাকল স্বাতী, 'একটা শার্ট আর ট্রাউজার হবে? গোসল করব। এটা বালিতে কিচকিচ করছে,' পরনের পোশাকের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'নিচের স্টোরেই পাবে,' একটা চাবির রিঙ ছুঁড়ে দিল ড্যান।

নিচে এসে আন্দাজে স্টোর রুমটা খুঁজে নিয়ে চাবি ঢুকাল দরজার ফুটোয়। খুলেও গেল সেটা। ভেতরের দেয়ালের তিন দিকে তাক, একদিকে হ্যাঙারে ঝুলছে কাপড়-চোপড়। তাকগুলো দরকারী-অদরকারী জিনিসপত্রে বোঝাই। জিনস্ প্যান্ট আর একটা খয়েরী শার্ট বেছে নিল স্বাতী। ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই তাকের উপর রাখা জিনিসটা চোখে পড়ে গেল।

ছোট্ট একটা পিস্তল। মন্ত্রমুগ্ধের মত তুলে নিল স্বাতী। আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে কাণ্ড চালাবার মত জ্ঞান আছে ওর। পুরানা পল্টনের শ্যূটিং রেঞ্জে একসময় নিয়মিত প্র্যাকটিস করত স্বাতী। নেড়েচেড়ে দেখল, বুলেট নেই চেম্বারে। ধুলো পড়ে নোংরা হয়ে আছে। শুঁকে দেখল, বারুদের গন্ধও নেই। বহুদিন ব্যবহার করা হয়নি পিস্তলটা। কার্ট্রিজের বাক্সটাও পেয়ে গেল একটু খুঁজতেই। পিস্তলটা লোড করে প্যান্টের পকেটে রেখে দিল। আসিফের বিরুদ্ধে এটা ব্যবহার করতে

হবে না তো? তিক্ত হাসল স্বাতী নিজের মনেই।

গোসল সেরে বাথরুম থেকে বেরুতে দেখল, আসিফ ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। পকেটের পিস্তলটার কথা ভেবে স্বাতীর হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে, আসিফ।'

'হাতে সময় খুব কম, স্বাতী,' স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। 'আমরা গ্র্যাণ্ড কেইমেনের কাছে চলে এসেছি। প্রথম ফ্লাইটটা ধরেই তুমি কেইমেনের বাইরে চলে যাবে।'

'এখানে কি ঘটছে আমার তা জানা দরকার।'

নীরবে কিছুক্ষণ ওকে জরিপ করল আসিফ। অবশেষে বলল, 'ঠিক আছে, ডেকে চলো। এঞ্জিনটা গোলমাল করছে, ওটা দেখা দরকার। তোমাকেও এক কাপ কফি বানিয়ে দেয়া যাবে।'

দুটো টোস্ট আর কফি খেতে খেতে স্বাতী জিজ্ঞেস করল, 'আমি কোথায় আছি তা জানলে কেমন করে?'

'তোমার কিডন্যাপাররা ফোন করেছিল।'

'ওরা কি তোমার বন্ধু?'

কাজ থামিয়ে চট করে স্বাতীর দিকে ফিরল আসিফ, 'ওরা বুঝি তাই বলেছে?'

'ওরা বলেছে তোমার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে।' মনে মনে স্বাতী বলল, সত্যি কথা বলো, আসিফ!

স্বাতীর উল্টোদিকে চেয়ার টেনে বসল সে। গম্ভীর ভাবে বলল, 'ওরা মিথ্যে বলেছে।'

ধৈর্য হারাল স্বাতী। 'ওরা মিথ্যে বলেছে? কই, তুমি তো একবারও বলোনি যারা আমাকে হুমকি দিচ্ছিল তাদের সঙ্গে তোমার দিব্যি জানাশোনা আছে!'

আসিফ স্বাতীর হাত ধরতে গেলে হাতটা সরিয়ে নিল সে। ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল আসিফের ক্লান্ত রাত জাগা চেহারাটা। 'ওরাই যে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে তা আমি জানতাম না, স্বাতী। জানার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে আমি গ্র্যাণ্ড কেইমেনে ফেরত পাঠিয়েছিলাম, তোমারই নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে।'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে তুমি তাল দিচ্ছ কেন?'

'সবকিছু এখন বলা যাবে না, স্বাতী। তবে দেশ থেকে আসার সময় পুলিশে রিপোর্ট করেছিলাম আমি। কিন্তু কোন সাহায্য পাইনি। ওরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে।'

'এখন কি করবে ঠিক করেছ?' জানতে চাইল স্বাতী।

'ওদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পেরেছ?'

'ফারুকি বলছিল তোমার কাছ থেকে কিসের যেন তথ্য নেবে।'

'ফারুকি!' অবাক হলো আসিফ। 'সে আবার কে?'

স্বাতীও কম অবাক হয়নি। ওদের সঙ্গে এত দহরম মহরম অথচ পালের গোদাকেই আসিফ চেনে না! ' "অরোরার" মালিক। পাকিস্তানী। তুমি তাকে কখনও দেখোনি?'

মাথা নাড়ল আসিফ। 'না। কিছুই বুঝতে পারছি না। এ লোক কোত্থেকে এল! ভাগ্যিস, চার্লির কথামতই "অরোরা"কে খুঁজে বার করতে পেরেছি!'

স্বাতী বুঝল আসিফ প্রসঙ্গ বদলাতে চাইছে। 'যাই হোক, আমাকে উদ্ধারের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ম্লান হাসল আসিফ। 'ঠাট্টা করছ? আমিই যে তোমাকে এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি!'

'নাটালি' জর্জ টাউনে ভিড়তে স্বাতীকে বিদায় জানাল আসিফ। 'আমাকে বোটেই থাকতে হবে, তাই তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না। যত তাড়াতাড়ি পারো দ্বীপ ছেড়ে চলে যাও। ঢাকায় পৌঁছেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব, ঠিক আছে?' তারপর ড্যানের দিকে ফিরে বলল, 'স্বাতীকে নিয়ে সোজা কটেজে চলে যাও। তারপর নিজে ওকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। প্লেন আকাশে না ওঠা পর্যন্ত নড়বে না, বুঝতে পেরেছ?'

আপত্তির ভঙ্গিতে কোমরে হাত দিল ড্যান, 'এই প্রকাশ্য দিনের আলোয় কে ওর ক্ষতি করতে যাবে?'

'গতকাল তো করেছে!' আপত্তি কানে তুলল না আসিফ।

আসিফের গাড়িতে করেই স্বাতীকে কটেজে পৌঁছে দিল ড্যান। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'বোটের এঞ্জিনের একটা পার্টস কিনতে হবে। তুমি কাপড় জামা গুছিয়ে নাও, ততক্ষণে আমি দোকানে একটা ফোন করছি।'

'কিন্তু আপনার তো এখানে থাকার কোন দরকার নেই। আমি নিজেই এয়ারপোর্টে চলে যেতে পারব একটা ট্যাক্সি ডেকে।'

'আসিফ কি বলেছে শুনেছ তো!' দু'হাত শূন্যে তুলে অসহায়ের মত ভঙ্গি করল ড্যান।

'ওর কথা বাদ দিন। সবকিছুতেই ওর বাড়াবাড়ি।' একটু থেমে স্বাতী জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, 'ও কি কোন ধরনের বিপদের মধ্যে আছে?'

'বিপদ! কি বিপদ?'

' ''অরোরা'' আর তার আরোহীদের সঙ্গে কিছু ঘাপলা হয়নি তো?'

'মিস্টার ফারুকি কিছু বলেছে?'

'আপনি এ নামটা জানলেন কেমন করে?' অবাক হলো স্বাতী।

একটু যেন থমকে গেল ড্যান, তারপর বলল, 'চার্লি বলেছে।' স্বাতীর কাঁধে চাপড় দিল আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে। 'কিচ্ছু চিন্তা কোরো না, আসিফ বুদ্ধিমান ছেলে। আমি ওকে অনেক বছর ধরে চিনি। ও কোন বাজে কাজ করতেই পারে না।'

'আপনি একটু ওকে দেখে রাখবেন,' আবেদনের সুরে বলল স্বাতী।

'কথা দিচ্ছি, আমি থাকতে আসিফের কোন ক্ষতি হবে না,' স্বাতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ড্যান।

এয়ারপোর্টে ফোন করে জানা গেল পরের ফ্লাইটটা ছাড়তে আরও চার ঘণ্টা বাকি। স্বাতী সহজেই ড্যানকে চলে যাবার জন্যে রাজি করিয়ে ফেলল, 'এতক্ষণ ধরে শুধু শুধু বসে থাকার কোন দরকার নেই। আপনি আপনার কাজে যান। আমি ট্যাক্সি ডেকে দশ মিনিটের মধ্যেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে যেতে পারব।'

'হুঁ...' দুশ্চিন্তায় ভুগছে ড্যান, নিরুপায়ের মত বলল, 'বড়সড় একটা ঝড় আসছে। তার আগেই এঞ্জিনটা ঠিক করা দরকার। নাহলে সাগরে বিপদে পড়ব।'

'আপনারা আবার সাগরে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। হিউগো এখনও সাগরে। ঠিকমত সিগন্যালও পাঠাচ্ছে না। ঝড়ের আগেই ওকে তুলে আনতে হবে। কোথায় যে আছে, তাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। আসিফ বোটে বসে ওর অবস্থান জানার চেষ্টা করছে।'

'তাহলে আপনি এখানে বসে সময় নষ্ট করছেন কেন? তাড়াতাড়ি চলে

যান!' তাড়া দিল স্বাতী। 'কতক্ষণ লাগবে এঞ্জিন ঠিক করতে?'

'ঘণ্টা তিনেকের কম নয়।' স্বাতীর কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বিদায় জানাল ড্যান। 'ভাল থেকো, স্বাতী। আমি আর নাটালি তোমাদের দু'জনের মধুচন্দ্রিমার ব্যবস্থা করে রাখব।'

ড্যান চলে গেলে কটেজে নিজের ঘরে ঢুকল স্বাতী। মনে হলো যেন এক যুগ পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। অথচ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগেই রাগের মাথায় বেরিয়ে পড়েছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খেয়াল হলো পরনে ড্যানের পোশাক। ঢোলা শার্টটা নেমে এসেছে হাঁটুর নিচে, প্যান্টের অবস্থাও তথৈবচ। ইশ্, এখন পোশাকগুলো কিভাবে ড্যানকে ফেরত পাঠানো যায়! একটু আগে মনে হলেও ড্যানকে দিয়ে দিতে পারত। দ্বিতীয় সমস্যা পিস্তলটা। বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত ড্যানকে বলা হয়নি চৌর্যবৃত্তির বৃত্তান্ত। তবে সেটাও ফেরত দেয়া দরকার। আর যাই হোক, পিস্তল সঙ্গে করে তো আর প্লেনে ওঠা যাবে না। অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি প্লেনে ওঠার পরিকল্পনা স্বাতীর নেই। ততক্ষণ ওটা সঙ্গে থাকুক ইন্স্যুরেন্স হয়ে।

ঘড়ি দেখল স্বাতী। অনেক আগেই চাচার ফ্লাইট কেইমেনে পৌঁছে গেছে। হলিডে ইনে ফোন করে জানা গেল উনি রিজার্ভ করা ঘরেই উঠেছেন, তবে এই মুহূর্তে হোটেলে নেই। স্বাতী নিজের নামে আর একটা রুম বুক করল। ফোন করে একটা ট্যাক্সি ডাকল। তারপর পোশাক বদলে দ্রুত মালপত্র গুছিয়ে ফেলল। ব্যাগ-ব্যাগেজ সহ পর্চে এসে দাঁড়াতেই ট্যাক্সি এসে গেল।

হলিডে ইন হোটেলটা সেভেন-মাইল-বীচে, পৌঁছতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগল না। চাচা তখনও ঘরে ফেরেননি। রিসেপশনিস্টের কাছে মেসেজ দিয়ে রাখল যেন তিনি ফিরলেই ওর ঘরে ফোন করেন। নিজের ঘরে এসে মালপত্রগুলো এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে অস্থির পায়ে পায়চারি শুরু করল স্বাতী। প্রচণ্ড ইচ্ছে করছে এক ছুটে আসিফের কাছে চলে যেতে। যদি কোন ভাবে সবার অজান্তে 'নাটালিতে' উঠে পড়া যায়...

ক্রি-ই-ই-ং! এক ঝটকায় রিসিভার তুলে নিল স্বাতী। চাচা। 'কি রে, মা, কেমন আছিস্? তুই এখনও কেইমেনে কি করছিস? রিসেপশনিস্টের কাছে...

'চাচা, আমি এক্ষুণি আপনার ঘরে যাচ্ছি!' বলেই ফোন নামিয়ে রেখে তিনশো এক নাম্বার রুমের উদ্দেশে ছুটল স্বাতী।

শামসুল হকের পোশাকে লম্বা যাত্রার চিহ্ন, কপালে বাড়তি কয়েকটা বলিরেখা, এলোমেলো চুল। বোঝাই যাচ্ছে উদ্বেগের মধ্যে আছেন, এখনও বিশ্রাম নেবার সময় হয়নি। স্বাতীকে দেখে আদর করে কপালে চুমু খেলেন। 'কোন ঝামেলায় পড়িসনি তো রে, মা? আমাকে এক্ষুণি একবার বেরুতে হবে। তুই না হয় ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর।'

'না, চাচা। তোমাকে এক্ষুণি সব শুনতে হবে, হাতে একদম সময় নেই।' একে একে আসিফ, হিউগো, 'অরোরা' আর সামির ফারুকীর কথা খুলে বলল স্বাতী অল্প কথায়। 'অরোরাকে' সাগরের কোনদিকে পাওয়া যাবে তাও জানাল। শুধু চেপে গেল আসিফের সঙ্গে ওর হৃদয়-বিনিময়ের প্রসঙ্গটুকু আর কিডন্যাপের কথা।

শুনতে শুনতে শামসুল হকের চোখ কপালে উঠল। 'এত কিছু তুই জানলি কিভাবে?'

'সে অনেক কথা। কিন্তু, চাচা, আসিফ মাহমুদ কি সত্যিই ক্রিমিন্যাল?'

'যতদূর জানা গেছে সে নেভীর টপ সিক্রেট তথ্য বিক্রি করছে বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে। চট্টগ্রামে বিদেশী কাউন্টার এজেন্টদের সঙ্গে ওকে দেখা গেছে বেশ ক'বার।'

'কিন্তু এমনও তো হতে পারে ও নির্দোষ,' চাচাকে নয়, আসলে নিজেকেই বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে স্বাতী। 'চট্টগ্রামে নাকি পুলিশে রিপোর্ট করেছিল···আচ্ছা, চাচা, তুমি এখানে কেন এসেছ?'

'মারণাস্ত্রটা যাতে বিদেশীদের হাতে না পড়ে, সেটা নিশ্চিত করতে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পত্র পেতে একটু দেরি হয়ে গেল, নাহলে আরও আগেই পৌঁছে যেতাম। ঢাকা থেকেই এখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। পুলিশ চীফ আশ্বাস দিয়েছেন সব ধরনের সহযোগিতা করবেন। পুলিশ চীফের সঙ্গেই এখন কোস্টগার্ড প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে "অরোরা"-কে ধরতে পারলেই অর্ধেক কাজ কমে যাবে। অপরাধীদের জ্যান্ত ধরতে পারলে শত্রুদের বেকায়দায় ফেলা যাবে।'

'চাচা, আমার এখনও মনে হচ্ছে ডক্টর মাহমুদ নির্দোষ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্বাতী। 'কি প্রমাণ আছে তোমাদের কাছে?'

'ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সই আমাদেরকে প্রথমে সাবধান করে। আশেপাশের

বেশ কয়েকটা দেশের ডিফেন্স ডক্টর মাহমুদের আবিষ্কারের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তখন থেকেই আমরা নজর রাখতে শুরু করি এবং এদের মধ্যে যোগাযোগটা ধরা পড়ে যায়।'

'তার মানে তোমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই!' স্বাতীর চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাল।

'কি বলছিস!' বিরক্ত হলেন শামসুল হক। 'এক জোট যদি নাই হবে, তাহলে শত্রুরা ওর পিছু নিয়েছে জেনেও মাহমুদ কেন ওর পরীক্ষা চালিয়ে যাবে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে! শোন্, আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে। তুই কি তোর কাকাই থাকবি?'

'না, আমি আসিফের সঙ্গে থাকব।'

'কি বললি? কার সঙ্গে?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন শামসুল হক। তারপর ধীরে ধীরে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল তাঁর দুশ্চিন্তামাখা ঠোঁটের কোণে। 'তোর উপরে আমার বিশ্বাস আছে, তুই বোকার মত কোন কাজ করবি না। শুধু নিজের দিকে লক্ষ্য রাখিস।' স্বাতীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

শামসুল হক বেরিয়ে গেলে চোখের জল মুছতে মুছতে স্বাতীর মনে পড়ল, এতক্ষণে একবারও ও মা, বাবন কিংবা রুহী কেমন আছে তা জানতে চায়নি! আশ্চর্য! ক'দিনের মধ্যেই কত বদলে গেছে সে!

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিল স্বাতী। সোজা চলে এল ডকে। 'নাটালি' এখনও তীরেই আছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তার মানে এঞ্জিন এখনও ঠিক হয়নি। একটা আইসক্রিম-কার্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে 'নাটালিকে' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এতদূর থেকেও ডেকে আসিফকে পরিষ্কার চিনতে পারল স্বাতী, দু'তিনজন ক্রুকে কি সব নির্দেশ দিচ্ছে। ড্যানকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ফুটপাতে হাঁটতে হাঁটতে এক অবসরপ্রাপ্ত নাবিক স্বাতীকে ঘুরে ঘুরে দেখছে, রসালো মন্তব্য করছে। চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ব্যাগ থেকে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট বের করে শূন্যে নাড়ল স্বাতী। 'ওই বোটে উঠে ঝামেলা বাধাবার জন্যে এটা দিয়ে দিতে রাজি আছি আমি। বেশিক্ষণ নয়, আমি লুকিয়ে বোটে উঠে যাওয়া পর্যন্ত ওদেরকে ব্যস্ত রাখলেই চলবে। রাজি?'

## উনিশ

নোটটা পকেটে গুঁজে ষণ্ডামার্কা নাবিক দুই লাফে 'নাটালি'র ডেকে উঠে হল্লা শুরু করল, 'কই? আমার পাওনা টাকা কই? দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে...' মুহূর্তের মধ্যে গ্যাঞ্জাম বেধে গেল। আসিফ আর তার লোকজন প্রথমে কিছু বুঝতেই পারল না, তারপর রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটা একটানা চেঁচিয়েই চলল। ড্যানও ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ডেকে।

সুযোগ বুঝে লাফিয়ে ডেকের অন্যপ্রান্তে নেমে গেল স্বাতী। কেউ ওকে লক্ষ্য করল না, সবাই মাথা গরম আগন্তুককে নিয়ে ব্যস্ত। রেলিঙের পাশ ঘেঁসে উবু হয়ে এক ছুটে চলে এল লোয়ার ডেকে নামার সিঁড়িতে। নিচে নামতে নামতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, যাক, কেল্লা ফতে। আর ধরা পড়ার আশঙ্কা নেই। একটা ক্লজিট খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। বড় বড় কয়েকটা ক্রেটের আড়ালে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। নড়াচড়া করার জায়গা নেই, তবে দরজা খুললেও ওকে কেউ দেখতে পাবে না। ভ্যাপসা গরম আর দুর্গন্ধ ছাড়া অন্য কোন অসুবিধাও নেই। এখন শুধু অপেক্ষা করার পালা।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, স্বাতী তা বলতে পারবে না। ঘুম ভাঙল যখন পায়ের নিচের কাঠের মেঝে কাঁপতে শুরু করেছে। স্টার্ট নিয়েছে 'নাটালি', এক্ষুণি চলতে শুরু করবে। ভয়ঙ্কর দুর্বল লাগছে। পেটে প্রচণ্ড খিদে। এতক্ষণে মনে পড়ল সকালের চা টোস্টের পর পেটে আর কিছুই পড়েনি। উঠে দাঁড়াতে যেতে শেলফে মাথা ঠুকে গেল। ককিয়ে উঠে আবার বসে পড়ল স্বাতী। এতক্ষণ একভাবে বসে থাকার ফলে হাত-পা ব্যথা হয়ে গেছে, মাথাও ব্যথা করছে। খুঁজতে খুঁজতে একটা বাক্সের ভেতর চিনির স্টক পেয়ে গেল। প্যাকেট ছিঁড়ে মুঠো মুঠো চিনি গিলে নিল। পেটের খিদে না মিটলেও আগের মত আর কষ্ট হচ্ছে না। মাথা ব্যথাও কমে গেছে।

'নাটালি' চলতে শুরু করার প্রায় বিশ মিনিট পর ক্লজিট থেকে বেরিয়ে এল স্বাতী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভেতরে ঢুকে যেতে হলো কারও পায়ের শব্দ শুনে। কাছাকাছি কোথাও থামল তারা।

'ঝড়ের কি অবস্থা কিছু জানো?' আসিফের কণ্ঠ।

জবাব দিল ড্যান, 'এদিকেই ধেয়ে আসছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবে। আমার মনে হয় ঝড় থামা পর্যন্ত কেইমেন ব্র্যাকে অপেক্ষা করাই ভাল। আমার বাড়িতেই বিশ্রাম নেয়া যাবে।'

'তাহলে একটা লাইফ-র‍্যাফ্‌ট নিয়ে একাই ভেসে পড়ো তুমি,' উষ্ণকণ্ঠে বলল আসিফ। 'ভাল করেই জানো নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই। ওই বেজন্মাগুলোর আগে আমাকে হিউগোর কাছে পৌঁছতেই হবে।'

হাঁটতে শুরু করেছে ওরা, ড্যানের কণ্ঠ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ' "অরোরার" মত দামী একটা ইয়াট নিয়ে কিছুতেই এই ঝড়ের মধ্যে সাগরে যাবে না ওরা···কথা দিচ্ছি ঝড় থামার পরই···'

আসিফ বলল, 'সব ক্রুদের ছেড়ে দিলাম···তুমি ছাড়া বোটে কেউই নেই···আমাকে যেতেই হবে···' আর কিছু শোনা গেল না।

ক্লজিট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল স্বাতী। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ, অথচ এখনও সন্ধে হয়নি। আসিফ আর ড্যানকে দেখা যাচ্ছে হুইল-হাউসের ভেতর। পিছন ফিরে আছে ওরা। হিউগোকে উদ্ধার করার জন্যে আসিফ কেন এত উতলা হয়ে আছে? ও কি সত্যিই চায় না ফাকফির লোকজনের হাতে পড়ুক ওটা? নাকি ভয় পাচ্ছে দাম না দিয়েই ওরা হিউগোকে চুরি করে নেবে? বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। আরামে ডেকে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল স্বাতী।

ঝড়ের জন্যে ড্যানকে ভয় পেতে দেখে বিরক্ত হলো আসিফ। সন্দেহ নেই ঝড়টা বেশ বড়সড়ই। কিন্তু যে কোর্স ধরে ওরা এগুচ্ছে, তাতে হিউগোকে তুলে আনার জন্যে হাতে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত যদি তোলা না যায়, আসিফ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, হিউগোকে ধ্বংস করে দেবে সে।

বাতাস এবং এঞ্জিনের শব্দের জন্যে চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে। 'এঞ্জিনের কি অবস্থা, ড্যান?'

'বেশি ভাল না,' তেমনি চেঁচিয়ে জবাব দিল ড্যান।

'আমার কানে তো কোন ত্রুটি ধরা পড়ছে না। কেন যেন মনে হচ্ছে হিউগোকে উদ্ধার করার ব্যাপারে তোমার আপত্তি আছে।' হকচকিয়ে মুখ তুলে ওর দিকে চাইল ড্যান, ওর চোখে স্পষ্ট ভয়। অবাক হলো আসিফ। 'কি হয়েছে, ড্যান? কিছু বলবে?'

'প্রচণ্ড ঝড় আসছে, আসিফ। আমি "নাটালিকে" তীরে নিয়ে যাচ্ছি।'

'মুরগীর মত কোরো না তো!' ধমকে উঠল আসিফ। ঠেলে ওকে হুইলের সামনে থেকে সরিয়ে দিল। 'আমি হুইল ধরছি। তুমি ভুলে গেলেও আমি জানি কিভাবে চালাতে হয়,' 'নাটালিকে' পয়সা দিয়ে ভাড়া করেছে আসিফ, ড্যান ভাল করেই জানে ঝড়ে এর কোন ক্ষতি হলে আসিফই ক্ষতিপূরণ দেবে। গজগজ করতে করতে চার্ট দেখতে লাগল সে।

'হুইল ছেড়ে চলে এসো, আসিফ,' পিছন থেকে ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠল ড্যান।

কথা বলার ভঙ্গিতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল, তাই ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখতে গেল আসিফ। তখনই চোখে পড়ল ড্যানের হাতে একটা ল্যুগার। বিস্ময়ে শ্বাস নিতে ভুলে গেল আসিফ।

'কথা কানে গেছে?' হিসহিস করে উঠল ড্যান। 'এটা আমার বোট। আমার বোট ঝড়ের মধ্যে যাবে না।'

কাষ্ঠহাসি হাসল আসিফ। পরিস্থিতিটা লঘু করার জন্যে হাসিমুখেই বলল, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? নাহয় আজ "নাটালিকে" তোমার কাছ থেকে কিনেই ফেলব। তার পরেও হিউগোকে আমার তুলে আনতেই হবে।'

এক পা এগিয়ে এসে ল্যুগারটা ডানদিকে নাড়ল ড্যান। 'আমি ঠাট্টা করছি না। হুইল থেকে সরে যাও।'

ভয়ে নয়, বিরক্ত হয়ে পিছু হটে গেল আসিফ। বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কি হয়েছে, ড্যান? এমন করছ কেন?'

ল্যুগার উঁচিয়ে রেখেই অন্য হাতে হুইল ঘোরাতে শুরু করল ড্যান। 'আমরা তীরে ফিরে যাচ্ছি। প্রশ্ন করে সময় নষ্ট কোরো না।'

ওদিকে চোখের কোণে স্বাতীকে হুইল-হাউসে ঢুকতে দেখে আসিফের 'অধিক শোকে পাথরের' মত অবস্থা। দু'হাতে একটা ছোট্ট পিস্তল ধরে আছে

স্বাতী! 'হাতের জিনিসটা ফেলে দাও, ড্যান,' আদেশের সুরে বলে উঠল স্বাতী।

প্রচণ্ড চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াতে গেল ড্যান, কিন্তু তার আগেই বিদ্যুৎগতিতে ল্যুগারটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে স্বাতী। পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দূরে।

'স্বাতী!' ঢোক গিলে হাসার চেষ্টা করল আসিফ। 'তুমি একদম সময় মত এসে পড়েছ। ড্যানের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

'ড্যান একা না, তোমারও মাথা খারাপ হয়েছে। যাও, ড্যানের পাশে গিয়ে দাঁড়াও তুমিও। কোন চালাকি করবে না,' কঠিন স্বরে বলল স্বাতী। এদিকে ভেতরে ভেতরে ভয়ে কাবু হয়ে গেছে, তা মোটেই বুঝতে দিল না।

নিমেষে রক্তশূন্য হয়ে গেল আসিফের মুখটা। যে সন্দেহটা ক'দিন ধরে ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, তাই সত্যি হয়েছে। স্বাতী ওদেরই লোক! 'তারমানে কিডন্যাপিঙের ঘটনাটা সাজানো ছিল!'

স্বাতী ঠিক বুঝতে পারল না আসিফ কি বলতে চাইছে। একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোমরা দু'জন এখানে কি করছ জানি না, কিন্তু এখন থেকে আমার কথাই তোমাদেরকে শুনতে হবে।'

'স্বাতী...' আবেদনের ভঙ্গিতে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এক পা এগুতে গেল ড্যান।

'আপনার কাজ হলো "নাটালিকে" সোজা হিউগোর কাছে নিয়ে যাওয়া। বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না,' বরফের মত শীতল শোনাল স্বাতীর কণ্ঠস্বর।

'আর আমার কাজটা কি?' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল আসিফ।

'তুমি হিউগোকে খুঁজে বের করবে।'

'আ-চ্ছা! তারপর তাহলে হিউগোকে তোমার বন্ধুদের হাতে তুলে দেবে?' আসিফের চোখে স্পষ্ট কৌতুক।

স্বাতী এতক্ষণে বুঝতে পারল আসিফ কি সন্দেহ করেছে। রীতিমত রাগ হলো ওর। বলল, 'তুমি ভুল করছ। বাংলাদেশ সরকার ঢাকা থেকে লোক পাঠিয়েছে হিউগোর হস্তান্তরের ঘটনাটা বানচাল করে দেবার জন্যে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আসিফ। 'তারমানে পুলিশ আমার অভিযোগটা শেষ পর্যন্ত কানে তুলেছে। কিন্তু এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?'

'সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। আমি পেশায় একজন সাংবাদিক। বলতে পারো, আমার কাছ থেকেই ওরা খবর পেয়েছে তুমি কোথায় আছ।'

বিস্মিত হতেও যেন ভুলে গেছে আসিফ। শুধু বলল, 'তুমি সাংবাদিক! আমাকে কেন বলোনি?'

'আমি সত্যিই এখানে ছুটি কাটাতে এসেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম তোমাকে ঘিরে একটা রহস্য আছে। তুমিও সত্যি কথা বলোনি,' শান্ত গলায় বলল স্বাতী।

'তারপরেই গতকাল সকালের ফোন-কলটা এল...'

'হ্যাঁ। আই. জি. শামসুল হকের মেয়ে, আমার বান্ধবী রুহী, জানাল তুমি বিদেশী গুপ্তচর,' কেঁপে গেল স্বাতীর কণ্ঠ, চেষ্টা করেও চোখের জল আটকাতে পারল না।

'আমি? বিদেশী গুপ্তচর?' মাথায় গোটা আকাশটা ভেঙে পড়লেও এতটা অবাক হত না আসিফ। এতবড় একটা মিথ্যে, আর স্বাতী তাই বিশ্বাস করল! রাগে অপমানে লাল হয়ে উঠেছে আসিফ, উষ্ণ রক্ত যেন ঠিকরে পড়তে চাইছে চামড়া ফেটে। 'ওই গুণ্ডাগুলোর ভয়েই কাউকে না জানিয়ে গোপনে দেশ ছেড়েছিলাম! তারপরেও গন্ধ শুঁকে শুঁকে শয়তানের বাচ্চাগুলো এই কেইমেনে এসে হাজির হয়েছে!'

'ওদেরকে এখানে দেখেও কেন তুমি তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেলে?' জানতে চাইল স্বাতী।

'তুমি অনেক কিছুই জানো না।' ল্যুগারটা উপেক্ষা করে অভ্যাসবশত পায়চারি করতে শুরু করল আসিফ। 'বাংলাদেশ নেভীর সঙ্গে আমার কোম্পানি কাজ করছে গত তিন বছর ধরে। কিন্তু আমি নিজে যে গবেষণা করছি সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইদানীং আমার একার পক্ষে এ ধরনের বিশাল একটা গবেষণাকাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। সেকারণে মাস তিনেক আগে রিয়ার অ্যাডমিরাল তওফিক মাওলার সঙ্গে দেখা করে গবেষণার জন্যে সরকারী সাহায্য চেয়েছিলাম। রিয়ার অ্যাডমিরাল আমার গবেষণার গুরুত্ব বুঝতে ভুল করেননি। তাঁর সঙ্গে কথা হয়, আগামী মাসের এক তারিখের মধ্যে যদি আমি আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পুরো রিপোর্ট সহ একটা প্রজেক্ট জমা দিতে পারি, তাহলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আমার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসবে। অবশ্য সেটা

নির্ভর করবে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সফলতার উপর। সেকারণেই কেইমেনে আসা এত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চুক্তিটা হাতছাড়া হয়ে গেলে হয়তো আমার গবেষণার কাজই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কেইমেনে রওনা হবার সপ্তাখানেক আগে এই লোকগুলো আমার পিছু নেয়। ওরা আমাকে টাকার লোভ দেখাতে থাকে। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমি জানতাম না এরা সরাসরি বিদেশী কোন রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করছে।'

'সঙ্গে সঙ্গে তুমি রিয়াল অ্যাডমিরালের কাছে গেলে না কেন?' বাধা দিল স্বাতী। ওর মন বলছে আসিফ সত্যি কথা বলছে।

'যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু খবর পেলাম উনি হাসপাতালে আছেন, অসুস্থ। ব্যাপারটা টপ সিক্রেট, সেকারণে তাঁর অনুমতি ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পুলিশকে জানিয়েছিলাম উটকো কিছু লোক আমাকে বিরক্ত করছে। কিন্তু রোবট-ফোবটের কথা শুনে ওরা আমাকে পাগল-ছাগল ঠাউরে নিয়েছে,' ক্ষোভের সঙ্গে বলল আসিফ।

স্বাতীর মনে হলো কেউ যেন ওর কাঁধ থেকে হিমালয় পর্বতটা সরিয়ে নিল। রিয়ার অ্যাডমিরালের সঙ্গে কথা বললেই প্রমাণ হয়ে যাবে আসিফ নির্দোষ। দরকার হলে পুলিশ রিপোর্টটাও খুঁজে বের করা যাবে। তাছাড়া আসিফকে বিদেশী এজেন্টদের সঙ্গে শুধু চলাফেরা করতে দেখা গেছে, কোন প্রমাণ নেই ওদের কাছে সে তথ্য বিক্রি করেছে। এখন সবাই জানতে পারবে বিদেশী এজেন্টরা কেন ওর পিছু পিছু ঘুরঘুর করছিল। তবুও তর্কের খাতিরে স্বাতী জানতে চাইল, 'কেইমেনে আসার পরেও কেন তুমি ওদের সঙ্গে তাল দিচ্ছিলে?'

'আমি শুধু সময় নিচ্ছিলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল আসিফ। 'ওদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে মাঝখান থেকে আমার গবেষণার কাজটা বন্ধ হয়ে যেত। এখানে আমি বিদেশী, থানা-পুলিশ করলে কাজ বন্ধ রেখে দেশে ফিরে যেতে হত। কিন্তু এতদূর এগিয়ে এসে তা কিছুতেই হতে দিতে পারি না আমি। কাজ শেষ করে ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কেইমেন ছেড়ে চলে যাব—এরকম পরিকল্পনা ছিল। এর মধ্যে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়ে সমস্যা আরও বেড়ে গেল। তাছাড়া ওরা ভয় দেখিয়েছিল আমি ওদের কথা না শুনলে ড্যান আর নাটালিকে খুন করবে ওরা।'

'হায় আল্লাহ্!' ককিয়ে উঠল ড্যান।

ড্যানের অস্তিত্বের কথা স্বাতী এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল। সচকিত হয়ে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, চোখে চাপা সন্দেহ। 'সাগরে যেতে আসিফকে বাধা দিচ্ছিলে কেন?'

'আমি দুঃখিত, আসিফ।' দু'হাতে মুখ ঢেকে বাচ্চা ছেলের মত কান্নায় ভেঙে পড়ল ড্যান। 'কোনদিন চিন্তাও করিনি আমি এত নিচে নেমে যাব! শুধু নাটালির কথা চিন্তা করে...ওরা আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছিল...'

'তুমিও, ড্যান?' ভূত দেখার মত চমকে উঠল আসিফ, বিস্ময়ে-বেদনায় নীল হয়ে গেছে ওর মুখটা। 'তুমিও ওদের দলে যোগ দিলে? আজ সকাল থেকেই লক্ষ্য করছিলাম তোমাকে কেমন যেন অস্থির দেখাচ্ছে...কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি...কেন, ড্যান? কেন?'

'সে অনেক ঘটনা! তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, অথচ এতগুলো বছর ধরে তোমার কাছেও ব্যাপারটা আগাগোড়া গোপন করে গেছি।' ভারবাহী পশুর মত ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা টুলে বসে পড়ল ড্যান, আস্তিনে চোখের জল মুছল। 'নাটালিকে বোধহয় আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসি। তাই যখন ভিয়েৎনামে যাবার ডাক এল, তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করে ফেললাম আমরা। মাত্র আঠারো বছর বয়স তখন আমার, মতিচ্ছন্ন হতে সময় লাগল না। নমপেনে স্থানীয় এক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠল, আমার ছেলের মা হলো সে। আমেরিকায় ফিরে আসার দু'বছর পর তার মৃত্যুসংবাদ পেলাম, বিবেকের তাড়নায় ছেলেটাকে আনিয়ে নিলাম। মায়ামীর এক এতিমখানায় বড় হয়েছে সে, প্রতি মাসে নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছি। কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল, হয়তো সন্দেহ করেছে আমিই ওর বাবা। ভয় পেয়ে নাটালিকে নিয়ে পালিয়ে এলাম এই কেইমেনে। নাটালি যদি ঘুণাক্ষরেও কোনদিন টের পায়...' আবার দু'হাতে মুখ ঢাকল ড্যান, শিউরে উঠল। 'যেদিন নাটালির ভালবাসা হারাব, সেদিন আমি আত্মহত্যা করব...'

'কিন্তু...' বাধা দিল আসিফ, সবকিছু যেন কেমন গোলমেলে ঠেকছে। একসঙ্গে এতগুলো বিস্ময়কর তথ্য হজম করা সত্যিই দুষ্কর।

'সামির ফারুকী, মানে ওদের লিডার, কিভাবে যেন ব্যাপারটা জেনে ফেলে। আমি এখনও প্রতি মাসে আমার ছেলের নামে টাকা পাঠাই, সম্ভবত

ব্যাঙ্কের সূত্রেই তথ্যটা আবিষ্কার করে সে। আমাকে ভয় দেখায়, আমি যদি রোবটটা চুরি করার ব্যাপারে সাহায্য না করি, তাহলে নাটালিকে সব বলে দেবে সে।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আসিফ। তারপর যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'এই সামির ফারুকি লোকটা কে?'

'তুমি অনেক দিন দেশের বাইরে ছিলে বলে চেনো না। এই লোক ভারতীয় উপমহাদেশের মাফিয়া-সর্দার,' উত্তর দিল স্বাতী, 'যতদূর মনে হয় তোমার কাছ থেকে হিউগোকে হাতিয়ে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে দেয়াই ওর উদ্দেশ্য। পুরো পরিকল্পনাটাই ওর।' একটা ড্রওর খুলে একগোছা দড়ি পেল স্বাতী, আসিফের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'ড্যানকে বেঁধে ফেলো এটা দিয়ে। তুমি তো বোট চালাতে জানো, তাই না? যেদিকে যেতে চাচ্ছিলে, চলো।'

একদৃষ্টে স্বাতীর দিকে চেয়ে রইল আসিফ অনেকক্ষণ, ধীরে ধীরে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। 'তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ।'

উপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল স্বাতী অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে, তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। আসিফ ড্যানকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল, ড্যান বাধা দিল না। শুধু বলল, 'আমাকে একটাবার সুযোগ দাও, আসিফ। দু'জনে মিলে আমরা ওদের বারোটা বাজিয়ে দেব!' আসিফের চোখে জল এসে গেল, কিন্তু সে জানে এখন কাউকে বিশ্বাস করার সময় নয়। বাঁধা হয়ে গেলে ল্যুগারটা হাত থেকে ফেলে দিল স্বাতী, মনে হচ্ছিল যেন কয়েক মন ওজন ওটার। অস্ত্র উঁচিয়ে কাউকে কোনদিন ভয় দেখাতে হবে তা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেনি সে। অভিজ্ঞতা বটে!

পরবর্তী আধঘণ্টা ওরা কথা বলার সময় পেল না। বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে যোগ হয়েছে শক্তিশালী ঝোড়ো বাতাস। চার্টের উপর হুমড়ি খেয়ে আসিফ হিউগোর অবস্থানটা নির্ণয় করার চেষ্টা করছে। রেডিও ব্যবহার করে জানা গেল ঝড়টা সরাসরি ওদের দিকেই আসছে।

'চিন্তা কোরো না,' স্বাতীকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করল আসিফ। 'হিউগোর কাছাকাছি যদি কোনমতে যেতে পারি, তাহলেও অন্তত একটা কিছু করতে পারব।'

'কি করবে তুমি?' কৌতূহলী হলো স্বাতী।

'হিউগোকে উড়িয়ে দেব, এ ধরনের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমি এখান থেকে কন্ট্রোলে চাপ দিলেই হিউগো নিজেকে নিজে ধ্বংস করে দেবে।'

'কিন্তু তোমার এতদিনের পরিশ্রম? লক্ষ লক্ষ টাকা?'

'চুলোয় যাক সব! জান থাকতে হিউগোকে অন্য কোন দেশের হাতে পড়তে দেব না!'

আসিফের কণ্ঠের দৃঢ়তা স্বাতীকে স্পর্শ করল। ও বুঝল আর কোন চিন্তা নেই, আসিফকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। বোটের হুইলে চেপে বসা আসিফের আঙুলগুলো রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। এই ঝড়ের মধ্যে বোট নিয়ন্ত্রণে রাখা এক অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ, তার উপর আসিফ একা। এর মধ্যেই বার বার ওকে হিউগোর সিগন্যাল পরীক্ষা করে দেখতে হচ্ছে। স্বাতী যথাসাধ্য সাহায্য করছে এটা-ওটা এগিয়ে দিয়ে। দু'বার কফি বানিয়ে খাইয়েছে। ড্যান দেয়ালে হেলান দিয়ে সেই একই ভাবে বসে আছে, মাঝে মাঝে বোট চালাবার ব্যাপারে আসিফকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছে। আসিফ একবার জিজ্ঞেস করল, 'ওরা তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে এ কথাটা তুমি আমাকে জানাওনি কেন, ড্যান? আমরা দু'জনে মিলে কি এর একটা সমাধান করতে পারতাম না?'

'কোন ঝুঁকি নেবার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। নাটালি যে আমার কতখানি তুমি তো জানো, আসিফ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ড্যান। 'তাছাড়া সামির ফারুকী আমাকে কথা দিয়েছে তোমার কোন ক্ষতি করবে না, ওরা শুধু হিউগোকে চায়। আমার ওপর দায়িত্ব ছিল যাতে তোমাকে তীরে আটকে রাখি, ওরা ইতিমধ্যে হিউগোকে তুলে নেবে।'

টেলিস্কোপে দেখছিল স্বাতী, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ' "অরোরা"! "অরোরা"কে দেখতে পাচ্ছি আমি! সামনে!'

'ড্যাম!' হতাশায় প্যানেল-বোর্ডে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল আসিফ। 'ঠিক যখন হিউগোর এত কাছে চলে এসেছি! আমি হুইলটা অটোমেটিকে সেট করে গেলাম, ওটা কাজ না করলে হুইলটা সামলাবার চেষ্টা কোরো। আমি যাচ্ছি হিউগোর সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট-মোড চালু করতে!' ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না বুঝেও ওর পিছু পিছু ডেকে বেরিয়ে এল স্বাতী। অসহায়ের মত আসিফকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে

পড়তে দেখল। ডেকে স্থির হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের মাথায় খোলামকুচির মত দুলছে 'নাটালি'। মাঝে মাঝেই ডেকটা ডুবে যাচ্ছে এক হাঁটু পানির নিচে, ঢেউয়ের আগ্রাসন আর বাতাসের ঝাপটা প্রতি মিনিটেই যেন শক্তিশালী হচ্ছে। ভয় পেয়ে এঞ্জিনরুমে ফিরে এল স্বাতী।

ওকে দেখে আবেদনের ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকল ড্যান, বলল, 'ওকে বাধা দাও, স্বাতী! ওর এতদিনের সাধনা এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে! তুমি যদি দয়া করে কিছুক্ষণের জন্যে আমার বাঁধনটা খুলে দাও, এখনও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমি যদি একবার হুইলটা ধরতে পারি, "অরোরার" সাধ্য নেই আমাদের আগে হিউগোর কাছে পৌঁছায়!'

ঢেউয়ের মাথায় চড়ে অনেকটা উপরে উঠে যাচ্ছে 'নাটালি', পর মুহূর্তেই আছড়ে পড়ছে নিচে। কিভাবে বোট চালাতে হয় সে সম্বন্ধে স্বাতীর কোন ধারণাই নেই। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে 'নাটালি'। সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি করল না সে। ড্যানের হাতের বাঁধন খুলে দিতে দিতে বলল, 'তোমার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, ড্যান—নাটালিকে সব খুলে বলো। অন্য কারও কাছ থেকে শোনার চেয়ে তোমার কাছ থেকে শোনাই ভাল। তাছাড়া তোমার সন্তানকে সে কিছুতেই ফেলে দেবে না, নাটালি সেরকম মেয়েই নয়।'

কৃতজ্ঞতায় ড্যানের চোখ ছলছল করে উঠল। স্বাতীর গালে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, 'ঠিক আছে, স্বাতী। তাই হবে।'

'আর হ্যাঁ, "নাটালির" হুইল এখন থেকে তোমার হাতে। আসিফ আর আমার জীবন আক্ষরিক অর্থেই এখন তোমার হাতে, মনে থাকে যেন।'

মৃদু হেসে চোখ টিপল ড্যান, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হুইলের উপর। স্বাতীর মনে কোন সন্দেহ নেই, ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। তাছাড়া এই ঝড়ের মধ্যে ড্যান ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই 'নাটালিকে' বাঁচায়। এঞ্জিনের ভার ড্যানের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিচের কন্ট্রোল-রুমে চলে এল স্বাতী। আসিফের সমস্ত মনোযোগ সামনের কী-বোর্ডে।

'ড্যানের ধারণা আমরা "অরোরাকে" ফাঁকি দিতে পারব,' বলল স্বাতী।

'পারতাম, যদি হুইলটা ড্যানের হাতে থাকত,' আসিফের কণ্ঠে হতাশা।

'হুইল ওর হাতেই আছে। এখন বলো, তোমাকে আমি কিভাবে সাহায্য

করতে পারি।'

চমকে ওর দিকে ঘুরে তাকাল আসিফ। হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল স্বাতীকে কতবড় বিপদের মধ্যে নিয়ে চলেছে সে। হিউগোর কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। এ মুহূর্তে হিউগোকে উড়িয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে 'নাটালি'-ও ধ্বংস হয়ে যাবে ওদের তিনজনকে নিয়ে। সে সম্ভাবনাই বেশি। শুধু ড্যান হলে চিন্তা ছিল না, কিন্তু স্বাতীর জীবনের ঝুঁকি নেবার অধিকার ওকে কে দিল?

'স্বাতী, তোমাকে আমি ভালবাসি,' বাইরে কানে তালা লাগানো ঝড়ো হাওয়া, তাই চিৎকার করে বলল আসিফ।

সাগর পারের সূর্যোদয়ের মত অপরূপ করে হাসল স্বাতী। 'আমিও তোমাকে ভালবাসি, আসিফ,' চোখে চোখ রেখে বলল সে, 'কিন্তু এই অসময়ে একথা বললে কেন?'

'না বলে যে উপায় নেই! বলার মত সুযোগ আর হয়তো পাব না। স্বাতী, ফারুকি যাতে হিউগোকে না পায়, তার জন্যে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে তুমি?'

'দরকার হলে জান দিয়ে দেব, তাও হিউগোকে অন্য কারও হাতে পড়তে দেব না।' উত্তেজনায় বড় বড় দেখাচ্ছে স্বাতীর চোখজোড়া।

'ভেবে বলছ তো?'

'অবশ্যই। কিন্তু কেন জানতে চাইছ?'

'কারণ হিউগোর সঙ্গে সঙ্গে "নাটালি"ও বিস্ফোরিত হবে।'

একটু থমকে গেল স্বাতী। 'তুমি এতবড় ঝুঁকি নিচ্ছ?'

'আমার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে কোন আপত্তি নেই। আমি সেটা আমার কর্তব্য বলেই মনে করি। কিন্তু তোমার ব্যাপারে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।'

গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্বাতীর সমস্ত অবয়ব। এ গর্ব আসিফের জন্যে, ওর নিজের জন্যে। এ গর্ব বাংলাদেশের জন্যে। ঝড়ো হাওয়ার গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল স্বাতী, 'চলো, আমরা দু'জনে একসঙ্গে মরি!'

স্বাতীর চিৎকার চাপা পড়ে গেল গমগমে যান্ত্রিক গর্জনে। মাথার উপর থেকে ভেসে আসছে কানে তালা ধরানো রোটরের শিস। ধাতব খসখসে শব্দ, তারপরেই মেগাফোনে কথা বলতে শুরু করল কেউ। 'আ হয়, অরোরা।

তোমরা এখনও কেইমেনের সমুদ্রসীমার ভেতরেই আছ। কেইমেনের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে তোমাদেরকে আত্মসমর্পণ করার আদেশ দেয়া হচ্ছে। মাথার উপরে হাত তুলে সবাই ডেকে বেরিয়ে এসো, নাহয় আমরা আক্রমণ করতে বাধ্য হব।'

দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে বাচ্চা মেয়ের মত লাফিয়ে উঠল স্বাতী, আনন্দে চেঁচাতে থাকল, 'চাচা! চাচা পৌঁছে গেছে! কেইমেন নেভী এবারে ওদের ধরে ফেলবে!' নিজের অজান্তেই আসিফকে জড়িয়ে ধরল সে, ওর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, 'হিউগোকে নষ্ট করার আর কোন দরকার নেই, আসিফ, ওরা এসে গেছে!'

পড়িমরি করে ডেকের উদ্দেশে ছুটল ওরা। কিন্তু সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছতেই কড়কড় গুলির শব্দে পিলে চমকে গেল। স্বাতীকে দু'হাতে আড়াল করে ডেকে শুয়ে পড়ল আসিফ। 'অরোরা'-র আরোহীরা নেভীর হেলিকপ্টারকে আক্রমণ করেছে!

'ওরা হেলিকপ্টারটা ফেলে দেবে!' ফুঁপিয়ে উঠল স্বাতী।

'এত সহজে নয়,' ওকে আশ্বাস দিল আসিফ, 'নেভীর হেলিকপ্টার ফেলা অনেক কঠিন কাজ। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যেই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ওদেরকে।'

বৃষ্টির জন্যে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গুলির শব্দ বন্ধ হতে দু'জনে টেলিস্কোপের দিকে দৌড়াল। নেভীর মেগাফোনে বার বার 'অরোরা'কে আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়া হচ্ছে। টেলিস্কোপে চোখ রেখে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল আসিফ, 'ওরা আত্মসমর্পণ করছে! অরোরার ডেকে কয়েকজন মিলে একটা পতাকা নাড়ছে!'

'দেখি, দেখি!' আসিফকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে টেলিস্কোপের উপর হামলে পড়ল স্বাতী। 'অরোরা'র ডেকে গুটিকতক মানুষ দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে, লম্বা একটা লাঠি উঁচিয়ে ধরে আছে। পতাকাটা সম্ভবত ওতেই বাঁধা আছে, বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে গেছে বলে দেখা যাচ্ছে না। হেলিকপ্টারটা অনেক নিচে নেমে এসেছে, পেটের কাছে একটা দরজা খুলে গেছে। সেখান থেকে ঝুলছে একটা দড়ির মই। বাতাসে ভীষণভাবে দুলছে সেটা। 'এই আবহাওয়ায় ওরা নামতে পারবে না,' শঙ্কায় কেঁপে গেল স্বাতীর কণ্ঠস্বর।

'অবশ্যই পারবে,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিবাদ করল আসিফ, 'ওরা নেভীর লোক।'

আসিফ টেলিস্কোপের দখল নিলে স্বাতী দৌড়ে রেলিঙের কাছে চলে এল। পরিষ্কার ভাবে দেখা না গেলেও কি ঘটছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। প্রায় মিনিট দশেক চেষ্টা করার পর প্রথম জন মই বেয়ে 'অরোরা'র ডেকে নেমে এল। এতক্ষণের চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা দাঁতের ফাঁকে শিস কেটে বেরিয়ে এল।

ওদিকে আসিফ রানিং কমেনট্রি দিয়ে যাচ্ছে, '...আরও তিনজন নামছে...ওরা সবাই সশস্ত্র...ফারুকির লোকেরা অস্ত্র নামিয়ে রেখেছে ডেকে...আরে! ফারুকিও বেরিয়ে এসেছে দেখছি...দু'হাত মাথার উপরে তুলে আছে...'

ওদের উৎসুক দৃষ্টির সামনে শেষ কমাণ্ডোটিও নেমে পড়ল 'অরোরার' ডেকে। তারপর হেলিকপ্টারটা ধেয়ে এল সোজা 'নাটালির' দিকে। মেগাফোনে আই. জি. শামসুল হকের কণ্ঠ চিনতে একটুও ভুল করল না স্বাতী। 'স্বাতী চৌধুরী...স্বাতী চৌধুরী...তুমি কোথায়?'

দু'হাত উপরে তুলে নাড়তে লাগল স্বাতী। ড্যান আর আসিফ এসে দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে। আবার খসখস করে উঠল মেগাফোন, 'আমরা নামতে যাচ্ছি...ডাইভিং প্ল্যাটফর্মটা খালি করো...' ড্যান আর আসিফ ছুটোছুটি করে প্ল্যাটফর্ম থেকে আলগা জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে ফেলল। 'নাটালি'কে কেন্দ্র করে ঘুরতে লাগল হেলিকপ্টার, প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার জন্যে ল্যাণ্ড করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে, স্বাতী যখন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, দোদুল্যমান প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল অতিকায় ফড়িংটা। দরজা খুলে প্রথমেই বেরিয়ে এলেন শামসুল হক। 'স্বাতী, মা, এদিকে সব ঠিকঠাক আছে তো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি।

প্রথমে ড্যান, তারপর আসিফের দিকে তাকাল স্বাতী। আসিফের চোখে নিঃশব্দ আবেদন, স্বাতীর উপর নির্ভর করছে ড্যানের ভবিষ্যৎ। এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল স্বাতী, পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত নিল। 'সব কিছু ঠিক আছে, চাচা। এরা দু'জনেই আমার বন্ধু।'

## বিশ

অফিসে বসে কাজ করতে করতে বার বার স্বাতীর চোখ চলে যাচ্ছে ডেস্কের এক কোণে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকা টেলিফোনটার দিকে। আশ্চর্য, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করছে না গ্রাহাম বেলের আবিষ্কার! একদম মৌনী ঋষির মত নির্বাক। অথচ স্বাতী জানে, চারদিন হয়ে গেছে দেশে ফিরেছে আসিফ।

চাচার সঙ্গে সে-রাতেই নেভীর হেলিকপ্টারে করে কেইমেনে ফিরে এসেছিল স্বাতী। পরদিন সকালের ফ্লাইটে লনডন, সেখান থেকে সোজা ঢাকা। আসিফের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কারণ হিউগোকে তুলে আনার জন্যে সাগরেই থেকে যেতে হয়েছিল ওকে।

স্বাতী খবরের কাগজ পড়ে জেনেছে, সামির ফারুকি আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের জেল হাজতে ভরা হয়েছে। মাস দুয়েকের মধ্যেই বিচারের শুনানি শুরু হবে। এছাড়াও প্রতিটা খবরের কাগজে ডক্টর আসিফ মাহমুদ নামের এক তরুণ বিজ্ঞানীর অসাধারণ দেশপ্রেম আর সাহসিকতার কাহিনী ছাপা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে বিজয় দিবসে আসিফ মাহমুদকে বিশেষ খেতাবে ভূষিত করা হবে। রুহীর কাছ থেকে স্বাতী গতকালই শুনেছে আসিফ দেশে ফিরেছে। অথচ আশ্চর্য, একটাবার স্বাতীকে ফোন করল না! অভিমানে স্বাতীর মনটা ভার হয়ে আছে। আসিফ কি ওকে ভুলেই গেল?

কাজে মন বসল না, বাড়ি চলে এল স্বাতী। পর্চে চাচার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভার ওকে দেখে সালাম দিল। সোজা লিভিং-রুমে চলে এল স্বাতী। মা আর চাচা গল্প করছেন, ওকে দেখে একটু যেন থমকে গেলেন দু'জনেই।

'কি রে, মা, কেমন আছিস? মুখটা যেন শুকনো শুকনো লাগছে?' স্নেহমাখা কণ্ঠে সম্ভাষণ জানালেন আই. জি. শামসুল হক। সোনালী বর্ডার দেয়া পাতলা কাঁচের চায়ের কাপটা হাত থেকে সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখলেন।

'আর বলবেন না,' ধুয়ো ধরলেন মা, 'মেয়েটা ক'দিন ধরে খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। আজ সকালে এক কাপ চা ছাড়া আর কিচ্ছু খায়নি। গতকাল রাতে ও পছন্দ করে বলে সর্ষে-ইলিশ করলাম, তা মেয়ে ছুঁয়েও দেখল না!'

'তোমরা যে কেন শুধু শুধু আমার পিছু লাগো!' হাতের ব্যাগটা কার্পেটের এক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে সোফায় এলিয়ে পড়ল স্বাতী। 'খিদে পেলে তবে তো খাব! তোমার সবকিছুতেই বেশি বেশি।'

'এতদূর জার্নি করে এসেছে, সেজন্যেই হয়তো ক'দিন খাবার রুচি হচ্ছে না,' প্রশ্রয় দেবার ভঙ্গিতে বললেন শামসুল হক। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'যা, উপরে যা,' তাড়া দিলেন মা। 'পাটিসাপটা পিঠে বানিয়ে রেখে এসেছি। বাবন খায়নি, তোর জন্যে অপেক্ষা করছে ।'

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল স্বাতী। ও জানে বাবনকে কোথায় পাওয়া যাবে। বাবন এ সময়টায় পিছনের খোলা বারান্দায় গল্পের বইয়ে মগ্ন থাকে। ওকে দেখেই হাসিমুখে হাতের বইটা বন্ধ করে আড়মোড়া ভাঙল সে, 'আরে, আপু, তুই এত তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলি!'

'তুই নাকি না খেয়ে আমার জন্যে বসে আছিস, তাই অফিসে মন টিকল না।' লাল কভার দেয়া একটা মোড়া টেনে বসল স্বাতী।

'ইশ্, ভারি দরদ আমার জন্যে,' মোটা কাঁচের চশমার আড়ালে কৌতুকে হাসছে বাবনের চোখজোড়া। 'দু'দিন পরে তো ঠিকই বরের হাত ধরে সুড় সুড় করে চলে যাবি শ্বশুর বাড়ি।'

পাটিসাপটা পিঠে ভর্তি প্লেট নিয়ে ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে সদাহাস্যময়ী বুয়া। প্লেটটা বেতের টেবিলে নামিয়ে রেখে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, 'আফায় শ্বশুর বাড়ি চইলা গেলে বাড়িডা এক্কেরে আন্ধার হইয়া যাইব।'

রীতিমত অবাক হয়ে গেল স্বাতী। হঠাৎ করে এরা সবাই শ্বশুর বাড়ির আলাপ শুরু করল কেন! কিন্তু অন্যদিনের মত স্বাতী আজ রাগে জ্বলে উঠল না, বরং কেমন যেন বিষাদে ছেয়ে গেল মনটা।

রাতে ভাল ঘুম হলো না। সারা রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল। প্রচণ্ড ইচ্ছে হলো চিটাগাঙে আসিফের বাসায় একবার ফোন করে। ফোন নাম্বার যোগাড় করাও এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করতে পারল না। যেচে পড়ে মান খোয়ানো যায় না, আসিফ যদি ওকে হ্যাংলা

ভাবে?

সকালে দেরি করে ঘুম ভাঙল। প্রায় ন'টা বাজে। ঘড়ি দেখেই পড়িমরি করে বিছানা ছাড়ল। এতক্ষণে ওর অফিসে পৌঁছে যাবার কথা! তাড়াহুড়ো করে বাথরুম সেরে ড্রেসিং টেব্‌লের সামনে চুল আঁচড়াতে বসল স্বাতী।

হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মা। 'ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আজ তোর অফিসে না গেলেও চলবে। খান সাহেবকে আমি ফোন করে দিয়েছি,' মিটিমিটি হাসছেন মা।

অবাক হয়ে মায়ের দিকে ফিরল স্বাতী। কিন্তু কিছু বলার আগেই বাইরে কে যেন চিৎকার করে ওকে ডাকল, 'স্বাতী!'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না স্বাতী। ও কি ভুল শুনেছে? কিন্তু হাজার বছরেও যে এ কণ্ঠস্বর ভুলে যাবার নয়!

চলৎশক্তি ফিরে পেতে এক ছুটে ব্যালকনিতে চলে এল স্বাতী, উত্তেজনায় শ্বাস পর্যন্ত নিতে ভুলে গেছে।

ব্যালকনির নিচে বাগানে সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আসিফ। আসিফের হাতে সেলোফেনে মোড়া তুষারশুভ্র একরাশ রজনীগন্ধা। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দারোয়ান ব্যাটা দাঁত কেলিয়ে হাসছে।

'আমি এসেছি, স্বাতী,' ভারি সুন্দর করে হাসল আসিফ।

রজনীগন্ধার সুবাসে ডুবে যেতে যেতে চোখ বুজল স্বাতী।